পুরনো বই

পুরনো বই

* * *

নিখিল সেন

* * *

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ

দক্ষিণারঞ্জন বসু

ও

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাভাজনেষু

মুখবন্ধ

আজকাল বাঙলা সাহিত্য দিকে দিকে এত সমৃদ্ধি লইয়া উপস্থিত যে একজন সাধারণ পাঠকের পক্ষে আশপাশে একটু তাকাইয়া দেখার অবসরও যেন কম, বর্তমানই তাঁহার মন সম্পূর্ণটা অধিকার করিয়া থাকে। কিন্তু প্রবন্ধে, উপন্যাসে, নাটকে, গল্পে, কবিতায়, রস-রচনায় এই যে আমাদের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি তাহার অব্যবহিত-পূর্ব ইতিহাস শুধু পণ্ডিতের অনুসন্ধিৎসারই বিষয় নয়—সাধারণ পাঠকেরও কৌতূহলের বিষয়। আজ আমরা আমাদের সাহিত্যের যে বিষয়ে যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি তাহার এক শ' দেড় শ' বৎসর পূর্বের স্তর কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা পাইতে আমরা সবাই খুব উৎসুক।

বাঙলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস সত্যই বিস্ময়কর। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে যাহার প্রায় 'চলি চলি পা পা'-এর অবস্থা, বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে আসিয়া তাহার বলিষ্ঠ এবং সুকুমার সহস্র বিকাশ। এই বিকাশের দিনে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বইয়ের কথা আমরা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছি—অনেকে হয়ত আদৌ জানিই না। বর্তমান গ্রন্থের লেখক অনেকের নিকটে অজ্ঞাতপ্রায় বা বিস্মৃতপ্রায় বিবিধ ধরণের কয়েকখানি বই ও তাহার লেখকের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমাদের নিকট তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে এই পরিচয় সাধারণ পাঠক সমাজেও কৌতূহল ও আগ্রহের সৃষ্টি করিবে আশা করি।

গ্রন্থকার বাঙলা-সাহিত্যের বিশেষ কোনও যুগের সুপরিকল্পিত ইতিহাস রচনা করিবার চেষ্টা করেন নাই; নিয়মতান্ত্রিক গবেষণার যে পদ্ধতি সে পদ্ধতিও তাঁহার নহে; জনপ্রিয় পদ্ধতিতে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ ও কয়েকজন গ্রন্থকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের প্রতি সাধারণ পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা—এ বিষয়ে খানিকটা

তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করা—খানিকটা ঔৎসুক্য জাগ্রত করিয়া দেওয়া—ইহাই হইল লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে এখন নানা ভাবে গবেষণা হইতেছে; প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক প্রকারের সাহিত্য সম্বন্ধেই সমগ্রভাবে এবং পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা হইতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা পর্যায়ে অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সুপ্রাপ্য করিয়া তুলিতে-ছেন। এই সকল আলোচনা এবং প্রকাশনার ভিতরেও বর্তমান গ্রন্থ-খানির প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। নৈষ্ঠিক গবেষণা পদ্ধতিতে লিখিত গ্রন্থের যেমন অনেক মহৎ গুণ আছে—তেমনই কিছু কিছু দোষও আছে। দোষ হইল এই, তাহা অনেক সময় যথেষ্ট সহজ সরল এবং হৃদয়গ্রাহী নয়, ফলে তাহা পণ্ডিতগণেব বা অনুসন্ধিৎসুর 'রাগের' কারণ হইয়া সাধাবণ পাঠকের 'বিরাগে'র কারণ হয়। সাহিত্যের অনেক জিনিস আছে যে সম্বন্ধে সাধারণ পাঠক হয়ত কিছু কিছু জানিতে চান—অনেক তথ্যের ভিড দেখিয়া আবার ভয়ে পিছাইয়া যান। সুতরাং অপেক্ষাকৃত অল্প তথ্যকে সরস ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া একটি বৃহৎ সংখ্যক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যে এই চেষ্টা তাহার একটা সার্থকতা আছে।

বইখানিতে লেখকের তথ্য পরিবেশনের ভঙ্গিটি স্বাগত-সম্ভাষণের যোগ্য। স্থানে স্থানে দেখিতে পাই, গল্পচ্ছলে অনেকখানি তথ্য পরিবেশন। কোনও বিষয় সম্বন্ধেই সম্পূর্ণাঙ্গ আলোচনা না থাকিলেও সব আলোচনা জড়াইয়া অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন দিকে বাঙলার সাহিত্য সাধনার একটা আভাস পাওয়া যাইবে গ্রন্থখানির ভিতর দিয়া। যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি লিখিত সে উদ্দেশ্য ইহা দ্বারা সাধিত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস—আমি তাই গ্রন্থখানিকে ও গ্রন্থকর্তাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

২রা মে, ১৯৫৭।

নিবেদন

'জাতীয় পাঠাগারে'র উদ্যোগেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রদর্শনীটি বছর কয়েক পূর্বে। মুদ্রণ শিল্পের প্রথম যুগের কিছু কিছু দুর্লভ পুঁথি আর ছাপা বইয়ের প্রদর্শনী। এ প্রদর্শনীতে খানকয়েক বাংলা বইও স্থান পেয়েছিল। দুষ্প্রাপ্য পুস্তক। জীর্ণ, বিবর্ণ এবং কীটদষ্ট। পাতাগুলি এমনি ভঙ্গুর যে জোরে পাখার একটু হাওয়া লাগলেই বুঝি বিস্কুটের গুঁড়োর মত ঝরে পড়বে। এমনি খান কয়েক পুরনো বই যা বিচিত্র ঠেকেছিল আমার নিকট, তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। পূর্ণতর কোন বিবরণ কিংবা গবেষণামূলক কোন ধারাবাহিক পর্যালোচনা নয়। কারণ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আমি বিশেষজ্ঞ বা গবেষক নই। পূর্বসূরীদের কথাই কেবল পরিবেশন করে গেছি সাধারণের জন্য। পরের মুখেই ঝাল খাওয়া!

এই সব পুরনো বইয়ের অনেকগুলিই আজ বিলুপ্তির পথে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাদের সংরক্ষণ আর যথাসম্ভব পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা না করলে দু-দশ বৎসরের মধ্যে তাদের অধিকাংশেরই একেবারে লোপ পাবার সম্ভাবনা। অবশ্য এদিকে যে কোনরূপ নজর দেওয়া হয়নি তা নয়। বছর কয়েক পূর্বে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস মশাইয়ের উদ্যোগে কিছু বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছিল 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' সিরিজে। রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য যদুনাথ সরকার প্রমুখ মনীষীরা এ শ্রেণীর বইয়ের পুনঃপ্রকাশের উপযোগিতা স্বীকার করেছিলেন। সাধুবাদ করেছিলেন প্রকাশকদের। 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

"…এই লেখাগুলিকে আমরা প্রাচীন বলেই গণ্য করি পঞ্জিকার তারিখ গণনা করে নয়, এদের কালান্তরবর্তিতার সীমা নির্ণয় করে। . বাংলা গদ্যসাহিত্যের আরম্ভ হয়েছে দূরকালে নয়, অল্পকালে। তখন বাংলা ভাষার ভূমিভাগে মাটি শক্ত হয়ে ওঠে নি, সাহিত্যের পথ হয় নি পাকা, তখন

ভাবের ও চিন্তার চলাফেরা ছিল সংশয়িত গতিতে। ভাষা যে মনের ধাত্রী তখন সে মন আপন আশ্রয়ের শিথিলতা বশত সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে পারে নি। সেইজন্য এই সকল গ্রন্থে প্রাচীনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। ইতিহাসে অনুরাগী যাঁদের মন তাঁরা এর রস পাবেন। আর যাঁদের ইতিহাসের প্রতি নিষ্ঠা নেই তাঁরা বর্তমানের সম্পূর্ণ পরিচয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই দূরব্যাপী মনোযোগে ঔদাসীন্য অগভীর শিক্ষার লক্ষণ।

এত আশ্চর্য দ্রুতবেগে বাংলা সাহিত্যের বৃদ্ধি হয়েছে যে এর সময়ের পথে মাইলের পরিমাপ চিহ্ন শিকি মাইলের মাত্রাতেই দেওয়া সঙ্গত। এ সাহিত্যে অল্পদূর এগোলেই পিছনের দিকে দূরবীণ কষার দরকার হয়ে পড়ে। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো যে সকল লেখক আধুনিক সাহিত্যের যুগ-প্রবর্তক তাঁদের রচনারও প্রথম অংশ বাংলা সাহিত্যের পূর্বাহ্নের পূর্ব প্রহরের অন্ধকারে অপরিস্ফুট। সেই জন্যেই সময় থাকতে এইবেলা এই সাহিত্যের অগোচরপ্রায় প্রাগ্‌বিভাগকে গোচরে আনবার অধ্যবসায়কে উৎসাহ দেওয়া বাংলা দেশের পক্ষে নিতান্তই কর্তব্য।"

এ আলোচনাগুলি 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রথম ধারাবাহিক ভাবে (১৯৫৪-৫৫ সালে) প্রকাশিত হয়েছিল প্রধানত 'যুগান্তরের' শ্রদ্ধেয় বার্তা-সম্পাদক মশাইয়ের উৎসাহ ও উদ্যোগে। আলিপুর বেলভেডিয়ারস্থ জাতীয় পাঠাগারের ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান মিঃ যাদব মুরলীধর মুয়ে, বিভাগীয় অধিকর্তা শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী ডি. এল. ব্যানার্জি এবং শ্রীবিজয় সেনগুপ্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত ও গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ঔপন্যাসিক বন্ধু গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, কবি শ্রীচিত্ত সিংহ প্রমুখ অনেকের ঐকান্তিক সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে এ বই প্রকাশিত হত কিনা সন্দেহ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মশাই এ বইয়ের মুখবন্ধ লিখে দিয়ে আমাকে শুধু কৃতজ্ঞ করেন নি, সম্মানিতও করেছেন। ব্যবসায়ের দিক দিয়ে অর্থকরী নয় এমন সব পুস্তক প্রকাশ করে এ দেশের প্রকাশন-ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সংসাহস

দেখিয়েছেন এবং প্রচুর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছেন প্রসিদ্ধ প্রকাশক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় মশাই। এ বইখানি প্রকাশিত করে তিনি আমায় বাধিত করেছেন।

সতর্কতা গ্রহণ করা সত্ত্বেও কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে গেছে বইখানিতে। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা আশা করি নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা :
কলিকাতা।
২০শে বৈশাখ, '৬৪।

নিখিল সেন

সূচীপত্র

হালহেদের গ্রামার … … ১
কথোপকথন … … ১১
ইতিহাসমালা … … ২০
বোধেন্দু বিকাস নাটক … … ৩১
কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত … ৪৮
রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র … … ৬১
লিপিমালা … … ৮৩
বেদান্ত গ্রন্থ … … ৯৩
গৌড়ীয় ব্যাকরণ … … ৯৯
কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক … … ১০৫
প্রবোধ চন্দ্রিকা … … ১১৪
রাজাবলি … … ১১৯
নববাবু বিলাস … … ১২৮
হুতোম প্যাঁচার নক্শা … … ১৪৩
বিদ্যাকল্পদ্রুম … … ১৫১
নয়শো রুপেয়া … … ১৬৫
রামনিধি গুপ্ত-র (নিধুবাবুর) গীতরত্ন গ্রন্থ … ১৭৯
সচিত্র অন্নদামঙ্গল … … ১৯১
তোতা ইতিহাস … … ১৯৭
“হিন্দু ফিমেলস” বা হিন্দু মহিলাদের হীনাবস্থা … ২০৭
লেখক-পরিচিতি … … ২১৪
একশ’ বছরের খানকয়েক বাংলা পুরনো বই … ২২২

স্বীকৃতি

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা (১ম ও ২য় খণ্ড)।
: সাহিত্য-সাধক চরিতমালা।
: বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় : বঙ্গ ভাষার লেখক।

শিবরতন মিত্র : বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক।

শ্রীসজনীকান্ত দাস : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)।
: উইলিয়ম কেরী।

শ্রীকালিদাস রায় : প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য (১ম+২য় খণ্ড)।

ডাঃ সুশীলকুমার দে : দি হিস্ট্রী অব্ দি নাইনটিস্থ সেঞ্চুরী বেঙ্গলী লিটারেচার।
: বাংলা প্রবাদ।

ডাঃ সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যে গদ্য।
: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।

দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
: দি হিস্ট্রী অব্ বেঙ্গলী ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাণ্ড লিটারেচার।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : দি ভার্নাকুলার লিটারেচার অব্ বেঙ্গল।

রামগতি ন্যায়রত্ন : বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব।

রাজনারায়ণ বসু : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বক্তৃতা।
: সেকাল আর একাল।

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

প্রমথ চৌধুরী : প্রবন্ধ সংগ্রহ।

শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য : পুরাতন প্রসঙ্গ (১ম খণ্ড)।

নিখিলনাথ রায় : প্রতাপাদিত্য।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস।

'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', 'বঙ্গদর্শন' ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে'র বিভিন্ন পুরাতন ফাইল।

H. Hosten : The Three first type-printed Bengali Books—'Bengal, Past & Present', Vol IX (July-Dec), 1914.

G. A. Grierson : The Early Publications of the Serampore Missionaries—'Indian Antiquary' : Vol. XXXII, 1903 (p. 241ff).

বাঙ্‌লায় বাঙালীর 'বুক বিজনেস্' যে বই নিয়ে সুরু, তার একখানি খোদাই চিত্র [পৃষ্ঠা—১৯১

হালহেদের গ্রামার

'বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গেজী।'

সতেরো শ' আটাত্তর খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত একটি শব্দশাস্ত্র বা ব্যাকরণ পুস্তকের টাইটেল পেজের শিরোনামা। বইখানি ছাপা হুগলীর মুদ্রাযন্ত্রে। লেখক একজন ইংরেজ; নাম—নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেদ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ আমলাদের বাঙলা ভাষা শেখবার ও শেখাবার উদ্দেশ্যেই মূলতঃ রচিত এই বইখানি। ফিরিঙ্গিদের জন্য লেখা—ফিরিঙ্গিদের উপকারার্থং। কিন্তু কেবল মাত্র ফিরিঙ্গিদের উপকারেই সীমাবদ্ধ থাকে নি এর উদ্দেশ্য। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে বইখানি সূচনা করেছে এক নতুন যুগের। সৃষ্টি করেছে বাঙলা মুদ্রণের এক নয়া ইতিহাস। হুগলীর গঙ্গাতীরে সাগরপারের গুটিকয়েক বিদেশী বণিক আর পাদরী মিলে একদা যে বীজ বপন করেছিল স্বায় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, কালক্রমে তাই আজ মহামহীরুহে পরিণত হয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে নব পল্লবায়িত ও শাখায়িত করে তুলেছে। তার উন্নতি ও প্রসারের পথ দিয়েছে প্রশস্ত করে।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ তাই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়। কেননা, এ-বছরই বাংলা টাইপের প্রথম প্রকাশ। তখন থেকেই বাঙলা টাইপে বাঙলা পুস্তক নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। ফিরিঙ্গিদের উপকারের জন্য লেখা হালহেদের গ্রামার—A Grammar of the Bengal Language-ই বৃটিশ ভারতে প্রকাশিত বাঙলা হরফে

মুদ্রিত প্রথম পুস্তক। বাঙলা মুদ্রণের এই সর্বপ্রথম প্রচার। অবশ্য ইংরেজীতেই লেখা এ গ্রামার। তবে তার দৃষ্টান্তের উদ্ধৃতিগুলি রামায়ণ-মহাভারত আর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' থেকে গৃহীত আর বাঙলা হরফেই সেগুলি মুদ্রিত।

সাধারণ একটি ঘটনাই কিন্তু ভিন্‌দেশী এই ইংরেজকে টেনে এনেছিল এই ভারতের সাগর-তীরে।

ঘটনাটি হোল: হ্যারোর দুই অন্তরঙ্গ ছাত্রবন্ধু একদা প্রেমে পড়েন অক্সফোর্ড চ্যাপেলের এক সুকণ্ঠী গায়িকার। দু'জনেরই কবি-খ্যাতি যথেষ্ট। একজন আবার নাট্যকারও। গায়িকা মিস্ লিন্‌লে দু'জনকে এক সঙ্গে ভালবাসলেও প্রেমের জয়মালা কিন্তু পরিয়ে দিলে নাট্যকার বন্ধু রিচার্ড সেরিডনের (১৭৫১-১৮১৬) কণ্ঠে। আশাহত ব্যর্থ প্রেমের নিকট তখন মাত্র দুটি পথ খোলা। এক, তখনকার প্রচলিত প্রথানুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিস্তল লড়াইয়ের ডুয়েলে আহ্বান করা। অপরটি আপন দয়িতার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে দূর বিদেশে পলায়নের পথ খোঁজা। প্রিয় বন্ধুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করে হালহেদ শেষোক্ত পথই নিলেন বেছে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাধারণ এক কেরানীর পদ গ্রহণ করে তিনি ইংলণ্ড ত্যাগ করলেন—দূর বাঙলা দেশের উদ্দেশে।

এই গেল গোড়ার কাহিনী।······

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সুবা বাঙলার শাসনভার, বিশেষ করে দেওয়ানী কার্যের ভার, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে আসে। বাংলা ভাষা জানা না থাকায় কোম্পানীর ইংরেজ আমলাদের নানা অসুবিধেয় পড়তে হোত রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে। ইংরেজ আমলাদের বাঙলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তখন অনুভূত হয় একান্তভাবে। এ-সময় ঘটনাচক্রে সিভিলিয়ানরূপে এদেশে আগমন হয় মিঃ নাথানিয়েল

ত্রাসি হালহেদের। কোম্পানীর আমলাদের এ-অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি বাঙলা ভাষা শিখতে লেগে যান। অটুট অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা সহকারে অচিরেই তিনি বাংলা ভাষা ও দেশীয় অপরাপর ভাষাগুলিতে এমন সুপণ্ডিত ও পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন যে, শোনা যায়, বর্ধমানে এক যাত্রাগানের আসরে নিজেকে তিনি দিব্যি বাঙালী বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কথা-বার্তা, বেশ-ভূষা আর চাল-চলনে বিদেশী বলে আর আঁচ করবার নাকি কারো অবকাশই হয় নি!

১৭৫১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে ইংলণ্ডের ওয়েষ্টমিনষ্টারে জন্ম হয় হালহেদের। তাঁর পিতা উইলিয়ম হালহেদ ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের ডিরেক্টর ছিলেন। হালহেদ শৈশবে হ্যারোতে অধ্যয়ন করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি আর তাঁর বাল্যবন্ধু প্রসিদ্ধ ইংরেজ নাট্যকার ও রাজনীতিক রিচার্ড সেরিডন দুজনে মিলে এক অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। অক্সফোর্ডে পাঠ্যাবস্থায় প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ উইলিয়ম জোন্স-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনিই হালহেদকে প্রাচ্য ভাষা আরবী ও ফারসী শিখতে প্রথম অনুপ্রাণিত করেন।

ভারতে এসে বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তাঁর বেশী দেরী হোল না। বড়লাট হেষ্টিংস-এর নির্দেশে ও পরামর্শে তিনি হিন্দু আইন-এর এক সংক্ষিপ্তসার—'এ কোড অব জেণ্টু লস্' নামে অনুবাদ করেন। এর দু'বছর পর ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হয় হালহেদের ব্যাকরণ: A Grammar of the Bengal Language.

অবশ্য পঞ্চদশ শতকে ইয়োরোপে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র উদ্ভব হবার পর বাণিজ্য ব্যপদেশে পোর্তুগীজগণ প্রথম আসতে শুরু করে ভারতে। গোয়ার জেসুইট ধর্মযাজকেরাই ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম

ভারতীয়দের মুদ্রাযন্ত্রের কথা শোনান এবং গোয়া, মাদ্রাজ প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে নিজেদের ছাপাখানা স্থাপন করেন।

হালহেদের গ্রামারের পৃষ্ঠা-সংখ্যা মোট ২১৬। ভূমিকা, পরিশিষ্ট ও শুদ্ধ্যশুদ্ধির অংশ বাদ দিয়ে গ্রন্থটি মোট আটটি অধ্যায়ে ভাগ করা। ইংরেজী গ্রামারের অনুকরণেই হালহেদ তাঁর ব্যাকরণের বিষয়-বস্তু পরিবেশন করেছেন। ইংরেজী গ্রামারের আঙ্গিকেই তিনি অন্বয় বা Syntax অধ্যায়ে তাঁর গ্রামারের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। বিদেশী দৃষ্টিকোণ থেকে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফিরিঙ্গি আমলাদের জন্য মুখ্যতঃ রচিত হলেও, বাঙলা ভাষা যে সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত তিনি তাঁর ব্যাকরণের কোথাও এ কথাটি ভোলেন নি। সংস্কৃত ব্যাকরণের কাঠামোকে যতদূর সম্ভব বজায় রাখবার তিনি চেষ্টা করেছেন। অপপ্রয়োগ হয় নি।

যেমন: Chap. I. of the Elements—1. Chap. II. of Nouns—46. Chap. III. of Pronouns—75. Chap. IV. of Verbs—100. Chap. V. of Attributes and Relations—143. Chap. VI. of Numbers—159. Chap. VII. of Syntax—177. Chap. VIII. Orthœpy and Versification—190. Appendix—207. Preface—I—XXV. Errata...XXVII—XXIX.

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে হালহেদের যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল সে সম্বন্ধে তাঁর রচিত 'গ্রামার'খানাই সাক্ষী। পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনিই প্রথম প্রমাণ করে দেখান যে, সংস্কৃত দেবনাগরী, আরবী ও ফারসী, এমন কি ল্যাটিন ও গ্রীক হরফের মধ্যে একটা নিবিড় সামঞ্জস্য বিদ্যমান। তিনি তাঁর ব্যাকরণকে আরবী

ও ফারসী প্রভাব থেকে যথাসম্ভব মুক্ত করে অপেক্ষাকৃত সংস্কৃত পদ্ধতিতে ঢালাই করবার চেষ্টা করেন। তাঁর বইতে ব্যবহৃত সব কটা উদ্ধৃতিই তখনকার বাঙলা কাব্য থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন। যেমন—

"কিবা সুললিত কেশের ভাতি।
মলিন হইল নলিন পতি॥" [পৃষ্ঠা—১৭৯]।

* * *

"সিউতিতে পদ মাতা রাখিতে ২।
সিউতি হইল সোনা দেখিতে ২॥
সোনার সিউতি দেখি পাটনীর ভয়।
এ ত মেয়্যা মানুষ নয় দেবতা নিশ্চয়॥" [পৃষ্ঠা—১৮১]

* * *

"বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যা নাম জপ।
বিদ্যা লাভ বিদ্যা লাভ বিদ্যা নাম তপ॥"
[পৃষ্ঠা—১৮৪]

হালহেদ তাঁর 'গ্রামারে'র দীর্ঘ ভূমিকায় তখনকার বাঙলা গদ্যের শোচনীয় দুর্দশার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন :

'আমি এ ব্যাকরণে প্রাচীন বাঙলা কবিদের কাব্যগ্রন্থ থেকে যে সকল উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছি তাতে এ কথা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, বাঙলা ভাষার শব্দ-গৌরব অসীম। বাঙলা ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি যে কোন বিষয় রচিত হতে পারে। কিন্তু বাঙালীরা এ-সম্বন্ধে যত্নশীল নন।······বাঙালী গ্রন্থকারেরা কেবল পদ্যেই পুস্তক রচনা করে আসছেন। গদ্য রচনা এদেশের সাহিত্যে এক প্রকার বিরল। বিষয়-কার্য উপলক্ষে চিঠি-পত্র, আবেদন-নিবেদন, ইস্তেহার প্রভৃতি অবশ্য পদ্যে লিখিত হয় না, কিন্তু এ সকল রচনাতেও গদ্যের কোন নিয়ম নেই, ব্যাকরণ-সঙ্গত বাক্য-গ্রন্থনের কোন প্রকার প্রণালী

নেই। এ-ছাড়া, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, নীতিকথা প্রভৃতি সকল বিষয়েই রচিত গ্রন্থ পদ্যে লিখিত হয়ে আসছে।……’

হালহেদের আমলের বাঙলা গদ্যের নমুনা (তখনকার দিনে বাঙলা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের প্রচলন নিচের এ পত্রে লক্ষণীয়):

শ্রীরাম—

গরিবনেওয়াজ শেলামত—

আমার জমিদারি পরগনে কাকজোল—তাহার দুই গ্রাম দরিয়াশীকিশ্তী হইয়াছে—শেই দুই গ্রাম পয়শ্তী হইয়াছে চাকলে একবর পুরের—শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরি আজ রায় জবরদস্তী দখল করিয়া—ভোগ করিতেছে আমি মালগুজারির শরবরা হতে—মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার জে শরকার হইতে জামিন ও এক চোপদার শরজমিনতে পহুচিয়া তোরফেনকে—তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হকদারের হকদেনায়া দেন ইতি—শন ১১৮৫ শাল তারিখ—১১ শ্রাবন।

ফিদবি

জগতধির রায়

আঠারশ’ শতকের শেষের দিকে বাঙলা ভাষায় লেখা একখানি পত্রের উদাহরণ। টীকা-টীপ্পনী ছাড়া এখন মানে করা শক্ত। ‘গরিবনেওয়াজ শেলামত’ শব্দটি ফারসী। তখনকার দিনে সম্বোধনের তাই ছিল রীতি। ‘আমার জমিদারি পরগনে কাকজোল’—আমার জমিদারি হোল কাকজোল পরগণায়। ‘তাহার দুই গ্রাম দরিয়াশীকিশ্তী হইয়াছে’—মানে তার দুটি গ্রামকে নদীতে গ্রাস করে নিয়েছে। ‘পয়শ্তী হইয়াছে’—অর্থাৎ, বাঁধ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ‘মালগুজারি’—অর্থাৎ, সরকারী খাজনা এবং ‘চাকলে’ মানে—জেলা।

তখনকার দিনে বাঙলা গদ্য-সাহিত্যের দুরবস্থার উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি যা মন্তব্য করেছেন তার উদ্দেশ্য এ নয় যে, বাংলাভাষার প্রতি

তিনি অবজ্ঞার ভাব পোষণ করতেন। বরং ঠিক তার উল্টো। বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকামী অমন একটি সুহৃদ সে যুগে মেলা ভার ছিল।

হালহেদ তাঁর গ্রামারের ভূমিকায় এও লিখেছেন:

'বাঙলা গদ্যের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত লিখিত বাঙলা ভাষা তার শব্দভাণ্ডার প্রয়োজনমত সংস্কৃত থেকে আহরণ করত। তাই তার রীতি ও প্রকৃতি অকৃত্রিম ও সরল ছিল।'

তিনি তারপর লিখেছেন: 'খাঁটি বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ দ্বারা অধুনা বাঙলা দেশে ব্যবহৃত হালচাল সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। যে বহুসংখ্যক রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা বাঙলা দেশ পীড়িত হয়েছে সেগুলি দেশের লোকদের সারল্যও নষ্ট করেছে এবং ভিন্ন দেশবাসী ও পৃথক রীতিনীতি সম্পন্ন লোকদের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী লেনদেনের ফলে বাঙালীর কানে বৈদেশিক শব্দ আর অপরিচিত ঠেকে না।' (ভূমিকা: পৃষ্ঠা ২০-২১)।

হালহেদ তাঁর দীর্ঘ ভূমিকায় বাঙলা হরফের ইতিবৃত্ত সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন, এবং বাঙালীদের লিখন-পদ্ধতি প্রসঙ্গে লিখেছেন:

'বাঙালীরা আসনপিঁড়ি হয়ে বসে লিখে থাকেন। প্রাচ্যের সব ভাষা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লিখিত হয়, এ ধারণা ভুল। ভারতবর্ষ মহাদেশের অধিকাংশ ভাষাই ইয়োরোপীয় ভাষার মত বাঁ দিক থেকে ডান দিকে লেখা হয়ে থাকে। আর বাঙালীরা সূক্ষ্ম লেখনীর সাহায্যে হাত মুঠি করে (with the hand closed in which they hold the pen) লিখতে অভ্যস্ত।'

আরবী ও ফারসী কবিতার সঙ্গে বাঙলা পদ্যের তুলনা প্রসঙ্গে তিনি উদ্ধৃত করেছেন ভারতচন্দ্রের:

"সাধ কর্‌্যা সিখিলাম কাব্য রস জত।
কালার কপালে পড়্যা সব হৈল হত॥"

সত্যি, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বাঙলা ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষা করার ও শিক্ষা দেবার প্রাচীনতম প্রচেষ্টা হিসেবে হালহেদের ব্যাকরণ বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে যে শীর্ষস্থানীয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তখনকার দিনে বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ রচনা করতে গেলে যে বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হোত, হালহেদ নিজে তা জানতেন। তিনি তাঁর 'গ্রামারে'র ভূমিকায় সেকথা উল্লেখ করে লিখেছেনঃ

'ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং ন যযুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং॥'

'যে পথ আমি সাফ করতে যাচ্ছি তা পূর্বে কেউ মাড়ায় নি। আমাকে আপন নির্বাচিত পথ ধরেই চলতে হবে যেন ভাবী পথ-যাত্রীদের নির্দেশের জন্য আমি স্থায়ী পদচিহ্ন রেখে যেতে পারি।'

হালহেদের ভবিষ্যদ্‌বাণী যে ফলেছিল তার প্রমাণ কেরী। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বাঙলা ব্যাকরণে' কেরি তাঁর পূর্বসূরী হালহেদের কাছে ঋণের কথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে গেছেন। হালহেদের ব্যাকরণের পুরাতাত্ত্বিক মূল্য ছাড়া অপর মূল্যও রয়েছে। অবশ্য, ইতিপূর্বে বাঙলা ব্যাকরণ যে রচিত হয় নি, এমন নয়। হালহেদের ব্যাকরণের বহু পূর্বে রোমান ক্যাথলিক মানোএল-দা আস্‌-সুম্প্‌সাম্‌ পোর্তুগীজ ভাষায় বাঙলা ব্যাকরণ ও বাঙলা-পোর্তুগীজ শব্দকোষ সঙ্কলন করে গেছেন। তার মুদ্রণকাল ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ; রোমান লিপিতে ছাপানো হয় লিসবন শহরে। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের সম্পাদনায় ব্যাকরণটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক। পাদ্‌রী আস্‌-সুম্প্‌সামের ব্যাকরণটিই বাঙলা ভাষার আদি ব্যাকরণ বলে মনে করেন পণ্ডিতরা।

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী

A

GRAMMAR

OF THE

BENGAL LANGUAGE

BY

NATHANIEL BRASSEY HALHED.

ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নয়যুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং।।

PRINTED

AT

HOOGLY IN BENGAL

M DCC LXXVIII.

'হালহেদের গ্রামারে'র আখ্যাপত্র

BENGAL LANGUAGE. 37

মহাভারতের দ্রোনপর্ব্ব মধ্যে এক অধ্যায়

Mohaabaarotar dronporbbo mod,hya ak od,hyaayo
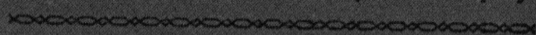
মুনিঃ বলে সুন পরিক্ষিতের তনয় ।
জেমতে সাত্যেকি বীর হইল পরাজয় ॥

Mooneeh bola ſoono Poreekhyeetar tonoyo
Jameta Saatyokee beero ho-ilo poraajoyo

এক কালে বসুদেব পিতৃশ্রাদ্ধ করে ।
নিমন্ত্রিয়া ভ্রাতৃ বন্ধু আনে সভাকারে ॥

Ak kaala Boſoodab peetree ſhraaddho kora
Neemontreeyaa bhraatree bondhoo aana ſobhaakaara

সোমদত্ত বাহ্লিক আদি আর পঞ্চানন ।
সালু শিশু আইল পাইয়া নিমন্ত্রন ॥

Somdot Baahleek aadee aar Ponchaanon
Saaloo ſheeſhoo aaeelo paaeeyaa neemontron

আইল অনেক রাজা নাহয় গননে ।
সভাকারে বসুদেব কৈল অভ্যর্থনে ॥

Aaeelo onak Raajaa naahoy gonona
Sobhaakaara Boſoodab ko-ilo obbyort,hona

নানা

'হালহেদের গ্রামারে'র একটি পৃষ্ঠা :—তখনকার বাংলা অক্ষরের নমুনা

হালহেদের ব্যাকরণের পর উইলিয়ম কেরীর ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় ১৮০১ খৃষ্টাব্দে। বাঙালীর লেখার মধ্যে রামমোহন রায় ইয়োরোপীয়দের বাঙলা শেখবার জন্য ইংরেজীতে এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে। তারই আদর্শে তাঁর সুবিখ্যাত 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত করেন কলকাতার স্কুল বুক সোসাইটী। এর পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৯৭।

হালহেদের ব্যাকরণ রচনার আর একটা দিক, বৃটিশ ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভব ও প্রচার। তাঁর পূর্বে এদেশে বাঙলা হরফের প্রচলন হয় নি। মিঃ বোল্টস্ নামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক কর্মচারী লণ্ডন শহরে বসে এ-বিষয়ে প্রথম চেষ্টা করেন বটে, তবে তিনি সফল হয়ে উঠতে পারেন নি। বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংস তখন সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত চার্লস উইলকিন্স্‌কে (ইনি পরে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ইংরেজী অনুবাদ করেন) অসমাপ্ত এ কাজ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। উইলকিন্স্ বাঙলা প্রাচীন পুঁথির হরফ ও খুস্‌খৎ মুন্সীদের হস্তাক্ষরের অনুকরণে বন্ধু হালহেদের গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য বাঙলা হরফ প্রস্তুতিতে ব্রতী হন। তিনি ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উচ্চতন কর্মচারী। জন্ম ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সমারসেটে। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে কোম্পানীর চাকরি নিয়ে তিনি বাংলায় আসেন। ইতিপূর্বে তিনি মাত্র কয়েকটি বাঙলা টাইপ প্রস্তুত করেছিলেন। এবার সবকটা বাংলা অক্ষর ও যুক্ত-বর্ণমালা সমান মাত্রা ও আকারে খোদাই করার অসাধ্য সাধনে আত্মনিয়োগ করলেন। এ ব্রতে একাই তিনি একশ'—নিজেই ছিলেন একাধারে তার এন্‌গ্রেভার, ফাউণ্ডার ও প্রিণ্টার। সাগরপারের দূর বিদেশীর হাতে গড়া বাঙলা অক্ষরগুলি শিল্পকলা ও লালিত্যে কতখানি উৎকৃষ্ট ছিল এখানকার প্রচলিত বাঙলা টাইপের সঙ্গে পাশাপাশি তুলনা করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

শুধু তাই নয়, হালহেদের একখানি বই ছেপেই মিঃ উইলকিন্স্ (পরে সার) ক্ষান্ত হন নি। তিনি তাঁর শ্রমলব্ধ অধীত বিদ্যা নিজ হাতে শিখিয়ে পড়িয়ে দান করে গেছেন বাঙালী পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর জামাই মনোহরকে বাঙলা মুদ্রণ শিল্পের ও বাঙলা সাহিত্যের প্রচারের স্থায়ী উত্তরাধিকারিরূপে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্ধকার যুগে দূর বিদেশী এক ইংরেজ নিজ অধ্যবসায়ে বাঙলা শিখে একখানি ব্যাকরণ রচনা করে তার শৃঙ্খলা ও গদ্য রচনার সৌকর্য সাধনে অগ্রসর হয়েছিলেন, বাঙলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে তা নিশ্চয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে এক প্রাচীন ও মূল্যবান নমুনা হিসেবে!

কথোপকথন

"হাড়ে ভেগো মাচকে যাবি কি না আতি তো কোয়া ২ করিছে মুই ফুকারছি তুই ঘুমাইছিস।

বা। এক কাপকড়ে অইয়াছে। হ্যাঁ ম্যাগ পড়িছে এখন কি জালে যাবাড় সময়। যা চেঁদে তুই মুইতো এখন যাব না কালি ঢেড় আতি থাকিতে গিয়াছিনু। যাড় বলে খাবার মাচ পেনু না তা তো আজি ম্যাগ পড়িছে।

হাড়ে ভাই ম্যাঘের ভয়ে মোদের কাম চলে না ত্যাবে তো মাগ ছাওয়ালকে ভাত কাপড় দিনু। তোর বড় দেখি সুকবাসের শড়ীল হইয়াছে।" [তিয়রিয়া কথা।]

'টেকচাঁদ ঠাকুর' বা প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালী ভাষায় রচিত কোন আখ্যায়িকার অধ্যায়-বিশেষ খুলে বসি নি। বসেছি কীটদষ্ট ধূসর বিবর্ণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একখানি পাঠ্য পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা। পুরোনো এই বইখানির প্রকাশকাল আঠারশ' এক খৃষ্টাব্দ। সাধারণ মানুষের বোধগম্য সহজ সরল চলতি ভাষায় রচিত গ্রন্থ প্রকাশের ষাট সত্তর বছর আগেই এর রচনা। নাম—ডায়ালগস্ বা কথোপকথন ঃ

Dialogues, intended to facilitate the acquiring of The Bengalee Language.

ছাপা—শ্রীরামপুর দি মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থকারের কোন নাম-ধাম ছিল না প্রথম সংস্করণের টাইটেল পেজ-এ। পরবর্তী সংস্করণ থেকে উইলিয়ম কেরীর নাম ছাপা হয়। তিনি এর গ্রন্থকার-সংকলক। ডায়ালগস্ বা কথোপকথন Colloquies নামেও পরিচিত। পৃষ্ঠা

সংখ্যা—প্রথম সংস্করণের ৮+২১৭। প্রথম সংস্করণের কপি কেবল এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরীতে আর লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে বলে জানা যায়। পরবর্তী সংস্করণের কপি অবশ্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আর আলিপুর বেলভেডিয়ারস্থ জাতীয় পাঠাগারে দেখেছি।

কোম্পানীর ফিরিঙ্গি আমলাদের দেশীয় কথ্য ভাষার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই 'কথোপকথনে'র সৃষ্টি উপভাষার নমুনা হিসাবে। কিন্তু তখনকার দিনের কলিকাতা-শ্রীরামপুর-সুন্দরবন অঞ্চলের সকল শ্রেণীর সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার, তাদের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতির পরিপূর্ণ এক সুন্দর আলেখ্য ফুটে উঠেছে এই কথোপকথনে। শুধু তাই নয়, ফিরিঙ্গিদের বাঙলা ভাষার ফ্রেজ বা ইডিয়ম শেখাবার জন্যে রচিত এই বইখানিই উত্তরকালে প্যারীচাঁদ ও দীনবন্ধু মিত্রকে সহজবোধ্য কথ্য ভাষার নতুন আঙ্গিকে সার্থক সাহিত্য রচনার পথ দেখিয়েছিল, বলা চলে। 'কথোপকথনে'র পূর্বে পোর্তুগীজ পাদরীদের 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' প্রভৃতি রোমান হরফে ছাপা বইয়ে পদ্মাপারের ভাওয়াল অঞ্চলের কথ্য ভাষা ব্যবহৃত হলেও তাকে ঠিক সাহিত্য পর্যায়ে ফেলা যায় না। কেননা, তার মূল বিষয়-বস্তু ছিল সাহিত্য প্রচার নয়, খৃষ্টধর্মের মহিমা কীর্তন। লেখকের শব্দভাণ্ডারও ছিল সীমাবদ্ধ। এদিক থেকে 'কথোপকথন' মৌলিকত্বের দাবী না করলেও বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে পথিকৃৎ হিসেবে স্থান তার অনেক উর্ধ্বে।

কেরী সম্পাদিত ও সংকলিত 'কথোপকথন' দ্বিভাষিক। অর্থাৎ, মূল বাঙলা এক পৃষ্ঠায় আর তার ইংরেজি অনুবাদ অপর পাতায়। অধ্যায় বা কাহিনী সংখ্যা মোট একত্রিশটি। তার মধ্যে ঃ চাকর ভাড়া করণ, সাহেবের হুকুম, সাহেব ও মুন্সি, পরামর্শ, ভোজনের কথা,

যাত্রা, পরিচয়, ভূমির কথা, মহাজন, আসামী, ভদ্রলোক ভদ্রলোক, প্রাচীন প্রাচীন, সুপারিশ, মজুরের কথাবার্তা, খাতক মহাজনি, সাধু খাতকি, ঘটকালি, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাটকরা, স্ত্রীলোকের কথোপকথন, তিয়রিয়া কথা, ইজারার পরামর্শ, ভিক্ষুকের কথা, কন্দল, যজমান যাজকের কথা, জমিদার রাইয়ত ও কথোপকথন—বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষের অধ্যায়টি থেকেই পুস্তকখানির বাঙলা নামকরণ।

'কথোপকথনে'র বিষয়বস্তুকে বিশেষজ্ঞরা মোটামুটি এ কয় ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ

(১) সাহেব লোকদের কথোপকথন—তাঁদের খানসামা ভাড়া-করণ, বাঙলা শিখবার আগ্রহ ইত্যাদি। এসব কথোপকথনে আরবী ফারসী শব্দের প্রভাব দেখা যায়। (২) দূর পল্লীর মধ্যবিত্ত পবিবারের ভদ্রলোক শ্রেণীর দৈনন্দিন জীবন যাত্রার আলাপ-পরিচয়। যেমন—প্রাচীন-প্রাচীন ; ভদ্রলোক-ভদ্রলোক ইত্যাদি। (৩) জমিদার-রায়ত—ভূমি সংক্রান্ত কথাবার্তা ; (৪) খাতক-মহাজন—মহাজন-আসামী সম্পর্কিত লেন-দেন সংক্রান্ত কথা। (৫) মেয়েদের —বিশেষ করে তখনকার অশিক্ষিত মেয়েদের কথোপকথন ; তাদের ঘরোয়া ব্যাপার, ঝগড়াঝাঁটি, রান্নাবান্নার খুঁটিনাটি চিত্র। (৬) জেলে, মজুর, ভিখারী প্রভৃতি সমাজের নিচের তলার লোকদের আলাপ। এদের সংখ্যা যদিও খুব অল্প, সহজ সরস বাঙলা উপভাষার প্রতীক হিসেবে তাদের অবদান কিন্তু অনেক। এ পর্যায়ে তিয়রিয়া কথা ; মজুরের কথাবার্তা ; ভিক্ষুকের কথা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের বেশীর ভাগই কথা চলতি ভাষায় লেখা। কয়েকটি রচিত বিশুদ্ধ সাধু ভাষায়।

'কথোপকথনে'র পৃষ্ঠায় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের বাঙলার বাস্তব সমাজ-জীবনের নিখুঁত এবং কৌতূহলজনক এক প্রতিচ্ছবি দেখতে

পাই। তখনকার আমলের সাহেব লোক, ভদ্রলোক, বেনে, ঘটক, জমিদার ও রায়ত থেকে শুরু করে চাষা, জেলে, মজুর, ভিখারী, নিচু জাতের গেঁয়ো স্ত্রীলোক—সমাজের নিচের তলায় সকল শ্রেণীর সাধারণ লোকের সন্ধান মেলে এই 'কথোপকথনে'র দর্পণে। আর এ কথনগুলি এত সরস ও সজীব যে, আজও পর্যন্ত তা টিকে আছে সাহিত্যের কষ্টিপাথরে। 'যাজক ও যজমান', 'ঘটক-ঘটকালী' প্রভৃতি কথোপকথনগুলি আমাদের রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' নাটকের উল্লিখিত ঘটকদের কথা মনে করিয়ে দেয়।

তখনকার দিনে আত্মীয়-কুটুম এলে—বিশেষ করে জামাই এলে—বাঙালী গৃহস্থ ঘরে রান্নার বহরের নমুনা দেখতে পাই 'স্ত্রীলোকের কথোপকথনে'। এক পল্লীবাসিনী অপর পল্লীবাসিনীকে জানাচ্ছে ঃ

…"আমাদের জামাই কালি আসিয়াছে রামমুনিকে নিতে। তাইতে শাকের ঘণ্ট সুক্তনি আর বড়া বাগুন ভাজা মুগের ডাইল ইলসা মাচের ভাজা ঝোল ডিমের বড়া আর পাকা কলাব অম্ল হইয়াছিল।

কে রান্ধেছিল বড় বৌ না মেঝে বৌ।

বড় বৌই রান্ধিয়াছিল। তিনি কুটনা বাটনা করে দিয়াছেন।

তোদের বৌ কেমন। রান্ধিতে-বাড়িতে পারে।

হাঁ বুন সেই বৈ আর কে রান্ধে মেয়েরা কেহ এখানে নাই আপনি কাঁচা বাচা নিয়া লড়িতে পারি না। সকল কাযি বড় বৌ করে ছোট বৌডা বড় হিজল দাগুড়া অঙ্গ লাড়ে না আর সদায় তার ঝকড়া কি করিব বুন সহিতে হয় যদি কিছু বলি তবে লোকে বলিবে দেখ এ মাগী বৌদের দেখিতে পারে না। কিন্তু বুন … … … … বড় বৌটি অতি ভাল এই

সংসারের কায কাম করে আর ছেলেপিলে খাওয়াইয়া আচিয়া দেয় আর আমারদের সেবাসুস্থ করে তাহার জন্যে আমার কোন ব্যামহ নাহি।" [স্ত্রীলোকের কথোপকথন]

তখনকার মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের মেয়েদের আলাপ আলোচনার এমনি আর একটা কথন উদ্ধৃত করা গেল :

"তোমারা কয় যা।

আমি সকলের বড় আমার আর তিন যা আছে।

কেমন যায় ২ ভাব আছে কি কালের মত।

আহা ঠাকুরাণী আমার যে জ্বালা আমি সকলের বড় আমাকে তাহারা অমুক বুদ্ধিও করে না।

অলো সকলেই কি একে।

না। তাহার মধ্যে ছোট ছুঁড়ী ভাল মানুষের মাইয়া সেইডি আমাকে উপরোধবাদ করে।

তবে তাহারি সাতে তোমার প্রীত আছে।

প্রীতি আছে বটে। কিন্তু সকলে অসৎ তাহাতে সেত সেই মত হয় বা।

সে এখন ছোট আছে তুই একটুক্ আস্থা মমতা করিস তবে সে তোরি কানোড়া হবেক।..." [স্ত্রীলোক ২ কথাবার্ত্তা।]

তখনকার সমাজ-চিত্রের একটা উদাহরণ :

"ফলানা পুত্রের বিবাহ দিয়াছে যথেষ্ট খরচ করিয়াছে।

কোন গ্রামে বিবাহ দিয়াছে। কাহার কন্যার সহিত।

রাধামোহনপুরে কমললোচন ঘোষের পুত্র রামচরণ ঘোষ তাহার কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছে।

আচ্ছা। তাহারাও জাত্যংশে ভাল বটে। উত্তম স্থানেই দিয়াছে ইহার ঘটকালি কে করিয়াছিল।

এ বিবাহের ঘটকালি রামচন্দ্রপুরের শ্যামসুন্দর বসুজা মহাশয় করিয়াছেন।

তাহা বটে। তিনি নলে আর কার সাধ্য এমন সম্বন্ধ করিতে পারে। ইহাতে ঘটকালি কি পাইয়াছে। তাহা জান।

জানি। তিনি ঘটকালি শবব এক শত টাকা পাইয়াছেন আর তান মর্য্যাদা পঁচিশ টাকা দিয়া কত সাধ্য সাধনা করিয়া বিদায় করিয়াছে।

হাঁ। তা করিবে। তবু তার উপযুক্ত বিদায় হয় নাই। তিনি যে কর্ম্ম করিয়াছেন তাহার উপযুক্ত বিদায় দুইশত টাকা আর এক যোড়া শাল মর্য্যাদা আর যে হয়।

অঃ মহাশয় এই যে খরচ করিয়াছে তাহাকে কি বলিব উহারে তো দিয়াছে আর উহার সঙ্গের দশ বারো জনকে বিদায় এক ২ জনকে দশ বারো টাকা করিয়া দিয়াছে। আর উহাকে কতই সহে !"…

[কথোপকথন]

ডায়ালগস্ বা কথোপকথনের ইংরেজী অংশের একটু নমুনা ঃ

"Haloo, Bhego, will you go afishing ?,' Tis getting light. I called : you was asleep.

'Aye, aye, this is an excuse. Hah ; it rains : is it time to go to the nets now ?, Go you to no purpose. I won't go now. Yesterday I went long before light ; by so doing I did not get fish to eat, and today it rains."
[Dialogues : 3rd. ed., pp. 56-57.]

আঠারোশ' শতকের শেষার্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুবা বাঙলায় কায়েমী হয়ে বসে। চাকুরীজীবী যে সকল বাঙালী মুসলমান আমলে ফারসী শিখে নবাব সরকারের কাজ করতেন, তাঁরা এখন ফারসী পড়া ছেড়ে কাজ-চলা গোছের ইংরেজী ভাষা

রপ্ত করে ইংরেজ সরকারের চাকুরী নিতে শুরু করেছেন এবং ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর প্রসাদপুষ্ট মধ্যবিত্ত এক "বাবু" শ্রেণী সৃষ্টি করতে লেগেছেন তা দেখতে পাই নিচের কথনে ঃ

"...তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা কেমন আছেন।

তাহারা মহারাজ চক্রবর্ত্তী তাহাদের সহিত কার কথা তাহার প্রতিযোগিতার লোক আমার দেশে নাই।

এবারে কোম্পানীর কায পাইয়া মহাধনাঢ্য হইয়াছে তাহারদের সমান ধনীলোক আমার দেশে চাকরি করিয়া কেহ হইতে পারেন নাই।

কেবল ধনীও নহে বিষয়ও অনেক করিয়াছে আজি লাগাএদ কম বেশ লাকো টাকার জমিদারি করিয়াছে।

সমস্তই ভাগ্যের বশীভূত দেখদিনি তাহারা কি ছিলেন এখনবা কি হইয়াছেন। এ আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে।

তাহারদের পূর্ব্ব বিবরণ আমরা সমস্তই জানি মাতাপিতার দুঃখের পরিসীমা ছিল না।

যত ক্ষণে বড় ভট্টাচার্য্য কিছু দিতেন তবেই সেদিন নির্ব্বাহ হইত নতুবা হরিমট্‌ক।" [ভদ্রলোক ২ প্রাচীন ২।]

তখনকার বাংলার অর্থনৈতিক দিক—বিশেষ করে চাষীদের দুঃখ-দুর্দশার চিত্রটিও কথোপকথনের দর্পণে ধরা দিয়েছে দেখতে পাই ঃ

মহাজন আসামি

'ওগো সুন্দর মণ্ডল কোথায় গেল।

সে ঘড়িখানেক হইল কাছারিতে গিয়াছে।

তোমার নাম কি। তুমি রামরুদ্র কি না বল।

হাঁ মহাশয় আমি রামরুদ্র তোমার কুড়ি টাকা লইয়াছি ধানের উপর।

ধানের কি হবে আর জল না হইলে রুপিতে পারিবা না। সে টাকা ফের দেও।

মহাশয় কি করিব নিম্পি ভূঁই রুপিয়াছি আর কিঞ্চিৎ বৃষ্টি হইলে বেবাক রুপিয়া দিব।

শুন তুই বড় আলস আর লোকের সব ক্ষেত হইল তোর ক্ষেত হয় না কেন।

মহাশয় আপনি জানেন মোর বেটির বিবাহ হইল তাহাতে দশ দিন গেল তারপর এক সাহেব আইল ও বেগার ধরিয়া লইল তিন দিন সে বড় মারিল তারপর কিছু দিল না মুই লাচার কি করিমু।

শুন তুই আমার টাকা ফের দেও সুদ সুদ্ধা তাহা না দিলে পেয়াদা দিব তোকে।

শুন মহাশয় যোড় হাতে নিবেদন করি কিস্তিবন্দি করিয়া মাসে মাসে এক টাকা শোধ করিমু। তাহার করার লিখিয়াদি।

তোর বলদ গাই গোটা তিন চারেক বেচিয়া টাকা শোধ কর আর কি।

মহাশয় তুই মা বাপ তোমার চরণ ছাড়িমু না মহাশয় আপনি বিচার করুন হাল গরু বিক্রি করিলে চাস চলিবে কেমন করিয়া।

তোর কথা শুনিব না আজি অর্দ্ধ টাকা দেও।

আমি পারিব না। মোর পিতার পরলোক হইল পর্স্যু হবে তাহার শ্রাদ্ধ ও ঠাকুরকে পনেরো টাকা না দিলে সে কায করিবে না ও আর দশজনকে খাওয়াতে হয় গরু গোটা সাতেক বেচিতে হবে। মোর দুঃখের সীমা কি।

গরু বিকেলে আমার টাকা শোধ হবে কেমনে তোর ঘরে আর সংস্থা নহে।

মহাশয় কপাল মন্দ কি করিতে পারি।……’

'কথোপকথন' কেরীর নামে চলে এলেও কিন্তু এর প্রথমদিকের দু-একটি কথন (বিশেষ করে চাকর ভাড়াকরণ, সাহেবের হুকুম, সাহেব ও মুন্সী ইত্যাদি) ছাড়া বাদবাকীর মূল রচনা যে কেরীর নয়—তিনি কেবল সংকলক মাত্র—একথা কেরী নিজেই ডায়াল্‌গস্‌-এর ভূমিকাতে স্বীকার করে গেছেন অকুণ্ঠে। তিনি লিখেছেন :

'এ গ্রন্থটিকে যথাসম্ভব সার্থক করে তুলতে আমি জনকয়েক বিবেচক 'নেটিভ' পণ্ডিত নিয়োগ করেছি। এঁরা ঘরোয়া কথোপকথন রচনা করে উল্লিখিত কথকদের স্বাভাবিক কথাবার্তার সঙ্গে পরিচয় করে দেবেন।' কেরীর নিযুক্ত 'বিবেচক নেটিভ'দের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ও রামরাম বসুই ছিলেন প্রধান। কথোপকথনের বেশীর ভাগ রচনা যে এঁদেরই তা 'প্রবোধ চন্দ্রিকা', 'রাজাবলি', বা 'লিপিমালা'র আলোচনা কালে পরে দেখতে পাব। কথোপকথনের মূল রচনাগুলির কৃতিত্ব সব কেরীর একার না হলেও কেরীর কেরামতি কিন্তু তাঁর কৃত উদ্যোগে, সংকলনে ও সম্পাদনে। ইংরেজী অনুবাদের কৃতিত্ব তো তাঁর নিজস্ব রয়েছেই।

ইতিহাসমালা

শ্রীরামপুর দি মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত আর একখানি যুগান্তরকারী পুরনো বই—'ইতিহাসমালা'। এর প্রকাশ—'কথোপকথনে'র পুরো এগারো বৎসর পর ১৮১২ খৃষ্টাব্দে। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩২০। 'কথোপকথনে'র মত 'ইতিহাসমালা'রও সম্পাদক-সংকলক হলেন কেরী, যদিও লং-এর প্রকাশিত বাংলা বইয়েব তালিকায় কিংবা আর কোথাও এ বইয়েব উল্লেখ নেই।

নামে ইতিহাসমালা হলেও 'ইতিহাসমালা' কিন্তু ইতিহাস নয়; গল্প-মালা। আকবর, বীরবল বা রাজা প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্রের উল্লেখ থাকলেও এ পুস্তকের বাদবাকি সব কাহিনীই প্রচলিত দেশী খোস গল্প: 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'হিতোপদেশ', 'পঞ্চতন্ত্র' প্রভৃতি সংস্কৃত গল্পগ্রন্থ, কোন কোনটি ফাবসী বা হিন্দুস্থানী উপকথা থেকে গৃহীত। কোনটি বা অনুবাদ। কিন্তু পড়ে অনুবাদ বলে মনেই হয় না কাহিনীগুলিকে। প্রসিদ্ধ রূপ ও সনাতনের কাহিনী আর খুল্লনা-লহনা প্রভৃতি নানা কথাই 'ইতিহাসমালা'র ইতিকাহিনী। কাহিনী সংখ্যা ১৫০টি। ভাষা প্রায় সর্বত্রই সহজ, সরস, সবেগ ও প্রাঞ্জল। পড়তে গিয়ে কোথাও হোঁচট খেয়ে থামতে হয় না দুরূহ আরবী-ফারসী বা কঠিন সংস্কৃত শব্দেব বেড়াজালে। শুধু সহজ ভাষা ও রচনা বিন্যাসের দিক থেকে নয়, সবস বিষয়বস্তু নির্বাচনের জন্য ইতিহাসমালা মনোরম ও মনোজ্ঞ। প্রথম প্রকাশিত সার্থক বাংলা গল্প-সংগ্রহ পুস্তকের ইতিহাসে এ বই বিশেষ পদমর্যাদা দাবী কবতে পারে। নমুনা হিসেবে 'ইতিহাসমালা'র কিছু কিছু অংশ নিচে উদ্ধৃত করা গেল:

প্রথম কথা

"বিন্ধ্যদেশে বীরপুর নগরে বীরসিংহ নামে রাজা ছিলেন তাঁহার সভাতে শ্রুতিধর নামা সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা এক পণ্ডিত থাকেন। একদিবস তিনি রাজাকে কহিলেন যে হে মহারাজ আমি অনেককাল পর্য্যন্ত আপনার নিকটে আছি কিন্তু আপনি আমার বিদ্যা বিবেচনা করিয়া কিছু ধনাদি দিলেন না এ কারণ আমার দীনত্ব দূর হয় না যদি আজ্ঞা দেন তবে আমি একবার অন্যদেশে যাই।···রাজা আজ্ঞা দিলেন যে এক মাসের অধিক থাকিও না। পরে সেই পণ্ডিত আপন বাটী হইতে সরঙ্গ দেশে সুশর্ম্মা নাম ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া অতিথি হইলেন। সেই দেশে সুবাহু নামে রাজা থাকেন তাঁহার সভাতে এক রাক্ষসী আসিয়া সমস্যা দেয়। রাজা সমস্যা পুরিতে না পারিয়া এক এক মনুষ্য প্রত্যহ রাক্ষসীকে দেন ইহাতে রাজ্য অনেক নষ্ট হইল।···

···প্রথম রাত্রি এক প্রহরের সময়ে রাক্ষসী সমস্যা দিলে পরে পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ সমস্যা পুরিয়া দিলেন এইরূপ আর তিন প্রহরে তিন-বার সমস্যা দিল তাহাও পূর্ণ পাইয়া রাক্ষসী সে রাজ্য ত্যাগ করিলেন। ···পর দিবস প্রাতঃকালে রাজা পণ্ডিতকে আনাইয়া পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা দিয়া বিদায় করিলেন। পণ্ডিত আপন দেশে আইলেন। অতএব বিদ্যা থাকিলে তাহার উপযুক্ত সম্মান অবশ্য হয়।"

এর সহজ-সরল রচনাভঙ্গি লক্ষ্য করবার। আরবী-ফারসী ও সংস্কৃত শব্দ কণ্টকিত যে যুগের বাংলায় এ কি করে সম্ভব তা ভাববার কথাও। কেরীর 'ইতিহাসমালা' যে যুগে লেখা হয় তখন বাংলা গদ্যে কমা, সেমিকোলন বা দাঁড়ির যথাযথ প্রয়োগের প্রচলন হয় নি। তাই 'ইতিহাসমালা' কি তখনকার ছাপা কোন বইতে কমা-সেমিকোলন দেখা যায় না।

আলোচ্য পুস্তকের প্রথম কাহিনীটির মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে যথাসম্ভব আধুনিক রূপ দিলে দাঁড়ায় ঃ

বিন্ধ্যদেশের বীরপুর নগরে বীরসিংহ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সভাতে শ্রুতিধর নামে এক পণ্ডিত থাকিতেন। তিনি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। একদিন তিনি রাজাকে কহিলেন ঃ

মহারাজ, আমি অনেক কাল আপনার নিকট আছি। কিন্তু আপনি আমাকে ধনাদি কিছু দিলেন না। এ কারণ আমার দীনতা দূর হয় নাই। যদি আপনি আজ্ঞা দেন আমি তবে একবার অন্যদেশে যাই।

রাজা অনুমতি দিলেন। কিন্তু বলিলেন ঃ একমাসের অধিক থাকিবেন না।

পণ্ডিত তখন আপন বাটী হইতে যাত্রা করিয়া সুরঙ্গ দেশে উপস্থিত হইলেন এবং সুশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া অতিথি হইলেন। সুবাহু ছিলেন ওই দেশের রাজা। তাঁহার রাজ্যে কোথা হইতে এক রাক্ষসী আসিয়া বড় উৎপাত সুরু করিয়াছিল। রাক্ষসী প্রতিদিন রাজসভায় আসিয়া রাজাকে একটি উদ্ভট প্রশ্ন করিত। রাজা সেই সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেন না। রাক্ষসী তখন রাজসভা হইতে একটি করিয়া লোক লইয়া যাইত ও তাহাকে খাইয়া ফেলিত। প্রত্যহ এমনই ঘটিতে লাগিল। এইভাবে রাজ্যের বহুলোক প্রাণ হারাইল।

রাজা তখন কাতর হইয়া রাজ্যের মধ্যে ঘোষণা করিলেন যে, কেহ যদি ঐ রাক্ষসীকে পরাস্ত করিতে পারে তিনি তাহাকে ৫০ লক্ষ টাকা দিবেন।

সুশর্মা আপন বাটী আসিয়া রাজার ঘোষণার কথা কহিলেন। পণ্ডিত শ্রুতিধর তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন ঃ

আমি রাক্ষসীকে পরাস্ত করিব।

সুশর্মা গিয়া রাজাকে পণ্ডিত শ্রুতিধরের ইচ্ছা জানাইলেন। রাজা তাঁহাকে অনুমতি দিলেন।

পণ্ডিত শ্রুতিধর সন্ধ্যাকালে রাজবাটীতে গিয়া রহিলেন। এইদিকে রাত্রি যখন এক প্রহর হইল, রাক্ষসী আসিয়া উপস্থিত হইল। রাক্ষসী পণ্ডিতকে জব্দ করিবার জন্য এক প্রশ্ন করিল। পণ্ডিত উহার সদুত্তর দিলেন। সমস্যা পূরণ করিলেন। এইভাবে প্রতি প্রহরে রাক্ষসী আসিয়া দেখা দিল এবং সমস্যা পূরণ করিতে বলিল। পণ্ডিত শ্রুতিধর উহা সঠিক সমাধান করিয়া দিলেন। রাক্ষসী তখন সেই রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে রাজার দূত আসিয়া দেখে যে পণ্ডিত বসিয়া আছেন। রাক্ষসী তাঁহাকে খাইয়া ফেলে নাই।

প্রতিশ্রুতি মত পণ্ডিত শ্রুতিধর তখন ৫০ লক্ষ টাকা লইয়া দেশে ফিরিলেন।

বিদ্যা থাকিলে তাহার উপযুক্ত সম্মান হইয়া থাকে। ইতি প্রথম কথা।

আধুনিক ধাঁচে ফেলা 'ইতিহাসমালা'র আরও দুয়েকটি নমুনা ঃ

টাকার গরব

পথের ধারে এক ইন্দুর গর্ত্ত করিয়া বাস করিত। কি করিয়া সে একটা টাকা পাইয়াছিল। টাকাটা সে সর্ব্বদা লুকাইয়া রাখিত। এবং টাকার বলে সকলের উপর পরাক্রম করিয়া বেড়াইত।

একদিন হাতিতে চড়িয়া দেশের রাজা ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। রাজাকে যাইতে দেখিয়া ইন্দুর রাজহস্তিকে চীৎকার করিয়া কামড়াইতে

গেল। তাহা দেখিয়া রাজা আশ্চর্য্যবোধ করিলেন। ভাবিলেনঃ এই শ্রেণীর লোকের এত বল বিনা অর্থে হয় না। অতএব ইহার নিকট ধন আছে।

রাজা ইহা চিন্তা করিয়া চাকর-বাকরদের আজ্ঞা করিলেনঃ দেখ ত' এ ইন্দুরের গর্ত্তে কি আছে?

রাজার চাকরেরা তখন ইন্দুরের গর্ত্ত খুঁড়িয়া একটা টাকা পাইল। টাকাটা তাহারা রাজাকে দিল।

এইদিকে ইন্দুর গর্ত্তে ঢুকিয়া টাকা দেখিতে না পাইয়া শোকে বড় কাতর হইল। ইহার পর আর কাহাকেও সে কামড়াইতে যায় নাই। ইতি—১৪৯তম কথা।

বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে

চিত্রাঙ্গদ নামে এক ব্রাহ্মণ কাশ্মীরে বাস করিতেন। তিনি ছাত্র পড়াইয়া জীবন ধারণ করিতেন। উগ্রজজ্ঞ নামে তাহার এক পুত্র ছিল। সে সব সময় অন্যের অনিষ্ট করিয়া বেড়াইত ও সারাদিন পাশা খেলিয়া দিন কাটাইত। উগ্রজজ্ঞের জন্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে ব্রাহ্মণের প্রায়ই কলহ হইত। তাই চিত্রাঙ্গদ দুঃখিত ছিলেন।

একদিন চিত্রাঙ্গদ আপন পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেনঃ দেখ উগ্রজজ্ঞ, বিদ্যার সমান ধন আর নাই। এ ধন ব্যয় করিলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অন্যান্য ধন ব্যয় করিলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বিদ্বান ব্যক্তি নম্র হইয়া থাকে। বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে। তাঁহাকে সকলে সম্মান করে। কিন্তু তুমি জীবনে এ অমূল্য ধন উপার্জ্জন করিলে না। তোমার দুষ্ট ক্রিয়াতে আমি সর্ব্বদা লজ্জিত থাকি। এরূপ অবস্থায় তোমার মরাই ভাল। চিত্রাঙ্গদ পুত্রকে এভাবে ভৎ'সনা করিয়া অধ্যাপনা করিতে বাহির হইলেন।

উগ্রজজ্ঘ পিতার বাক্যে লজ্জিত হইয়া বিদ্যা উপার্জ্জনের জন্য বিদেশে গমন করিলেন। বহুকাল বিদেশে অধ্যয়ন করিয়া তিনি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পিতার নিকট আসিয়া কি কি শিক্ষা করিয়াছেন তাহা জানাইলেন।

পিতা পুত্রের বিদ্যাপাঠে সন্তুষ্ট হইলেন এবং খুশী হইয়া তাহাকে নানা দ্রব্য খাওয়াইলেন ও নূতন কাপড়াদি দিলেন।

অতএব কষ্ট না করিলে বিদ্যা শিক্ষা হয় না। ইতি—উনবিংশতি কথা।

রূপ-সনাতন গোস্বামীর কাহিনী

"রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী দুই সহোদর ভ্রাতা পূর্ব্বে ছিলেন তাহার মধ্যে রূপ গোস্বামী সিদ্ধ পুরুষ সনাতন গোস্বামী সাধক পুরুষ ছিলেন ঐ দুই ভ্রাতা সর্ব্বদা তীর্থ পর্য্যটন করিতেন ইতোমধ্যে জগদীশ্বরী দুর্গা তাহারদিগের যথার্থ বুঝিবার নিমিত্তে পথিমধ্যে এক মায়া নদী সৃষ্টি করিয়া আপনি নীচ জাতীয় স্ত্রী বেশ ধারণ করিয়া অজস্র তাম্বুলাদি চর্ব্বণ করিতেছেন এবং আপনার চতুর্দ্দিক্ষু চর্ব্বিত তাম্বুলাদি ক্ষেপ করিতেছেন ইতোমধ্যে রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী তীর্থ পর্য্যটন করিতে ২ সেই পথিমধ্যে উপস্থিত হইয়া ঐ মায়া নদী দেখিয়া চিন্তিত হইলেন পশ্চাৎ তত্তীরে ঐ স্ত্রীলোক সন্দর্শন করিয়া তথাতে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এই নদী পার হইবার উপায় কি। ঐ স্ত্রীলোক কহিলেন যে ব্যক্তি আমার উচ্ছিষ্ট ক্ষিপ্ত তাম্বুল ভোজন করিবে সেই ব্যক্তি অনায়াসে পার হইবেক এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সিদ্ধ পুরুষ

রূপ গোস্বামী তদুচ্ছিষ্ট তাম্বুল খাইবামাত্র মায়া নদী বোধ করিয়া অনায়াসে পদব্রজে গমন করিয়া পুনরন্য প্রকৃত নদীতীরে তপস্যা করিতে লাগিলেন সনাতন গোস্বামী ঘৃণা করিয়া পরাবৃত্ত হইলেন পশ্চাজ্জগন্মাতা তাহারদের যাথার্থ্য বোধ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর সনাতন গোস্বামী এক বাদশাহের নিকটে ওপস্থিত হইয়া ভূত ভবিষ্যদ্বর্ত্তমান প্রশ্ন দ্বারা অতিশয় প্রতিপন্ন হইলেন এবং যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করিলেন পশ্চাৎ আপনার এক বাটী নির্ম্মাণ করাইবার নিমিত্তে এক ব্রাহ্মণের বাটীর নিকটে উত্তম স্থান দেখিয়া নির্ণয় করিলেন কিন্তু সেই ব্রাহ্মণের বাটী না ওঠাইলে বাটী উত্তমা হয় না এ কারণ ঐ ব্রাহ্মণকে আনাইয়া কহিলেন হে ব্রাহ্মণ তুমি যদ্যপি তোমার বাটীর মূল্য লইয়া স্থানান্তরে বাটী নির্ম্মাণ কর তবে আমার বাটী উত্তমা হয় ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন আমার পৈতৃক বাটী অতিশয় মমত্বপ্রযুক্ত আমি কদাচ ত্যাগ করিতে পারিব না পশ্চাৎ সনাতন কহিলেন পরোপকার নিমিত্তে অনেক ব্যক্তি পৈতৃক স্থান ত্যাগ করিয়া থাকেন অতএব আমি লক্ষ টাকা তোমাকে দান করি তুমি স্থানান্তরে বাটী কর এই বাক্যেতে ব্রাহ্মণ স্বীকৃত না হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সনাতন জোর করিয়া সেই ব্রাহ্মণের বাটী উঠাইয়া আপন বাটী নির্ম্মাণ করিয়া স্বচ্ছন্দে বসতি করিতে লাগিলেন। পশ্চাৎ ঐ ব্রাহ্মণ রোদন করিয়া পথে ২ ভ্রমণ করিতে ২ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া রূপ গোস্বামীর নিকটে উপস্থিত হইয়া তথাতে আত্ম-বৃত্তান্ত কহিলেন রূপ গোস্বামী শর্করা মধ্যে য রী র লা ই র ন ঘ এই অষ্টাক্ষর লিখিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন ও কহিলেন এই লিপি সনাতন গোস্বামীকে দিবামাত্র তোমার স্থান তুমি পাইবা ব্রাহ্মণ সেই লিপি লইয়া সনাতন গোস্বামীকে দিলেন সনাতন গোস্বামী দৃষ্টি করিয়া ঐ অষ্টাক্ষরানুসারে এক শ্লোক

করিলেন যথা যতুপতেঃ ক্বগতা মথুরা পুরী রঘুপতেঃ ক্ব গতো উত্তরকোশলা ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং ন সদি দং জগদিত্যধারয় ইহার অর্থ এই যতুপতি যে কৃষ্ণ তাঁহার মথুরাপুরী কোথা গেল ইহা বিবেচনা করিয়া মনস্থির কর এ জগৎ অনিত্য ইহা নিশ্চয় জান এই শ্লোকার্থ বুঝিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে আপন বাট্যাদি দিয়া সনাতন আপন ভ্রাতার অনুগত হইয়া তপস্যাতে নিযুক্ত হইলেন ইতি—১০৯তম কথা।"

'ইতিহাসমালা'ব এমনি আর একটি 'ইতিহাস' ঃ

"এক নগর মধ্যে অতিশয় ধনবান এক বণিক ছিল তাহার অতিশিশু এক পুত্র ছিল কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে সেই বণিকের মৃত্যু হইল পশ্চাৎ ঈশ্বরেচ্ছাপ্রযুক্ত সমস্ত ধনাদি ক্ষয় হইতে লাগিল তাহাতে সেই বণিকের স্ত্রী অতিদুঃখিতা হইয়া বিবেচনা করিয়া অবশিষ্ট দুইখানি স্বর্ণের ইষ্টক ছিল তাহা লইয়া সেই নগরে কোন ধনি বণিকের নিকট অর্পণ করিল ও কহিল আমি অতিদুঃখিতা হইয়াছি এ কারণ পিত্রালয়ে গমন করিব আমার পুত্র প্রাপ্তব্যবহার হইলে পর তোমার নিকট হইতে দুইখানি স্বর্ণের ইষ্টক লইব এইরূপ কহিয়া পিত্রালয়ে গমন করিল বণিকও সেই ধন আত্মসাৎ করিল। কিছুদিন পরে সেই বণিকের পুত্র প্রাপ্তব্যবহার হইয়া আপন মাতার সমভিব্যাহারে সেই ধনিকের নিকটে উপস্থিত হইয়া দুইখানি স্বর্ণের ইষ্টক চাহিল পশ্চাৎ ঐ ধনিক হাস্য করিয়া কহিল হে বণিকের পুত্র তুমি অতি নির্ব্বোধ আমার স্থানে সুবর্ণ ইষ্টক নাই এবং তোমার মাতা স্ত্রীস্বভাবা তাহার কথাতে বিশ্বাস করিও না। আর শুন তোমার পিতার স্বর্ণের ইষ্টক ছিল এই কথা শ্রবণ করিয়া নগরস্থ লোক তোমাকে উন্মত্তপ্রায় বোধ করিবেক এ কথা কহিয়া তাহাকে বিমুখ করিল। পশ্চাৎ তাহার মাতা আপন পুত্রকে লইয়া রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত কহিয়া অভিযোগ করিল। রাজা তৎ কথা শ্রবণ করিয়া সেই বণিককে আনয়ন

করিয়া কহিলেন হে বণিক এই স্ত্রীলোক তোমার স্বর্ণের ইষ্টক অর্পণ করিয়াছিল তুমি কি কারণ দেও না বণিক কহিল মহারাজ আপনি দুষ্টদমক শিষ্টপ্রতিপালক মহারাজের বিচারে প্রতিপন্ন হইলে আমি অবশ্য দিব কিন্তু আমার স্থানে স্বর্ণের ইষ্টক অর্পণ করে নাই এইরূপ বণিকের কথায় রাজা প্রমাণাদি দ্বারা প্রতিপন্ন না করিতে পারিয়া সেই নগরে এক প্রত্যক্ষ দেবতা আছেন সেই স্থানে উভয় ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলেন এবং ঐ স্ত্রীলোককে কহিলেন তুমি তথাতে গিয়া শপথ দ্বারা ধন অর্পণ করিয়া থাক এমত প্রতিপন্ন হয় তবে আমি অবশ্য দেওয়াইব রাজার এই বচনানুসারে তথা গিয়া দশজন উত্তম মনুষ্যকে প্রমাণ রাখিয়া কহিল আমি পুত্রের মস্তকোপরি হস্ত অর্পণ করিয়া কহিতেছি যদ্যপি এই বণিকের নিকটে সুবর্ণের ইষ্টক অর্পণ না করিয়া মিথ্যা কহি তবে এ পুত্র মরিবেক নতুবা জীবিত থাকিবেক পশ্চাৎ সেইরূপ শপথ করাতে বণিকপুত্রের মৃত্যু হইল। পরে তাহার মাতা বিস্ময়াপন্না হইয়া রোদন করিতে লাগিল পশ্চাৎ ঐ বণিক রাজসন্নিধানে গিয়া কহিলেক হে মহারাজ এ স্ত্রীলোক শপথ করিলে পর তাহার পুত্রের মৃত্যু হইল অতএব আমার নিকট ইষ্টক অর্পণ করে নাই তাহা প্রমাণ হইল এই কথা কহিয়া বণিক আপন স্থানে প্রস্থান করিল ইতোমধ্যে এক সিদ্ধ পুরুষ আগমন করিয়া ঐ স্ত্রীলোককে কহিলেন হে স্ত্রীলোক তুমি নির্ব্বোধা ঐ ব্যক্তির স্থানে যে ধনার্পণ করিয়াছ তাহার দ্বিগুণ করিয়া শপথ করিলে পর পাইতে পার এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজসন্নিধানে গিয়া পুনর্ব্বার সেই বণিককে আনয়ন করিয়া পুনঃ দেবতা স্থানে প্রেরণ করিলেন তথাতে সেইরূপ শপথ করিলে পর তাহার পুত্র জীবিত হইল। পশ্চাৎ ঐ স্ত্রীলোক ঐ বণিককে লইয়া রাজসন্নিধানে গিয়া কহিলেন হে মহারাজ চারিখানি স্বর্ণের ইষ্টক অর্পণ করিয়াছিলাম তাহা শপথ করিবামাত্র

প্রতিপন্ন হইল এই কথা শ্রবণ করিয়া বণিক ভীত হইয়া কহিতেছে হে মহারাজ এ কথা মিথ্যা কিন্তু দুখানি স্বর্ণের ইষ্টক আমার স্থানে অর্পণ করিয়াছিল আজ্ঞা হয় তবে সেই দুইখানি ইষ্টক আনয়ন করিয়া আপন সন্নিধানে উপস্থিত করি রাজা তাহার এ বাক্য শ্রবণ করিয়া ইষ্টক আনিয়া ঐ স্ত্রীলোককে দিলেন।

অতএব পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন সরল ব্যক্তির সহিত সারল্য করিবেক শঠ ব্যক্তির সহিত শাঠ্য করিবেক ইতি—১১০তম কথা।"

'ইতিহাসমালা'র শেষ গল্পের শেষের দিকটা ভারী মজার। গাঁয়ের এক পল্লী যুবক একবার ছয় গণ্ডা মাছ ধ'রে তার বউকে রাঁধতে বলে। বউ রান্নার পর তরকারী চাখতে গিয়ে একটি একটি করে ২৩টি মাছ খেয়ে ফেলে। তারপর স্বামী খেতে বসলে মাছের হিসেব দেয়ঃ

"মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা।
চিলে নিলে দুগণ্ডা॥
বাকী রহিল ষোল।
তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল॥
তবে থাকিল আট।
দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাঠ॥
তবে থাকিল ছয়।
প্রতিবাসিকে চারিটা দিতে হয়॥
তবে থাকিল দুই।
তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই॥
তবে থাকিল এক ঐ পাত পানে চাহিয়া দেখ।
এখন হইস যদি মান্সের পো।
তবে কাঁটাখান খাইয়া মাছখানা থো॥
আমি যেই মেয়ে তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে……"

একদা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দূর সাগরপারের ইংলণ্ডের নরদাম্টন-শায়ার থেকে পাদ্রী উইলিয়ম কেরী এসেছিলেন বাংলায়। কিন্তু তিনি কেবল ধর্মপ্রচারেই ক্ষান্ত হননি। বাংলা ভাষা—বিশেষ করে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের এক সুষ্ঠু বলিষ্ঠ রূপও দিয়ে গেছেন। যে যুগে বাংলাভাষা একদিকে আরবী-ফারসী আর টুলো পণ্ডিতের সংস্কৃত ভাষার চাপে পিষ্ঠ হতে বসেছিল, সে যুগে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ও মুন্সীদের সাহায্যে বাংলা ভাষাকে উদ্ধার করে তার নতুন গতিবেগ দান করেছেন। মৌলিকত্বের দাবী তিনি কোনদিন করেননি। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তাঁর দান হোল "উদ্দাম, উদ্যোগ, অধ্যবসায় ও জীবনভোর সাধনার।" ভারতীয় ভাষা—বিশেষকরে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের—তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সেবক। তার সৌন্দর্য ও সৌকার্য সাধনাই ছিল তাঁর ব্রত। বাংলাভাষা শিক্ষা-সহায়ক পুস্তকের অভাব দেখেই বিদেশী এই ধর্মযাজক বাংলা পাঠ্য-পুস্তক সংকলনে উদ্যোগী হয়েছিলেন, শ্রদ্ধাবনত শিরে একথা শুধু আজ স্মরণ করলেই যথেষ্ঠ হবে।

বোধেন্দু বিকাস নাটক

'ও কথা, আর বোলো না, আর বোলো না,
বল্‌ছ-বঁধু, কিসের ঝোঁকে ?
এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা,
হাস্‌বে লোকে। হাস্‌বে লোকে ॥
বল হে, জ্বোল্‌বো কত, বোল্‌বো কত,
বোল্‌তে হোলো মনের দুখে। মনের দুখে।
এ বড়, অনাসৃষ্টি, বিষম সৃষ্টি, সুধা বৃষ্টি,
সাপের মুখে। সাপের মুখে ॥
কাণার চোখে চশমা দিয়ে, কার্য্য কিবা আছে।
পতিব্রতা ধর্ম্মকথা, বারাঙ্গনার্ কাছে ॥
কালার কাছে কাব্যকথা, কি তোমার ভ্রান্তি।
চোরের কাছে পুণ্যকথা, বীরের কাছে শান্তি ॥
রসের কথা বোল্লে ভাল, এমন্ রসিক চাইতো।
তোমার মত রসের সাগর কোনখানে নাইতো
বোঝাপড়া হবে পরে, ঘরে আগে যাইতো।
তাইতো বটে, তাইতো বটে, তাইতো,
তাইতো, তাইতো ॥......"

গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২—১৮৫৯) 'বোধেন্দু বিকাস' নাটকের প্রস্তাবনায় নটীর উক্তি। সংস্কৃত-প্রকৃতি ছন্দের খাঁটি বাংলা এক্সপেরিমেণ্ট—তার সার্থক অনুশীলন। আজকের কথা নয়। প্রায় শ'খানেক বছর আগেকার লেখা। সুতরাং ভুল হবারই কথা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কৈশোর মনেও দানা বেঁধেছিল সংশয়। মনে হয়েছিল

বুঝি নতুন ছন্দে অমন সুন্দর কবিতা কে আর লিখতে পারেন সে যুগে! এটি বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথেরই লেখা হবে হয়তো। 'জীবনস্মৃতিতে' এর প্রথম কয় ছত্র তাই বলে উল্লেখ করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। (রবীন্দ্র-রচনাবলী—সপ্তদশ খণ্ড।)

ছন্দপটু গুপ্তকবি কেবল সংস্কৃত ছন্দের সার্থক এক্সপেরিমেণ্ট করেই ক্ষান্ত হননি। বাংলার নিজস্ব বাউল সুরটিও ধরা দিয়েছে তাঁর 'দিগম্বর সিদ্ধান্তে'র সখেদ গানে ঃ

'মনরে আমার কর ভ্রম পরিহার।
না জেনে অহং, কেন, কর অহঙ্কার ॥
মিছি আঁচে তুলে আঁচ, করিতেছ সাতপাঁচ,
করিতেছ কত কাচ্, অশেষ প্রকার।
পাঁচে করি পাঁচাপাঁচি, আঁচে কর আঁচাআঁচি,
এদিকে, যে, কাছাকাছি হ'য়েছে তোমার।

* * * * *

একাকারে এলে দেশে, একাকারে যাবে শেষে,
একেতেই হ'বে শেষ সব একাকার।......'

(৩য় অঙ্ক)

এমনি আর এক বাউল গানের প্যারডি। নিজের গুণ-গরিমা জাহির করতে গিয়ে 'বিভ্রমাবতী'র গান ঃ

'দিন্ দুপুরে চাঁদ উঠেছে, রাৎ পোয়ানো ভার।
হোলো পূন্নিমেতে আমাবস্যা,
তেরো-পহর অন্ধকার ॥
এসে বেন্দাবনে বোলে গেল, বামী-বষ্টমী।
একাদশীর দিনে হবে, জন্ম-অষ্টমী ॥

বোধেন্দু বিকাস নাটক।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ।

অর্থাৎ

স্বভাবানুযায়ি বর্ণন।

মঙ্গলাচরণ।

সংগীত।

রাগিণী কেদার! তাল তিওট।

মনরে আমার! একি ভ্রান্তি তোমার॥
ভাবনা কেন রে? ভাব না কেন রে?
অরূপ স্বরূপ সার।
শিশির, বসন্ত, নিদাঘ, বৃষ্টি,
যেজন করিল এ সব সৃষ্টি,
যে জন দিয়েছে নয়নে দৃষ্টি,
তাঁরে ভাব একবার॥
দিবাকর, নিশাকর, লোচে যার ভাস।
দিবা নিশি, করে করে, তিমির বিনাশ।
নিয়ত নিয়ম করিয়া লক্ষ,
রাশি রাশি রাশি, প্রকাশে পক্ষ,
অহরহ সহ করিয়া সখ্য,
বারবার ভ্রমে যায়॥ ১
অনিত্য বিষয়ে কেন, ভ্রম ভবমাঝে?।
ভজ নিত্য, নিত্যবিত্ত, চিত্ততীর্থবাসে॥
হৃদয়-নিলয়ে পরম-রতন,
সে ধনে তুমি হে না কর যতন,
বৃথায় করিছ শরীর পতন,
অসার ভাবিয়া সার॥ ২

তরঙ্গলহরীচ্ছন্দ।

জয় জয় জয় ব্রহ্ম, নিত্য-নিরঞ্জন।
জয় নিত্য-নিরঞ্জন॥
নির্ব্বিকার, নির্ব্বিহার, অজ্ঞানভঞ্জন।
জয় অজ্ঞানভঞ্জন॥
মিথ্যা ভব মিথ্যা সব, তাহে সত্য অনুভব,
স্বরূপ স্বরূপ তব, জানে কোন্ জন।
রবি করে যেপ্রকার, বোধ হয় নীরাকার,
নিরাকারে সে প্রকার, সাকার সাধন॥
আছে কার সার জ্ঞান, মিথ্যায় সত্যের ভান,
ভ্রমে করি অনুমান, করি নিরূপণ।
সৃজন, পালন, লয়, তোমা হোতে সব হয়,
তুমি এই সমুদয়, কারণকারণ॥
বাক্য মন অগোচর, পরমাত্মা পরাৎপর,
করিয়াছ চরাচর, বিশ্ব-বিরচন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর 'বোধেন্দু বিকাস নাটকের' প্রথম পৃষ্ঠা।

১০৮

আমারদের জামাই কালি আসিয়াছে রামমুনিকে নিতে। তাইতে শাকের ঘন্ট সুকতনি আর বড়া বাগুন ভাজা মুগের ডাইল ইলসা মাছের ভাজা ঝোল ডিমের বড়া আর পাকা কলার অম্ল হইয়াছিল।

কে রান্ধেছিল বড় বৌ না মেঝো বৌ।

বড় বৌই রান্ধিয়াছিল তিনি কুটনা বাটনা করে দিয়াছেন।

তোদের বৌ কেমন। রান্ধিতে বাড়িতে পারে।

হাঁ বুন সেই বৈ আর কে রান্ধে মেয়েরা কেহ এখনে নাই আপনি কাঁচা বাচা নিয়া নড়িতে পারি না। সকল কায বড় বৌ করে ছোট বৌডা বড় ছিজল দাগুড়া অঙ্গ নাড়ে না আর সদায় তার ঝকড়া কি করিব বুন সহিতে হয় যদি কিছু বলি তবে লোকে বলিবে দেখ এ মাগী বৌদের দেখিতে পারে না। কিন্তু বুন কালা হাঁড়ি পানে চেয়ে বড় বৌটি অতি ভাল এই সংসারের কায কাম করে আর ছেলে পিলে খাওয়াইয়া আচিয়া দেয় আর আমারদের সেবা সুস্রূ করে তাহার জন্যে আমার কোন ব্যামহ নাহি।

কেরীর 'কথোপকথনের' একটি পাতা : তখনকার কথ্যভাষার নমুনা

আর্ ভাদ্দর্ মাসের্ সাতুই পোষে,
চড়ক্ পূজোর্ দিন্ এবার। ১
সেই ময়্রা মাগী মোরে গেল, মেরে বুকে শূল
বামুনগুলো ওষুদ্ নিয়ে মাথায় বোচ্চে চুল,
কাল্ বিষ্টিজলে ছিষ্টি ভেসে,
পুড়ে হোলো ছারে খার ॥......২'

(২য় অঙ্ক)

অথবা, এমনি এক হাল্কা ধরনের কবিতা [বিনোদিনী ছন্দ।] ঃ

'ছুঁড়ীগুলো ছেলে-বেলা, নাহি করে ছেলে খেলা,
পাকা-পাকা কথা কয়, মন সব খুলেছে।
দেখিলাম ঘরে ঘরে, পূর্ব্বভাব নাহি ধরে,
সাঁজ্ সেঁজোতির ব্রত, সকলেই ভুলেছে॥
বেঁকে বেঁকে পথ হাঁটে, তেড়া কোরে সিঁতি কাটে,
গরবিণী হোয়ে সব, গরবেতে ফুলেছে॥...
কে আঁটে মুখের সাটে, পুরুষের কাণ কাটে,
সুখভোগ-আশা-হাটে, ইচ্ছাধ্বজা তুলেছে॥
যখন যেমন ধরে, তখনি তেমন করে,
নাহি রাখে কোন ক্ষোভ, লোভ দোলে দুলেছে।
পতির কি সাধ্য হয়, মত ছাড়া কথা কয়,
অধীনতা দড়ি ধোরে, কত নীচে ঝুলেছে॥
শ্বশুর শ্বাশুড়ী কেবা, কেবা তার করে সেবা,
নিজ নিজ কর্ম্মভোগ কূপে তারা উলেছে।
বাপ-মায় কেবা মানে, নারীই সর্ব্বস্ব জানে।
বধূ-প্রেম মধুপানে, যুবকেরা ঢুলেছে।'

'বোধেন্দু বিকাস' গদ্য ও পদ্যের ছয় অঙ্কের প্রকাণ্ড রূপক নাটক। 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়'-এর অনুকরণে রচিত হলেও গুপ্ত কবির হাতে পড়ে 'বোধেন্দু বিকাসে'র ভোল যায় বদলে। সংস্কৃতের মুখোস বদলে গিয়ে হয়ে পড়ে খাঁটি বাংলা বস্তু। কলেবরও পায় বৃদ্ধি। নতুন নতুন সংস্কৃত ছন্দের শুধু সার্থক অনুশীলন তিনি করেননি, নিজের রচিত বহু গান ও কবিতাও সংযোজিত করেছেন নাটকখানির মধ্যে। গুটিকয়েক হিন্দী গানও সন্নিবেশিত হয়েছে বইখানিতে। তরঙ্গ লহরী, রণরঙ্গিনী, শেফালিকা, উন্মাদিনী, পাঞ্চাল প্রভৃতি বহু সংস্কৃত ছন্দকে তিনি চালু করতে চেষ্টা করেছেন বাংলা ভাষায়। বাংলা ও হিন্দি মিশ্রিত তাঁর মধুর ভজন ও দোঁহাগুলোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন এককালে রামগতি ন্যায়রত্ন মশাই তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' সমালোচনা গ্রন্থে।

'বোধেন্দু বিকাস' নাটক গুপ্ত কবির পরিণত বয়সের (মাত্র ৪৭ বৎসর কাল তো বেঁচেছিলেন!) রচনা। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের সংস্কৃত নাটক 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' অবলম্বনে গদ্য ও পদ্যে রচিত হয় নাটকখানি। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাতে প্রথম এটি প্রকাশিত হতে থাকে ১২৬৪ সালে ধারাবাহিকভাবে।

কবির জীবিতকালে নাটকখানির অংশবিশেষ বইয়ের আকারে বেরিয়েছিল কিনা জানা যায় না। তবে কবির মৃত্যুর চার বছর পর তাঁর ছোট ভাই রামচন্দ্র গুপ্ত 'বোধেন্দু-বিকাসের' প্রথম খণ্ড (অসম্পূর্ণ প্রথম তিন অঙ্ক মাত্র) প্রকাশিত করেন ১২৭০ সাল —ইং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪০। 'বোধেন্দু বিকাসের' পরবর্তী অংশ—বাকী তিন অঙ্ক—তিনি আর বইয়ের আকারে প্রকাশিত করে যেতে পারেননি। গুপ্ত কবির দৌহিত্র [রামচন্দ্রের একমাত্র কন্যার পুত্র] মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত 'ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলীর

২য় খণ্ডে [২০১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত; ১৩০৮। মূল্য ৪ টাকা।] এর পুরোপুরি সবটা প্রকাশিত হয় অনেক বছর পরে। এক সঙ্গে ছয় অঙ্ক পূর্ণাঙ্গ নাটকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৭৪। শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই ১২৭০ সালে প্রকাশিত 'বোধেন্দু বিকাসের' প্রথম তিন অঙ্কের অসম্পূর্ণ পুস্তকেরই কেবল উল্লেখ করে গেছেন। পরবর্তী কালে গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত সম্পূর্ণ নাটকটির উল্লেখ নেই কোন সাহিত্য ইতিহাসের বিব্‌লিওগ্রাফিতে।

বোধেন্দু বিকাসের প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকায় সংবাদ-প্রভাকর সম্পাদক শ্রীরামচন্দ্র গুপ্ত জানিয়েছেন ঃ

"মদগ্রজ মহাকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের রূপক প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক সুললিত গদ্য-পদ্য পূরিত "বোধেন্দু-বিকাস" নামক যে নাটক বিরচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ছয় অঙ্কে সমাপ্ত হইয়াছে, এইক্ষণে আমি এই প্রথম ভাগে তাহার প্রথম তিন অঙ্ক মুদ্রাঙ্কণ করিয়া সাধারণ সমাজে প্রকাশ করিলাম, এই মহোপদেশপূর্ণ পরম-জ্ঞানানন্দপ্রদ নাটক প্রথমতঃ মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কবিবর ইহার কোন কোন স্থান পুনর্ব্বার সংশোধন, পরিবর্ত্তন এবং নূতনরূপে রচনা করেন, মূলগ্রন্থে যেরূপ আছে, তাহা অপেক্ষা বিষয়ের স্বভাব বর্ণনা করাতে গ্রন্থখানি অনেক বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং একভাগে সমুদয়াংশ প্রকাশ করা বিবেচনাসিদ্ধ হইল না, বিশেষতঃ তাহাতে আবার কাল বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা, এই নাটকের উদ্দিষ্ট বিষয়টী বাহিরের নহে, তাহা আন্তরিক, সুতরাং অত্যন্ত কঠিন বলিতে হইবেক, ফলতঃ সেই-আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান যত দূর পর্য্যন্ত সহজে প্রকাশ করা যাইতে পারে, কবিবর পাঠকবৃন্দের উপকার নিমিত্ত তাহাতে প্রযত্ন ও

পরিশ্রম করণে ত্রুটি করেন নাই। যাঁহারা এই নাটকের অভিনয় প্রদর্শনে অনুরত হইবেন, তাঁহারদিকের কার্য্যের সমাধানার্থে প্রত্যেক বিচারাদি উক্তির শেষভাগে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।......”

মহামোহরূপ মনের ভ্রান্তিকে দূর করে বিবেকের জয়-জয়কার ও জ্ঞানের বিকাশই ‘বোধেন্দুবিকাস’ রূপক নাটকের মূল বিষয়বস্তু। এ আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা প্রমাণ করতে গিয়ে গুপ্ত কবি বিবেক, মতি (অর্থাৎ বুদ্ধি), ক্ষমা, শ্রদ্ধা, মৈত্রী, শান্তি, বিষ্ণুভক্তি, মহামোহ, দম্ভ, অহঙ্কার, মিথ্যা দৃষ্টি (নাস্তিকতাবুদ্ধি), হিংসা, ক্রোধ, বিভ্রমাবতী, চার্বাক, বৌদ্ধ-ভিক্ষুক, ক্ষপণক, কাপালিনী, বেদান্ত দর্শন, বৈরাগ্য প্রভৃতি অসংখ্য রূপক প্রতীকের নিয়েছেন আশ্রয়। ষষ্ঠ অঙ্কে দেখা যায় ‘প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের উৎপত্তি’। মহারাজ বিবেক কাম-ক্রোধাদি মহামোহরূপ বিপক্ষকে বিনাশ করে জয়ী হয়েছেন নৈতিক সংগ্রামে। মনে জেগেছে তাঁর বৈরাগ্য। মহারাজ এবার ডেকে পাঠিয়েছেন শ্রীমতী উপনিষদ্দেবীকে। গ্রন্থ সমাপ্তের পূর্বে দেখা যায় বিষ্ণুভক্তি-দেবী প্রশ্ন করছেন :

“হে পুরুষ! তুমি কিরূপ কৃতকার্য হইয়াছ আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, অতএব আমার প্রশ্নের উত্তর করিয়া সন্তুষ্ট কর।

প্রশ্ন। কোন্ ধর্ম্ম অনুসারে, লহ উপদেশ।
কিবা জাতি কিবা ধর্ম্ম, কহ সবিশেষ॥

আত্মা। উত্তর।
আপন স্বরূপ আমি, আপন স্বরূপ।
জাতি, ধর্ম্ম, কিছু নাই, নিজবোধ-রূপ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
কি তোমার নাম, কহ, কি তোমার নাম।
কোথায় বিশ্রাম কর, কোন দেশে ধাম॥

আত্মা। উত্তর।

স্বভাবে বিশ্রাম করি, দেহগেহে ধাম।
আত্মার আত্মীয় আমি, আত্মারাম নাম॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কার ভাবে ভাব ল'য়ে ভাব প্রতিক্ষণ।
কার্ সঙ্গে কোন্ রঙ্গে করিছ ভ্রমণ॥

আত্মা। উত্তর।

স্ব-ভাবে ভাবিয়া ভাব, ভাব রাখি দূরে।
সন্তোষের সহ ফিরি, সদানন্দ-পুরে॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কেমনে স্বভাবে তুমি, রেখেছ স্ব-ভাব।
কি ভাবে, স্বভাবে রাখ, স্বভাবের ভাব॥

আত্মা। উত্তর।

স্বভাবেই ভাবে হয়, ভাবের সঞ্চার।
স্বভাব, স্বভাবে রাখি, অভাব কি তার॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কার ভাবে ভাবি বল, কার ভাবে ভাবী।
গত হ'ল, কত ভাব তার ভাবে ভাবী॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কত গত, কত ভাবি, কত আর ভাবি।
যার ভাবে ভাবি ভাব, তার ভাবে ভাবী॥

আত্মা। উত্তর।

ভাবিতে ভাবিতে ভাবে, ভাবের উদয়।
কিসে ভাব আবির্ভাব, কিসে হয় লয়॥

* * *

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

প্রলয় সমুদ্র এক, সদা শোভা পায়।
তুমি আমি, আমি তুমি, জলবিম্ব তায়॥

আত্মা। উত্তর।

আমি তুমি, তুমি আমি, এই যদি হবে।
তুমি আমি, তিনি উনি, ভেদ কেন তবে॥

আত্মা। উত্তর।

এক আত্মা ভিন্ন ঘট, ভেদ মাত্র কায়।
রবি-ছবি, জলে জ্ব'লে যথা শোভা পায়॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কিরূপে সমান হবে তোমায় আমায়।
প্রভেদ, অভেদ করা, সহজে কি যায়॥

আত্মা। উত্তর।

এখনি দর্পণ আনি, আঁখি অগ্রে ধর।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, দুঃখ দূর কর॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

সকলেই করে কেন, জীব আর শিব।
কারে তুমি জীব বল, কারে বল শিব॥

আত্মা। উত্তর।

কারে বলি শিব আমি, কারে বলি জীব।
এই আমি জীব হই, এই আমি শিব॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন!

আমি জীব, আমি শিব, এই যদি হবে।
জীবে শিবে প্রভেদ, হয়েছে কেন তবে॥

আত্মা। উত্তর।

পাশযুক্ত যখন, তখন জীব জীব।
পাশমুক্ত হ'লে পর, জীব হয় শিব॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কারে কহে পাশ-মুক্ত কারে কহে পাশ।
বল বল, এই পাশ, কিসে হয় নাশ॥

আত্মা। উত্তর।

বন্ধের কারণ মায়া, তারে বলি পাশ।
জ্ঞানি করে, জ্ঞান অস্ত্রে, মায়াপাশ নাশ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

'ঘুচিল অজ্ঞান-ধন্ধ, সদানন্দ স্মরি।
বল বল, তবে কারে প্রণিপাত করি॥'

আত্মা তার উত্তর দিচ্ছেন ঃ

'নমো নমঃ পরমাত্মা, চিদানন্দ-ধাম।
আমার আমার আমি, প্রণাম প্রণাম॥'

"নাটক হিসেবে 'বোধেন্দু-বিকাস' একেবারে ব্যর্থ রচনা বলে" মন্তব্য করেছেন ডাঃ সুকুমার সেন (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড)। আধুনিক নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য তাই মেনে নিতে হয়। কিন্তু 'বোধেন্দু-বিকাসে'র বৈশিষ্ট্য তার নাটকীয় গুণাবলীতেই কেবল নয়, তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ছন্দ-বৈচিত্র্যময় অপূর্ব কাব্য-সম্পদের। এখানে তার কিছুটা নমুনা উৎকলন করলাম ঃ

'আমোদিনী চ্ছন্দ'—চ্ছুতমার্গী কোন তীর্থবাসি সর্ব সাধারণের প্রতি ঃ

'আমায় ছুঁসনে, কেউ ছুঁসনে, কেউ ছুঁসনে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্॥

* * *

যত সব দুরাচার, করিতেছে অনাচার,
অতিশয় কদাচার, কেহ নহে নর।
ভূত, প্রেত, সমুদয়, মানুষ কাহারে কয়,
কাজেতে মানুষ নয় মিছে কলেবর॥
কারে করি সম্বোধন, অপবিত্র সর্ব্বজন,
ঘোর পাপি, অভাজন, নরকের চর।...'

বিষাদিনী ছন্দ ঃ

প্রাণে আর্ সয়না। প্রাণে আর্ সয়না।
সয়না-রে, প্রাণে আর, সয়না, সয়না।

* * *

খোঁপা বেঁধে, পেটে পেড়ে,
ছোপা করে, নৎ নেড়ে,
ঠেকারে বাঁচেনা আর, গায়ে দিয়ে গয়না।
গায়ে দিয়ে গয়না॥......

'হিল্লোলচ্ছন্দ'। চার্বাকের (নাস্তিকবিশেষ) রঙ্গভূমিতে এসে বক্তৃতাচ্ছলে ঃ

ধর্ম্মপথে হোয়ে চোর, কেন পাও দুঃখ ঘোর,
নয়নের অগোচর, নাই কিছু, নাই কিছু।
স্বেচ্ছাচার স্বর্গভোগ, সেই যোগে দেহে যোগ,
পরকালে ভোগাভোগ, নাই কিছু, নাই কিছু॥
শরীরের মাঝে শূণ্য, ইথে কেন হও ক্ষুণ্ণ,
কোথা পাপ কোথা পুণ্য, নাই কিছু, নাই কিছু।
ভ্রমে কর কার সেবা, তোমার উপাস্য কেবা,
শাস্ত্রমতে দেবী-দেবা, নাই কিছু, নাই কিছু॥......

'বীর বিলাসিনী' ছন্দ ঃ

সমুদয় এই বিশ্ব, স্থূলরূপে হয় দৃশ্য,
অপরূপ কতরূপ, বস্তু সমুদয় হে,
বস্তু সমুদয়।
এই ভব ভোগ্য তব, ভোগে কেন পরাভব,
স্বভাবে শোভিত সব, স্বভাবেই হয় হে,
স্বভাবেই হয় ॥
সকলি স্বভাব-অংশ স্বভাবে সকলি ধ্বংস,
সমুদ্রের বিম্ব যথা, সমুদ্রেই লয় হে,
সমুদ্রেই লয়।
ঋতু, মাস, তিথি, বার, আসে যায় বারবার,
স্বভাবের পরিবার, স্বভাবে উদয় হে,
স্বভাবে উদয় ॥...

বীর বিলাসিনী ছন্দ। 'কামদেবে'র উক্তি ঃ

কোথা গেল দুরাচার, দেখিতে না পাই আর,
প্রতীকার করি তার, উচিত যা হয় রে।
উচিত যা হয় ॥
মহামোহ-নাম যথা, ত্রিভুবন কাঁপে তথা,
ছোট-মুখে বড়-কথা, প্রাণে নাহি সয়রে।
প্রাণে নাহি সয় ॥...

রণরঙ্গিণী ছন্দ। 'কামদেবে'র বক্তৃতা ঃ

কেন কর ভয়, প্রিয়ে, কেন কর ভয় ?।
ত্রিলোক বিজয়, আমি, ত্রিলোক বিজয় ॥
ফুলময় ধনু, শর, মূর্ত্তিমান পঞ্চশর (১)।
সুর, নর, থরথর, কম্পিত হৃদয় ॥

ভয়ে কম্পিত-হৃদয়।

কেন কর ভয়, প্রিয়ে, কেন কর ভয় ? ॥

[(১) পঞ্চশর—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, ক্ষোভণ, স্তম্ভন।]

শাসক ছন্দ। ক্রোধ অথচ উপহাসপূর্বক 'অহঙ্কার'-এর উক্তি ঃ

কোথাকার, কেটা—তুই, কেটা—তুই, কেটা ?
কি তোর, বাপের নাম, তুই কার, বেটা ? ॥
বল্ বল্ বল্ ছোঁড়া, কেটা তুই কেটা ?।

* * *

কটু কথা, যত থাকে, বোলে সাধ্ মেটা।
ঘেঁটিবনা, পারিস্, ঘেঁটিতে, যত ঘেঁটা ॥
অভিমানে ফেটে-মরে, বেঁধে এক ফেটা।
লক্ষ টাকা স্বপ্নে দেখে, পেতে ছেঁড়া চেটা ॥
মরি কি মুখের্ ছাঁদ, দেহখানি গেঁটা।
ব্যাভারে গাধার মত, হাঁদা নাদাপেটা ॥
কেটা ব্রহ্মা, কেটা বিষ্ণু, মহেশ্বর কেটা ?।
আমার সৃজিত সব, জানেনাকো সেটা ? ॥···

চপলাগতি ছন্দ ঃ

কাঁহা শম, কাঁহা দম,
পাখ্ড়া, পাখ্ড়া, পাখ্ড়া।
ওন্কো, পাখ্ড়া, পাখ্ড়া, পাখ্ড়া ॥
নৈ ছোড়েগা, হাড় তোড়েগা
হাম্ বড়া হ্যায় বাঁকৃড়া ॥
আবি যাকে, মারো তাকে,
ঢোঁড়্ ঢোঁড়্ কে, আখ্ড়া।
বাবা, ঢোঁড়্ ঢোঁড়্কে আখ্ড়া ॥···

মোহিনী ছন্দের একটি নমুনা ঃ

অকাট্য আমার কথা, কার্ সাধ্য কাটে রে ?
আমার নিকট কার, জারিজুরি খাটে রে ? ॥
সমুখ-বিচার যুদ্ধে, কে আমারে আঁটেরে ? ।
প্রমাণের বাণ দেখে, সকলেই ঘাঁটে রে ॥···

কাশীচ্ছন্দ ঃ

বড় দেখি, কথাগুলো, কড়া কড়া মুখে ।
সভা মাজে, দাঁড়াইলি, চাড়া দিয়ে বুকে ॥
রুকে রুকে, ঝুঁকে ঝুঁকে, করিতেছ জারি ।
বাচালতা ভাল বটে, চতুরালি ভারি ॥
সেকেলে পুরোণো পাপি, সবে তোরে জানে ।
একালেতে, জ্ঞানি যত, কেহ নাকি মানে ॥
কতকেলে, পচা পচা, রচা কথা নিয়ে ।
ভুলাতেছ, সকলেরে, চোখে ধূলা দিয়ে ॥
ব'লে গেলি, যত কথা, তাহে নাহি যুক্তি ।
সবিশেষে, বল দেখি, কা'রে বলে মুক্তি ?
মোরে গেলে, ফুরাইল, একেবারে শূন্য ।
ভূতে ভূত, মিশি গেলে, কে ভুগিবে পুণ্য ॥
ধন লোভে, মাতিয়াছে, নাহি জানে ধর্ম্ম ।
মিছি মিছি, করিতেছে, সুখ-নাশা-কর্ম্ম ॥
স্বভাবে হ'তেছে সব, না জানিয়া মর্ম্ম ।
স্বকীয় স্বভাব দোষে, হারাইব শর্ম্ম ॥
জগতেরে, ছলিতেছ, হ্যাদেরে দুরাত্মা ।
দেহ কেটে, দেখা দেখি, কোথা আছে আত্মা ॥···

হিংসার উক্তি (গৌরবিণী চ্ছন্দ)

হ্যাদে দেখি ঘরে ঘরে, সকলেই খায় পরে,
সুখে আছে পরস্পরে—আজো এরা মরেনি ?
কত সাজে সাজ করে, গরবেতে ফেটে মরে,
এখনো এদের ঘরে—যম এসে ধরেনি ?
এই সব্ জামা জোড়া, এই সব গাড়ী ঘোড়া,
এ সব্ টাকার তোড়া—চোরে কেন হরেনি ?
আরে, ওরা ভাগ্যবান্, বাড়িয়াছে বড় মান,
গোলাভরা আছে ধান—লক্ষ্মী আজো সরেনি ?
মর এটা যেন হাতী, দশ-হাত বুকে ছাতি,
করিতেছে মাতামাতি—জ্বরে কেন জরেনি ?
হ্যাদে মাগী কালামুখী, ঠিক যেন কচি খুকী,
পতিসুখে বড় সুখী, ঠিঁটী কেন পরেনি ?
মর্মর্ ওই ছুঁড়ী, পরেছে সোণার চুড়ী,
বেঁকে চলে মেরে তুড়ি, ফুল তবু ঝরেনি !
দেখ্ দেখ্ নিয়ে মিঠে, খেতেছে কি পুলিপিটে,
এখনো এদের ভিটে, ঘুঘু কেন চরেনি !

পরিশেষে বোধেন্দু বিকাস নাটকের একটি গান ঃ

আর কবে ভাই মানুষ হ'বে ?
মানুষ হ'বে, মানুষ হ'বে,
আর কবে ভাই মানুষ হবে।
দেখে তোর্ আকার্ প্রকার্, আচার বিচার,
মানুষ ক'বে, মানুষ ক'বে ॥

হ'তে চাও মানুষ যদি, ভ্রান্তি-নদী,
এই বেলা পার হও রে তবে।
মনেরে ব'লে ক'য়ে, শুদ্ধ হয়ে,
ডুব দিয়ে আয় শান্তি শবে ॥*
অমৃত খেয়ে সুখে, নীরব মুখে,
মৃত হ'য়ে যেন রবে।
লোকেতে বলুক্ মন্দ, সদানন্দ,
শবেতে সব্ সবেই সবে ॥
নয়নে ছোট-বড়, দেখবে যা'রে,
তুষবে তা'রে প্রিয় রবে।
জগতের হাড়ী মুচী, সবাই শুচি,
সমভাবে ভাব্যে সবে ॥···

[ক্ষমার সংগীত : ৪র্থ অংক।]

নাটকের গদ্যাংশের বাস্তবধর্মী সংলাপগুলোও লক্ষ্য করবার। গদ্যের নমুনা :

দম্ভ।

স্থিররূপে অনেকক্ষণ দৃষ্টি করিয়া।

ওরে—কি ভাগ্য, কি ভাগ্য! সুপ্রভাত, সুপ্রভাত। ওরে—ইনি আমার পরমপূজ্য মাথার মণি। বাবার বাবা—পিতামহ স্বয়ং কুলদেব অহঙ্কার ঠাকুর। ওরে—আসন্ দে, আসন্ দে, অর্ঘ্য দে, অর্ঘ্য দে। ফুল আন্, ফুল আন্,। জল আন্ জল আন্। আমি চরণ-যুগল পূজা করি, পূজা করি।

[* শব—মৃতদেহ। শব—জল।]

গলায় বস্ত্র দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম।

হে পিতামহ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুণ। আমি বালক, অজ্ঞান, দুর্ভাগ্য-বশতঃ এতক্ষণ আপনাকে চিনিতে পারি নাই, প্রণাম করি, প্রসন্ন হইয়া সদয়চিত্তে আমাকে মস্তকে চরণাঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করুণ। আমি লোভের পুত্র দম্ভ, আপনার দাসানুদাস।

অহঙ্কার।

[আহ্লাদে গদগদ হইয়া।]

ওরে তুই দম্ভ? আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবি হ, চিরজীবি হ। দ্বাপরযুগের শেষভাগে তোকে এতটুকু ছেলেমানুষ দেখেছিলাম্, এখন্ তোর বয়স হয়েছে, গোঁপ উঠেছে। যুবা হয়েছিস্। আমি বুড়ো হয়েছি, চোখে আর তেমন্ তেজ নাই, সর্ব্বদাই ঝাপসা ঝাপসা দেখে থাকি, বয়সের ধর্ম্মে জ্ঞানেরো কিছু বৈলক্ষণ্য হয়েছে; হাঁরে ভাই! "অসত্য" নামে তোর, যে, একটি দুধের্ ছেলে, সেটি তো ভাল আছে?

দম্ভ।

হাঁ ঠাকুরদাদা! সে আমার এই বুকের উপরেই রয়েছে, আমি-তাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্তকালো প্রাণ ধারণ করিতে পারিনে, এই ছেলেটি আমার বড় "নেয়োট্" কোনোমতেই কোল্ ছাড়া হয়না, আপনার পদার্পণে অদ্য সে বড় সন্তুষ্ট হয়েছে।

অহঙ্কার।

ও নাতি, ও ভাই। হাঁরে তোর পিতা "লোভ" ও মাতা "তৃষ্ণা" তাহারাও কি এখানে আছে?

দম্ভ।

হাঁ—ঠাকুরদাদা! মহারাজ মহামোহের আজ্ঞাক্রমে তাঁহারা সকলেই এখানে অবস্থান করিতেছেন।......"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সম্পাদিত ঈশ্বর গুপ্তের 'কবিতা সংগ্রহের' (১২৯২ সালে প্রকাশিত) ভূমিকায় গুপ্ত কবির জীবনী ও কবিত্ব সম্পর্কে আলোচনার এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

"প্রবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইয়া, মোচার ঘণ্টে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। সামগ্রীটা কি এ? বহু কষ্টে পিসীমা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে এ 'কেলা কা ফুল।' রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায় যে, এখন আমরা সকলেই মোচা ভুলিয়া কেলা কা ফুল বলিতে শিখিয়াছি। তাই আজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিতে বসিয়াছি। আর যেই কেলা কা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন।..."

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণ করে বলতে হয়, হঠাৎ সাহেব-বনে-ওঠা গরিব বাঙ্গালী ছেলেটার মত ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাকে আমরা আজ ভুলতে বসেছি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই হলেন 'এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্য দেশের কবি।' বোধেন্দু বিকাস এ গুপ্ত কবির সৃষ্টি-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নমুনা।*

---

*BODHAINDU VICASA. By The Late | Baboo Issur Chunder Goopto. | Published | by Ramchunder Goopto | Editor of the Probhakur.

বোধেন্দু-বিকাস [১ম খণ্ড—অসম্পূর্ণ] প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ। অর্থাৎ স্বভাবানুযায়ি বর্ণন মহাকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুত রামচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। সিমুলিয়া নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট নং ৫৪, ১২৭০ সাল। পৃঃ—১৪০।

কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত

হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রাম। দেবানন্দপুর গ্রাম আজ ধন্য হ'য়ে গেছে বাংলার দরদী ও মরমী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের শৈশব স্মৃতি ধারণ করে। ধন্য হয়ে গেছে আজ থেকে প্রায় আড়াই শ' বছর আগে বঙ্গ-ভারতীর আর একটি বরপুত্রের কবি-জীবনের প্রথম উন্মেষ তার কোলে ঘটেছিল বলে।

বঙ্গ-ভারতীর এই বরপুত্রটি হ'লেন কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। ভারতচন্দ্রের তখন বড় দুর্দিন। 'রাজা'র ঘরে জন্মগ্রহণ করেও তিনি পরান্নভুক—পরাশ্রয়ী। দেবানন্দপুর গ্রামেরই এক রামচন্দ্র মুন্সীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন আর ফারসী ভাষা শিখছেন। দিনে একবার রাঁধেন, আর তাই খান রাত্রে। তরকারী রান্না প্রায় হ'য়ে ওঠে না। এক-আধটা বেগুণ পোড়ার কিছুটা এ-বেলা, কিছুটা ও-বেলা খেয়ে দিন যাপন করতে হয়।

এমনি অভাব-অনটন কৃচ্ছ্রসাধনে চলছে দিন। মুন্সীদের বাড়িতে সেদিন সত্যনারায়ণের পূজো, সির্ণি ও কথা। উদ্যোগ-আয়োজন সব ঠিক-ঠাক। কিন্তু পুঁথি পড়বার লোক কই? কর্তাবাবু ভারতচন্দ্রকে ডেকে বললেন:

'ভারত, তোমার সংস্কৃত বোধ আছে, বাকপটুতা উত্তম। তোমাকে সত্যনারায়ণের পুঁথি পাঠ করতে হবে।'

ভারতচন্দ্র সায় দিলেন। জানালেন, তাই হবে। কিন্তু পুঁথি কই? তখন লোক ছুটল পুঁথির খোঁজে। ভারতচন্দ্র বারণ করলেন।

OONGODAH MONGUL,

EXHIBITING

THE

TALES

OF

BIDDAH AND SOONDER.

TO WHICH IS ADDED,

THE

MEMOIRS

OF

Rajah Prutapadityu,

EMBELLISHED

WITH SIX CUTS.

CALCUTTA:

FROM THE PRESS OF FERRIS AND CO.

1816.

'সচিত্র অন্নদামঙ্গল' বইয়ের আখ্যাপত্র

বললেন ঃ পুঁথি আর আনতে হবে না। তিনি তাঁর ব্যবস্থা করছেন। এই বলে বাসায় গিয়ে তিনি তক্ষুণি বসে গেলেন পুঁথি রচনা করতে। আর যথাসময়ে তাই শুনে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল শ্রোতাদের মধ্যে। মুক্তকণ্ঠে সবাই প্রশংসা করলেন পাঁচালীকারের। সত্যপীরের ব্রতকথার শেষে চৌপদীতে কবির নামের 'ভণিতা' শুনে সবাই তো আরো অবাক। ভণিতাটি হোল ঃ

ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ,
সদা ভাবে হত কংস, ভুরস্থটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতী যুত,
ফুলের মুকুটি খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি॥
দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর নাম,
তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়,
হোয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী।
সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পুঁতি,
তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।

সত্যনারায়ণের এ ব্রতকথা ভারতচন্দ্র যখন রচনা করেন, তখন তাঁর বয়স ১৫ বৎসরের অধিক হয়নি বলে কবিবর ভারতচন্দ্রের জীবনীকার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১২১৮—১২৬৫ সন) উল্লেখ করেছেন 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত'* (ইং ১৮৫৫। পৃঃ ৮+৬১) গ্রন্থে।

---

* কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত—সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও বিরচিত হইয়া—কলিকাতা প্রভাকর যন্ত্রে মূদ্রিত হইল। ১ আষাঢ় ১২৬২ সাল॥—এই গ্রন্থের মূল্য ১ এক তঙ্কা মাত্র।

অবশ্য এ পাঁচালীর রচনাকাল নিয়ে নানা পণ্ডিত নানা মত পোষণ করে আসছেন। অনেকের মতে ভারতচন্দ্রের বয়স তখন প্রায় ২৫ বৎসর হবে। এবং তিনি দেবানন্দপুরে ফারসী ভাষা শিখতে আসার পূর্বে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় বেশ পাকা-পোক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। কিছু কিছু কবিতাও তখন গোপনে রচনা করতেন। ভারতচন্দ্রের জন্মাব্দ বা রচনাকাল নিয়ে যত মতভেদই থাক, এটা ঠিক, কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের সঠিক পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত এখনো লিখিত হয়নি। প্রায় এক শ' বছর আগে 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই দীর্ঘ ১০ বছর কাল অক্লান্ত পরিশ্রম করে কবি গুণাকরের এ জীবন-বৃত্তান্ত প্রথম লোক-চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করেন। ১২৬২ সনের (১৮৫৫ সাল) পয়লা জ্যৈষ্ঠ থেকে তা 'সংবাদ প্রভাকরের' পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশিত হ'তে থাকে। পরের মাসে তা বই আকারে আত্ম-প্রকাশ করে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে জীবন-চরিত নিয়ে বাঙালীর লেখা বাঙলা গদ্য-সাহিত্যের হাতেখড়ি হ'লেও 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' কি, 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'-কে পুরোপুরি জীবন-কথা বলা যায় না কিছুতেই। এদিক থেকে দেখতে গেলে, 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত' বাঙালী কবি সম্পর্কে কেবল সর্বপ্রথম জীবনী নয়, বাংলায় প্রামাণিক জীবনী-সাহিত্যের পথ-প্রদর্শকও বলা যেতে পারে।

কাজটা যে নেহাৎ সহজ নয় তা গুপ্ত-কবিও বুঝতে পেরেছিলেন। 'ভূমিকায়' তাই তিনি লিখে গেছেন ঃ

"এতদ্দেশীয় পূর্ব্বতন কবিদিগের জীবন-বৃত্তান্ত পূর্ব্বে কেহ লিখিয়া রাখেন নাই এবং সেই সেই কবি মহাশয়েরাও আপনাপন বিরচিত প্রবন্ধ প্রকরণ-প্রকটন পুরঃসর তন্মধ্যে স্ব স্ব পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন নাই। সুতরাং এইক্ষণে তৎসমুদয় প্রাপ্ত

হইয়া সর্ব্বলোকের সুগোচর করা যদ্রুপ কঠিন ব্যাপার হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞজনেরাই বিবেচনা করুন। আমি একপ্রকার সর্ব্বত্যাগী হইয়া শুধু এই বিষয়েই প্রবৃত্ত হইয়াছি।......"

গুপ্ত-কবির সংগৃহীত জীবন-বৃত্তান্ত থেকে কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের পূর্ব-পরিচয় যতটুকু জানা যায় তাতে প্রকাশ : ভারতচন্দ্রের পিতা 'নরেন্দ্রনারায়ণ' রায় মশাই বর্ধমান জেলার 'ভুরস্থট' পরগণার 'পেড়ো' নামক স্থানে পূর্বে বাস করতেন। তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী। তাঁর খেতাব ছিল 'রাজা'। নরেন্দ্রনারায়ণের চার ছেলে। ভারতচন্দ্র হ'লেন সকলের ছোট। ১৬৩৪ (১৭১২ খৃষ্টাব্দে) শতকে কবি গুণাকরের জন্ম হয়।

ঘটনাচক্রে এ সময় কবিবরের পিতা বর্ধমান অধিপতি রাজ-মাতার কোপানলে পতিত হন এবং নিজের সর্বস্ব খোয়ান। কবি পালিয়ে গাজীপুরে আপনার মামার বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নিলেন আর তাজপুর গ্রামে থেকে ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করতে লাগলেন। ১৪ বছর বয়সে কবিবর আপনার গৃহে ফিরে আসেন। আর তাজপুরের পার্শ্ববর্তী সারদা গ্রামের আচার্যদের এক মেয়েকে গোপনে বিয়ে করে বসেন। দাদাদের কাছে এ বিয়ের জন্য বকুনি খেয়ে তিনি রাগ করে দেবানন্দপুর গাঁয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন মুন্সীদের বাড়িতে। আর ফারসী ভাষা পড়তে থাকেন। এভাবে ফারসী ভাষায় কৃতবিদ্য হয়ে কবিবর আবার গৃহে ফিরে আসেন। তাঁর বয়স তখন ২০ বছর। ঘরের স্নেহক্রোড় বেশীদিন আর সইল না কবির বরাতে। বাপ-মা ভাইদের জন্য বর্ধমান রাজদরবারে 'মোক্তারি' করতে গিয়ে তিনি অবশেষে কারারুদ্ধ হন। তারপর কোনরকমে কারাধ্যক্ষকে তুষ্ট করে জেল থেকে পালিয়ে কটকে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন মারাঠাদের অধিকারে। শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে তিনি এর পর সন্ন্যাসধর্ম

গ্রহণ করেন বৈষ্ণবশাস্ত্র অনুশীলন করে। প্রভু ভারতচন্দ্র হলেন তখন 'মুনি গোঁসাই' আর তাঁর নাপিত ভৃত্যটি হোল 'বাসুদেব'। গোঁসাই বাবাজী নানান তীর্থ দর্শন করতে করতে অবশেষে খানাকুল গ্রামে আপন ভায়রা-ভাইয়ের বাড়িতে এসে উপস্থিত। 'গোঁসাই' বাবাজির কিন্তু বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্রসাধন বেশীদিন আর ভাল লাগল না।

গার্হস্থ্যাশ্রমে তিনি আবার ফিরে এলেন। কিন্তু শুধু ফিরে এলে তো চলবে না। গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাও তো একটা করতে হবে? বিবাহিত লোক। অগত্যা করেন কি? ফরাসডাঙ্গার ফরাসী সরকারের বিখ্যাত দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট গিয়ে তিনি আশ্রয় নিলেন এবং তাঁর সুপারিশে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দরবারে মাসিক ৪০৲ বেতনে কবিতা রচনা করার এক চাকুরী লাভ করেন। রাজা তাঁকে 'গুণাকর' উপাধি দ্বারাও ভূষিত করেন।

কাব্যকর্তা কবিকেশরী ভারতচন্দ্র কিছু কাল হাস্য-কৌতুকে দিন যাপন করে ১৬৮২ শকে (১১৬৭ বাংলা সনে) মাত্র ৪৮ বছর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। অনেকে বলেন তাঁর প্রথম বহুমূত্র রোগ হয়, পরে তা ভস্মক রোগে দাঁড়ায়। এ-হোল কবি ভারতচন্দ্রের বৈচিত্র্যময় জীবনের সংক্ষিপ্ততম পরিচয়। জীবনের অধিকাংশ কালই তাঁকে নানান বিপর্যয়ের মধ্যে কাটাতে হয়। এমন কি, শেষ জীবনে মূলাজোড়ে অবস্থানকালেও রাজ-কর্মচারীদের হাতে তাঁকে অশেষ নিগ্রহ ভোগ করতে হয়। (পত্তনিদার রামদেব নাগের দৌরাত্ম্যের বিবরণ কবিবর তাঁর সংস্কৃত 'নাগাষ্টক' কবিতায় লিপিবদ্ধ করেও গেছেন।)

কাজে কাজে দেখা যায়, কবিবর ভারতচন্দ্রের আগাগোড়া জীবনটাই একটা 'ট্র্যাজেডি'। পারিবারিক জীবনের নানা দুঃখ কষ্টে তাঁর মনের আলো গিয়েছিল নিবে। মন গিয়েছিল বিষাক্ত হয়ে, রসনা হয়ে

ওঠে কণ্টকিত। "বীরবলের" কথায় 'ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস আদি রস নয়, হাস্যরস।……এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্র-দৃষ্টি। আমাদের দেব-দেবীর পুরাণ-কল্পিত চরিত্র, অর্থাৎ স্বর্গের রূপকথা নিয়ে ভারতচন্দ্র পরিহাস করেছেন।'

[নানা চর্চ্চা : পৃঃ ১৬৭]

ভারতচন্দ্র ছিলেন সে যুগের জনপ্রিয় লোক-কবি। ছন্দ-চাতুর্যে ও যমক অনুপ্রাসে সমুজ্জ্বল তাঁর কাব্য-সুধা জনসাধারণ কতখানি আগ্রহের সঙ্গে কিনত আর পড়ত তা ১২৬৪ সালে ছাপা তাঁর গ্রন্থের সংকরণ থেকে জানা যায়। লক্ষ্মীবিলাস প্রেসে ছাপা 'বিদ্যাসুন্দরের' (পৃঃ ৬৯) দাম ছিল মাত্র ৬ পয়সা ; এংলো-ইণ্ডিয়ান প্রেসের 'অন্নদামঙ্গল' (পৃঃ ৪৩২) দাম মাত্র আট আনা ; পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে ছাপা 'অন্নদামঙ্গল' (১০ খানা ছবি সমেত ৪৫০ পৃষ্ঠা)—মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। বাংলা দেশে বাঙ্গালীর 'বইয়ের বিজনেস' প্রথম সুরু বলা চলে ['সংবাদপত্রে সেকালের কথা' : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়] ভারতচন্দ্রের কাব্য দিয়েই। শুধু বইয়ের বিজনেস নয়, তার আগে হেরাসিম লেবেডেফের বাংলা নাট্যশালার প্রথম রজনীর অভিনয়ও নাকি সুরু হয়েছিল ভারতচন্দ্রের গান-সহযোগে ১৭৯৫ সালে। আর বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ যা হালহেদ সাহেব লেখেন তাতেও আছে ভারতচন্দ্রের রচনার উদ্ধৃতি।

'সংবাদ-প্রভাকর' সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী। বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রতি—বিশেষ করে বাঙ্গলার লুপ্ত-প্রায় লোক-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রাণের টান ছিল গভীর। দশ বৎসর ধরে একটানা পরিশ্রম করে তিনি কেবল 'কবিবর' ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত' সংগৃহীত করে ক্ষান্ত হননি, লুপ্তপ্রায় প্রাচীন

কবি ও কবিয়ালদের কবিতা, গান ও জীবন-বৃত্তান্ত উদ্ধার করে দিনের পর দিন তা 'সংবাদ-প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় পত্রস্থ করে গেছেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় 'রামপ্রসাদ সেন', 'নিধুবাবু,' 'হারু ঠাকুর,' 'রাম বসু,' 'নিতাই বৈরাগী' 'লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস,' 'রাসু ও নৃসিংহ' প্রভৃতি বহু মৃত কবির জীবনচরিত ও কবিতাবলী রক্ষা পায়। নইলে এসব প্রাচীন কবি ও কবিয়ালদের অধিকাংশ কীর্তি-কলাপ হয়ত লুপ্ত হত স্মৃতির অতল গর্ভে। বাংলা সাহিত্যে গুপ্ত কবির শ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর সরস কবিতাবলী যতখানি, তারও বেশী হোল বাংলার প্রাচীন কবি ও কবিয়ালদের লুপ্তপ্রায় গান ও কবিতার আর জীবন বৃত্তান্তের পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবন সাধনায়। গুণীর কদর গুণীই বোঝে। গুপ্তকবি ছিলেন গুণী লোক। তাই বুঝি পুরনো দলের শেষ কবি হয়ে ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার প্রাচীন কবিদের রচনা ও জীবন-চরিত আলোচনায় ব্রতী হয়েছিলেন বাঙ্গালী সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার কার্যে।

গুপ্তকবি তাঁর সংগৃহীত এ জীবন-বৃত্তান্তে ভারতচন্দ্রের চমৎকার অনেকগুলি অপ্রকাশিত কবিতার পুনরুদ্ধার করেন। ভারতচন্দ্রের একটি সংস্কৃত, বাংলা, ফারসী ও হিন্দি ভাষায় মিশ্রিত কবিতার নমুনা—চৌপদী ছন্দ ঃ

শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর
বায়দ্‌কে গোয়দ্‌ রুবর
কাতর দেখে আদর কর
কাহে মর রো রোয়্‌কে।
বক্ত্রং বেদং চন্দ্রমা
ছুঁ, লালা চে রেমা
ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা
মেটিমে কাহে শোয়্‌কে ॥

যদি কিঞ্চিৎ ত্বং বদসি
দর্ জানে মন্ আয়ৎ খোসি
আমার হৃদয়ে বসি
প্রেম্ কর খোস্ হোয়্কে ॥
ভূয়ো-ভূয়ো রোরুদসি
ইয়াদৎ নমুদা যাঁ কোসি
আজ্ঞা কর মিলে বসি,
ভারত ফকিরি খোয়কে ॥ [পৃষ্ঠা—৩২]

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতি অনুসারে মহিষাসুর যুদ্ধের বর্ণনাচ্ছলে "চণ্ডী নাটক" নামে সংস্কৃত ও হিন্দি মিশ্রিত এক নাটক লিখতেও সুরু করেছিলেন ভারতচন্দ্র। নাটকখানির সূত্রধারের উক্তি, চণ্ডী এবং মহিষাসুরের আগমন, ভগবতীর ক্রোধ পর্যন্ত লেখার পর রায় গুণাকর অসুস্থ হয়ে পড়েন। নাটকখানি আর সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি। গুপ্ত কবি সেটা আলোচ্য জীবন বৃত্তান্তে উদ্ধার করেছেন এবং লিখেছেন ঃ

"কমঠ করটট, ফণি ফণা ফলটট, দিগ্গজ উলটট ;
ঝপ্টট ভ্যায়্ রে।
বসুমতী কম্পত, গিরিগণ নম্রত, জলনিধি ঝম্পত,
বাড়বময় রে ॥
ত্রিভুবন ঘুঁটত, রবি রথ টুটত, ঘন ঘন ছুটত,
যেঁও পরলয় রে।
বিজলী চটচট, ঘর ঘর ঘটঘট, অট্ট অট অট অট্,
আ, ক্যায়া হ্যায় রে ॥

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই প্রচুর পীড়ায় আশক্ত হইলেন, অচিরাৎ লিখিয়া শেষ করিবেন মানস করিয়াছিলেন, তাহা না করিয়া

জীবনযাত্রাই শেষ করিয়া বসিলেন, এই নাটকখানি সংপূর্ণ হইলে কি এক অদ্বিতীয় কীর্ত্তি হইত তাহা অনির্ব্বচনীয়। ইহা সম্পন্ন করণে অসমর্থ হওয়াতে তিনি যদ্রূপ দুঃখ পাইয়াছিলেন, অধুনা আমরা তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণ দুঃখ ভোগ করিতেছি।"

[পৃষ্ঠা—৪৪]

গুপ্ত মশাইয়ের রচিত 'জীবন বৃত্তান্তের' শেষের দিকের খানিকটা অংশ তুলে দিচ্ছি ঃ "আমরা এইস্থলে ভারতচন্দ্রের গুণ বর্ণনা আব কত করিব? কোনমতেই লিখিয়া শেষ কবিতে পারি না, যত লিখি ততই লেখনী নৃত্য করিতে থাকে, অদ্য যাহা প্রকাশ করিলাম, ইহা কেবল আদর্শ মাত্র। উক্ত গুণাকরের প্রণীত সমুদয় কবিতার টীকা করিয়া একত্রে এক পুস্তকে প্রকাশ করণের মানস করিয়াছি, কিন্তু এতদ্দেশীয় কাব্যপ্রিয় মহাশয়েবা যদিস্যাৎ আমারদিগের পরিশ্রমের তুল্য মূল্য বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য আনুকূল্য করেন, তবেই আমরা শ্রম সাকল্য সাফল্য জ্ঞানে এই বৃহদ্ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারি, নচেৎ কোন মতেই সাহস ও উৎসাহ জন্মিতে পারে না। আমরা নিশ্চিন্ত রূপে নির্ণয় করিয়া দেখিলাম, যে ৪ চারি টাকা মূল্য নিদ্দিষ্ট না করিলে শ্রমের সার্থকতা ও ব্যয়েব সাহায্য হওণের সম্ভাবনাভাব। অতএব এতদ্বিষয়ে সর্ব্ব সাধারণের অভিপ্রায় জানিতে পারিলে শীঘ্রই কর্ম্মারম্ভ করিতে পারি, এবং এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে ভবিষ্যতে আর আর গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করণে সাহসী হইতে পারিব।

এই মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় বিরচিত অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে যেরূপ ছন্দ প্রবন্ধের বাহুল্য দেখা যায়, অন্যান্য ভাষা রচিত পুস্তকে প্রায় তাদৃশ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাহার মধ্যে ভাষানুযায়ী পয়ার, মালঝাঁপ, বক্র পয়ার, লঘু তোটক, দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী,

ভঙ্গ চৌপদী, বক্র দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদী অথবা পঞ্চপদী ও চৌপদী প্রভৃতি ছন্দে যাহা রচনা হইয়াছে তাহা অতিশয় মনোহারি, তাহাতে কোন দোষস্পর্শ হয় নাই।

সংস্কৃতানুযায়ি বর্ণবৃত্তি মধ্যে গণিত, ভুজঙ্গপ্রয়াত, তূণক, তোটক, পঞ্চচামর এবং মাত্রাবৃত্তি মধ্যে গণিত পজ্ঝটিকা ও চৌপাইয়া প্রভৃতি ছন্দের মধ্যে যাহাতে সংস্কৃত রচনা হইয়াছে তাহা অত্যুত্তম, কিন্তু ঐ ছন্দে ভাষা রচনা হইয়াছে তাহার স্থানে স্থানে গুরু লঘুর ব্যত্যয় দেখা যায়, ইহাতে আমরা গ্রন্থকর্ত্তার প্রতি তাদৃশ দোষাল্লেখ করিতে পারি না, কারণ যে পর্য্যন্ত সাধ্য তাহাতে তিনি যত্নের ঘাটি করেন নাই, তিনি কি করিবেন, সংস্কৃতচ্ছন্দে প্রায় ভাষা রচনা তাদৃশরূপ উত্তম হয় না, তথাপি ভারত অন্য অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট করিয়াছেন, ইহা সহজেই স্বীকার করিতে হইবে।

এই পুস্তকে বর্ণে বর্ণে সমরূপ মিলনের যাদৃশ পারিপাট্য আছে পুস্তকান্তরে প্রায় তাদৃশ দৃশ্য হয় না, তবে বৃহদ্‌গ্রন্থ রচনা করিতে গেলেই দুই এক স্থানে তাহার যৎকিঞ্চিৎ ব্যভিচার ঘটেই ঘটে, ইহা দোষের মধ্যে গণিত নহে এবং গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায়ানভিজ্ঞ ইদানীন্তন ব্যক্তি কৃত গ্রন্থের স্থানে স্থানে যে পাঠের দোষ দেখা যাইতেছে তাহা দর্শন করিয়া গ্রন্থকর্ত্তার প্রতি দোষারোপ করা কেবল আপনার অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা সারমাত্র।

এই পুস্তকে তত্তৎ প্রসঙ্গানুসারে প্রায় নবরস বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শুদ্ধ শৃঙ্গার রসের প্রাবল্যরূপেই বর্ণনা হইয়াছে, এবং বীররসেরো কিঞ্চিৎ প্রাবল্যমাত্র। অপর করুণা, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্তি এই সপ্ত রসের স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বর্ণনা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা প্রধানরূপে গণ্য হইতে পারে না। এই স্থলে অন্য রসের কথাই নাই, সমস্ত গ্রন্থখানি অন্বেষণ করিয়া

দুই এক স্থানে যৎকিঞ্চিৎ করুণা রস যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাও শৃঙ্গা রসের প্রসঙ্গাধীনেই লিখিত হইয়াছে, শান্তিরস নাই বলিলেই হয়।...

এই মহাশয় অন্নদামঙ্গল রচনার পূর্ব্বে কিম্বা পরে যে সকল ভাষা কবিতা রচনা করিয়াছেন অন্নদামঙ্গলের সহিত তাহার তুলনা কোন ক্রমেই হইতে পারে না, ইহাতে বিশিষ্টরূপেই প্রমাণ হইতেছে, যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভায় আশ্রয় লওয়াতেই নানা কারণে এই অন্নদামঙ্গল অনেক প্রকারের দোষশূন্য ও প্রকৃষ্ট হইয়াছে, পরন্তু পদ্যের দ্বারা ইঁহার পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, পরিশ্রম, এবং যত্নের ব্যাপার যত প্রকাশ পাইয়াছে, দৈবশক্তির পরিচয় তত প্রকাশ পায় নাই, ফলতঃ যে পর্য্যন্ত ব্যক্ত হইয়াছে তাহাও সাধারণ নহে।..."

এর পর কবি ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের জন্মের সাল সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করেছেন রায় গুণাকরের 'সত্যপীরের ব্রতকথা'র ভণিতায় উল্লেখিত "সনে রুদ্র চৌগুণা" অবলম্বনে। এবং পরিশেষে গ্রন্থ সমাপ্তিতে সবিনয়ে লিখেছেন :

"যেমন সমুদ্র সম্বন্ধে গোষ্পদ, পর্ব্বত সম্বন্ধে রেণু, মহাকাশ সম্বন্ধে ঘটাকাশ, সূর্য্য সম্বন্ধে খদ্যোত, হস্তী সম্বন্ধে মশক।—এবং সিংহ সম্বন্ধে শৃগাল, সেইরূপ ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে আমি। অতএব এই মহাপুরুষের "জীবন চরিত" রচনা সূত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, বিদ্যা ও গুণাকরের আর আর গুণের বিষয়ে আমি যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম, অনবধানতা, অজ্ঞানতা এবং ভ্রান্তি বশতঃ যদি তাহাতে কোনরূপ দোষ হইয়া থাকে তবে গুণাকর পাঠক মহাশয়ের এই দোষাকর প্রভাকর প্রকাশকরের প্রতি ক্রোধাকর না হইয়া ক্ষমাকর ও কৃপাকর হইবেন।

পরন্তু যে যে স্থানে অশুদ্ধ অর্থাৎ শব্দ ও বর্ণের দোষ হইয়াছে, অনুকম্পা পূর্ব্বক তাহা মার্জ্জনা করিবেন।"— [পৃষ্ঠা ৫৫—৬১]

ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত ভারতচন্দ্রের রসঘন একটি কবিতা উৎকলন করা গেল। কবিতাটির নাম করদ্রাকথ—শব্দটি ফারসী—মানে "কাহার দ্বারা একর্ম্ম হইয়াছে এবং কে একর্ম্ম করিয়া প্রস্থান করিল।" কবিতাটি হোল :

পঞ্চপদী।

"কামিনী যামিনী মুখে, নিদ্রগতা শুয়ে সুখে
ধীর শঠ তার মুখে, চুম্বিতে চুম্বন সুখে,
ধীরে ধীরে কার্দ্দোরফথ্।
নিদ্রা হোতে উঠে নারী, অলসে অবশ ভারি,
আরসিতে মুখ হেরি, চুম্ব চিহ্ন দৃষ্টি করি
ভাবে ভাল্ কার্দ্দোরফথ্॥"

এই কবিতায় যে আশ্চর্য কৌশল ও বিদ্যা প্রকাশ পেয়েছে তা রসজ্ঞ জনেরাই জানতে পারবেন।

ভারতচন্দ্রের একটি হিন্দি ভাষার কবিতা :

এক সম বৃকভানু কুমারী।
মাত পিত সন বৈঠ নেহারী॥
হয়ে লগ্ আউসর, দূতী জো আয়ি।
ভেট্ চল, নন্দলাল, বোলায়ি॥
দেখ্ নহি আঁখ্, শুন্ নহি কাণ্।
কা কুছ্ আয়িহো, আওল খায়ি॥
কাঁহাকে কানায়া লাল্, কাঁহা সো পছান্ জান্।
কাঁহা সো তু, আয়ি হ্যায়, খাক্‌পর্ তেরে ব্রজকি বসনে॥
পানি মে আগ্, লাগাওনে আয়ি।
কুছ্ বাৎ এতোৎ কো, কুছ বাৎ ও তোৎ কো, বাতোন্ শুন্
বাৎ, হামারী সাৎ, লাগায়ি হ্যায়॥" [পৃষ্ঠা—৩০]

ভূমিকায় ঈশ্বর গুপ্ত যা লিখে গেছেন ভারতচন্দ্রের কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, তাই উদ্ধৃতি করে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্তে'র আলোচনা শেষ করা যাক ঃ

"...প্রণীত অনেকগুলীন অপ্রকাশিত উৎকৃষ্ট পদ প্রকটিত হইয়াছে—সেই সকল কবিতা এপর্য্যন্ত কাহারও নেত্র-কর্ণের গোচর হয় নাই। তাহার মধ্যে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি ও পারস্য ভাষার চমৎকার চমৎকার কবিতা আছে, যিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন, তিনিই আশ্চর্য্যে অভিভূত হইবেন, তিনিই ভারত-চন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য বিষয়ের প্রচুর প্রতিষ্ঠা করিতে থাকিবেন।...

এ পুস্তক বিদ্যালয়েব ছাত্র প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেই অত্যন্ত হিতকর ও আনন্দকর হইবেক।"

রাম রাম বসুর রচিত।
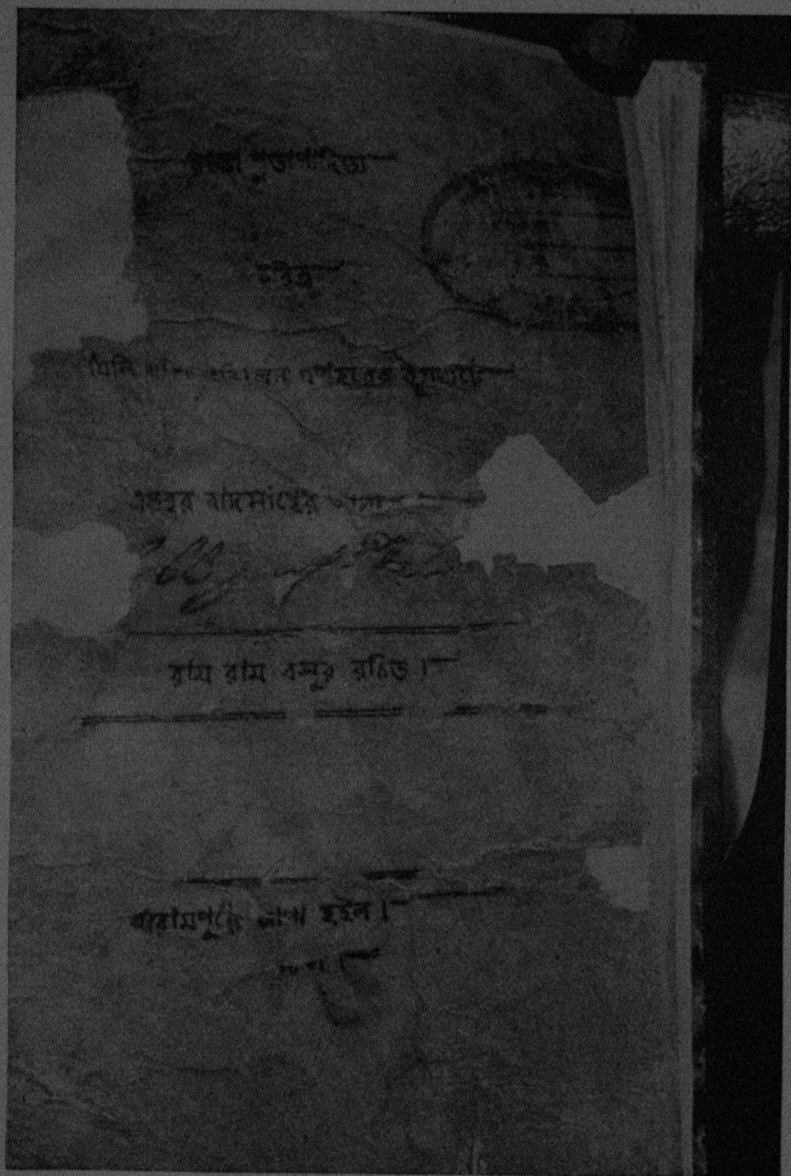
'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-র টাইটেল পেজ।

রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র

বারো ভুঁইয়ার সেরা ভুঁইয়া—ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ! বাঙালীর ভীরু কাপুরুষ বদনাম ঘুচিয়ে যিনি একদা সোনার বাঙালায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর নামে কার বুকই না গর্বে ফুলে ওঠে? উপন্যাসের হিরো হবার সুযোগ্য পাত্রতো বটে!

অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে বাংলা গদ্য-সাহিত্য দানা বেঁধে ওঠার প্রথম যুগে কোম্পানীর ফিরিঙ্গী আমলাদের জন্য মৌলিক বাংলা বই লিখতে বসে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কথাই নিশ্চয় মনে পড়েছিল কথাশিল্পী রামরাম বসুর। বাস্তব ইতিহাসকে দু'হাতে সরিয়ে রেখে পৌরাণিক হিরোর সন্ধান তিনি করতে যাননি। 'যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম' বঙ্গজ কায়স্থ এ মহারাজার যশোগাথা ইতিপূর্বে ভারতচন্দ্রও গেয়ে গেছেন তাঁর অমর কাব্য অন্নদামঙ্গলে। রামরামও তাঁর প্রথম বাংলা গদ্য রচনার চরিত্র নির্বাচন করেছেন প্রতাপাদিত্যের বীরগাথাকে কেন্দ্র করে।

রামরাম বসুর রচিত "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র—যিনি বাস করিলেন যশোহরের ধূমঘাটে একব্বর বাদসাহের আমলে।"—ছাপা শ্রীরামপুর—১৮০১—বইখানিই বাংলায় ছাপা প্রথম বাঙালীর লেখা বাঙলা একটানা মৌলিক রচনা। তার ইংরাজী আখ্যাপত্রটি হোল: The History of Raja Pritapadityu, By Ram Ram Boshoo, one of the Pundits in the College of Fort William, Serampore, Printed at the Mission Press. 1801.

রেভারেণ্ড লং সাহেবের বর্ণনাত্মক পুস্তক তালিকায় এ বইখানিকে ইতিহাস গ্রন্থ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তা উপন্যাসই হোক

আর ইতিহাসই হোক কিংবা একাধারে দুই, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'ই কিন্তু বাংলা গদ্য সাহিত্যে প্রথম মৌলিক রচনা যা উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথকেও পর্যন্ত (বিশেষ করে তাঁর প্রথম দিককার লেখা উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এ) প্রভাবান্বিত করেছে বলা চলে। অবশ্য, সার্থক শিল্পী বা লেখকমাত্রই স্বীকরণধর্মী। মডেল বা আদর্শের কোন সুঠাম কাঠামো ছাড়া শ্রেষ্ঠ কিছু সৃষ্টি করা সহজসাধ্য নয়। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' যে যুগে লেখা সে যুগে লেখকের সামনে আদর্শস্থানীয় কোন বাংলা গদ্য গ্রন্থই একরূপ ছিল না বলা যায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সবেমাত্র তখন স্থাপিত হয়েছে। উইলিয়ম কেরী বাংলা বিভাগের তার অধ্যক্ষ। মুন্‌শী রাম-রাম ছিলেন কেরীর বাংলা ভাষার শিক্ষক। পাদরী টমাসেরও ছিলেন তাই। এ সুবাদে মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরীর অধীনে একজন সহকারী পণ্ডিতের পদে তিনি বহাল হন। কলেজে বাংলা পাঠ্য-পুস্তকের একান্ত অভাব দেখে কেরী বাংলা বই লেখায় হাত দেন এবং তাঁর অধীনস্থ পণ্ডিতদেরও উৎসাহিত করেন। মাত্র দু'তিন মাসের মধ্যে রাম রাম 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' লিখে কেরীর সামনে বইখানি পেশ করেন এবং তা শ্রীরামপুর মিশন প্রেসেই ছাপা হয়। রাম রাম বসুই এ ক্ষেত্রে পাইওনীয়র। এ বইখানার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তিনি তিন শ' টাকা পুরস্কার লাভ করেন। মারাঠিতেও এর অনুবাদ হয় এবং পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্বাচিত হয়। এ অনুবাদ করেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মারাঠি ভাষার প্রধান—বৈদ্যনাথ পণ্ডিত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মূল রচনার সঙ্গে মারাঠি অনুবাদও নাকি পড়ান হোত।

রাজা প্রতাপাদিত্যের পরিচয় পাঠকদের কাছে নতুন করে দেবার

প্রয়োজন নেই। 'যশোর নগর ধাম, প্রতাপ-আদিত্য নাম' বাংলার ঘরে ঘরেই সমান আদৃত। 'ভবানীর বরপুত্র' ঐতিহাসিক এ বীরপুরুষকেই কেন্দ্র করে রাম রাম তাঁর প্রথম গদ্যের বই রচনা করেন ইতিহাস ও তখনকার দিনে প্রচলিত উদ্ভট কবিতা আর শোনা প্রবাদ অবলম্বনে। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র গোড়ায় তিনি লিখেছেন ঃ

"...সংপ্রতি সর্ব্বারম্ভে এদেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিৎ পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ-পাঙ্গরূপে সামুদাইক নাহি আমি তাহারদিগের স্বশ্রেণী একেই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতৃ-পিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত এবং আর আর অনেকে মহারাজার উপাখ্যান আনুপূর্ব্বক জানিতে আকিঞ্চন করিলেন এ জন্য যে মত আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ি লেখা যাইতেছে।

এ প্রশঙ্গের আদি এই রামচন্দ্র নামেতে একজন বঙ্গজ কায়স্ত পূর্ব্ব দেশ নিবাসী আপন রোজগারের চেষ্টায় দেশান্তরি হইয়া পাটমহল পরগণায় অবস্থিতি করিলেন এবং সেই স্থানে বিবাহ করিলেন তাহার স্যালকেরা সরকার সপ্তগ্রামের কাছারিতে কাননগো দপ্তরে মুহরি ছিল রামচন্দ্রও তাহারদের সমিভ্যারে দপ্তরখানায় যাতায়াত করিতে ২ সর্ব্বত্রে পরিচিত হইলেন রামচন্দ্র ক্ষমতাপন্ন লোক অতএব ঐ দপ্তরে তিনিও মুহরিগিরি কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলেন।—

এই মতে কতক কাল গত হইলে রামচন্দ্রের প্রতি দেবতার অনুগ্রহ তাহাতে ক্রমে ২ তাহার তিন জন পুত্র সন্তান জন্মিল তাহারদের জ্যেষ্ঠের নাম রাখিলেন ভবানন্দ মধ্যমের নাম গুনানন্দ কনিষ্ঠের নাম শিবানন্দ তাহারা তিন ভ্রাতা আপনারদের জাতি ব্যবসা লেখা পড়ায় তিন জনেই পটু হইল পারসি ও বাঙ্গলা ও নাগরি আদিতে মূর্ত্তিমন্ত তন্মধ্যে রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শিবানন্দ অধিক ক্ষমতাপন্ন।—

কাননগো দপ্তরে আপন বাপের প্রষ্ঠে কার্য্য কর্ম্ম করিতেছিল ইতিমধ্যে সে দপ্তরের শিরিস্তাদার কান্তার নামে এক জন কটকী ছিল তাহার সহিত শিবানন্দের অপ্রণয় হইয়া সে হইতে উৎখ্যাত হইয়া গৌড়ে রাজধানি স্থানে গতি করিলেন ।—

সে সময় গৌড়ে বাদসাহি কোট বাঙ্গলা ও বেহারের খালিসা সেই স্থানে তাহার আধিক্ক্য নবাব ছোলেমান গররাণি নাম পাঠান ছোলেমানের পূর্ব্বাবধি কিছু এমত ঐশ্বর্য্য ছিল না দৈবক্রমে তাহারি কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িস্যা তিন সুবার কর্ত্তা হইয়া মহা ঐশ্বর্য্যমন্ত হইয়াছিল তাহার বিবরণ এই ।—

যে কালে দিল্লির তক্তে হোমাঙু বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ ও বেহারের নবাব পরে হোমাঙু বাদসাহের ওফাত হইলে হিন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল এ কারণ হোমাঙু ছিলেন বৃহত গোষ্ঠী তাহার অনেকগুলিন সন্তান তাহারদের আপনাবদের মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর ২ ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে সুবাজাতের তহশিল তাগদা কিছু হইয়াছিল না ।

এই অপকাশক্রমে ছোলেমান সেনা সর্জ্যা করিয়া সে সুবাও আপন করতল করিলেন এবং দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিন সুবার কতৃত্ব নিস্করে করিলেক ইহাতে ভাণ্ডারাবধি ধনে পরিপূর্ণ করিলেন ।—

পরে হোমাঙু সাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র একব্বর সাহ দিল্লির তক্তে বাদসাহ হইলেন তৎকালিন ছোলেমান বিস্তর শওগাত নজর ইত্যাদি দিয়া একব্বর বাদসাহের সহিত সাখ্যাত করিলে সময়ক্রমে বাদসাহের অনুগ্রহে অনুগৃহীত হইয়া ঐ তিন সুবায় পদার্পণ হওনের ফরমান ও চিত্রবিচিত্র খেলাত পাওনেতে কৃতার্থ হইয়া পুনরায় আপন স্থান গৌড়ে বাহুড়িলেন তাহাতেই মহা ঐশ্বর্য্যেতে সুবাদারি করিতেছিলেন ।—

সেইকালে রামচন্দ্র আপনার তিন পুত্র সাতে করিয়া সপরিবারে

গৌড়ে উপস্থিত হইলেন কএক দিবস বাসা করিয়া তিষ্ঠিয়া নজর দিয়া ছোলেমানের সহিত দেখা করিলে তাহার পুত্রেরদের আরজদাস্ত অনুযায়ি কাননগো দপ্তরে মুহরিগিরিতে পদার্পণ হইলেন এবং সেই দেশে ঘর দ্বার করিয়া বসত বাস করিলেন।

ইহারদের তিন ভ্রাতার মধ্যে শিবানন্দ বড় চালাক সদাসর্ব্বদা কার্য্য কর্ম্মের দ্বারায় ছোলেমানের নিকটবর্ত্তি হইতেন তাহাতে ছোলেমান শিবানন্দকে জ্ঞাত ছিল কাননগো দপ্তরের কর্ত্তা যে ছিল তাহার পরলোক হইলে শিবানন্দ ছোলেমানের অনুগ্রহেতে সেই দপ্তরের কর্ত্তা হইলেন। ছোলেমান শিবানন্দকে সম্মান করিয়া খেলাত দিয়া সম্ভ্রান্ত করিলেন।—

সেই হইতে শিবানন্দের বৃদ্ধি পর ২ উন্নতির বাহুল্য হইল কার্য্যের আঞ্জাম করাইতে ছোলেমান শিবানন্দকে বিস্তর ২ সম্ভ্রম করিতে লাগিলেন। তাহাতেই ইহারদের ভাগ্য উদয়ের আরম্ভ। এক বৎসব এই মতে গত হইলে ছোলেমানের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ বাজিদ কনিষ্ঠ দাউদ শিশু পাঠদসায় পাঠসালায় পারসি ইত্যাদি বিদ্যা অভ্যাস করেন।—

শিবানন্দের ভাইপো দুই জন জ্যেষ্ঠ শ্রীহরি ভবানন্দের পুত্র মধ্যম জানকীবল্লভ গুণানন্দের পুত্র এই দুই ভ্রাতা প্রায় সমান বয়স। শিবানন্দ তাহারদের দুই জনকেও দাউদের পাঠসালায় বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবত্ত করিয়া দিলেন এই মতে সে দুই কুমার নবাব জাদার সহিত লেখা পড়া করেন একওরেতে খেলান ও বেড়ান। আস্তে ২ নবাব জাদার সঙ্গে এ দুহার বড়ই এক হৃদতা হইল তিন জনে বড়ই প্রিত প্রায় বিচ্ছেদ হইতেন না।—

এক দিন দাউদ কহিলেন ইহারদিগের দুই ভ্রাতাকে আমি যদি বাদসাহ হইব তবে তোমারদিগকে ওজির করিব এই দৃঢ় আমার পণ

আমার যে কার্য্য হইবেক তাহারি নাএব তোমারদিগকে করিব ইহার অন্যথা হইতে পারিবেক না। এই মতে বাল্য ক্রীড়া ও লেখা পড়া ইত্যাদি বিদ্যা অভ্যাস করাতে সুখ ভোগে কাল যাপন করিতেছিলেন। ইহাতে ব্যাপক কাল গত হইল।— …”

‘পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত’ বিবরণের মধ্যে লেখক হয়ত ‘রাজনামা’ বা নিজামউদ্দীন আহম্মদের ‘তবকৎ-ই-আকবরী’ প্রভৃতি অ-বাঙ্গালীর লেখা বিবরণের উল্লেখ করে থাকবেন। ইতিহাস রচনাই রামরামের একমাত্র মূল উদ্দেশ্য ছিল না। ঐতিহাসিক উপাদান ও প্রাচীন ঘটককারিকার প্রবাদ এবং শোনা কাহিনী অবলম্বনে রচিত রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে ঐতিহাসিক মূল্য থাকুক আর না থাকুক, তা কিন্তু সাহিত্য-রসে বঞ্চিত নয়। তার প্রমাণ ঘটনা-বৈচিত্র্যময় ক্ষুদ্র এ রচনাখানির অনেক স্থলেই দেখা যায়—বিশেষ করে ধূমঘাটস্থ যশোহর পুরীর নিখুঁত বর্ণনায়। ফার্‌সী সাহিত্যের অনুসৃত রীতি অনুযায়ি পাতার পর পাতা লেখকের খুঁটিনাটি বর্ণনা পাঠ করেও ক্লান্তি আসে না। বরং ঔৎসুক্য যায় বেড়ে। যেমন—

“তাহার প্রথমত চতুর্দ্দিকে নগর-বেষ্টিত এক পরিপাটির রাস্তা, সে রাস্তা পার হইয়া গেলে দিব্য সহর, হাট-বাজার, গোলাগঞ্জ তাহার স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সামিগ্রি সকল বিক্রয় হইতেছে, লোকেরা দালানের মধ্যেতে বসিয়া ক্রয়-বিক্রয় করে নানাবিধ সামিগ্রি তাহার স্থানে স্থানে পরিপূর্ণ চারিদিগেতেই এই মত নগর। পৃথক ২ পটি তাহা অতি শোভাকর। তাহার এক এক পটিতে কেবল এক ২ দ্রব্য পরিপূর্ণ কয়লা লোকেরা ডালাপসরা ধরিয়া জিনিষ-পত্র ওজন করিতেছে তাহার এক ভিতেতে পসারির দোকান সহস্রাবধি।…”

এ তো গেল শহরের হাট-বাজারের বর্ণনা। তারপরে দেখতে পাই ঃ "চারিদিকে চারি সরোবর নানাবিধ পুষ্প তাহাতে সুগন্ধ আমদ করে। বিলক্ষণ মিঠা জল বিস্তর ২ বিহঙ্গম তাহাতে জলক্রীড়া করে। চারি সরোবরের পার্শ্বেতে অপূর্ব্ব বাগান বিধানে ২ সহস্রাবিধ পুষ্প তাহায় শোভা পাইতেছে। লক্ষ ২ মেওয়া বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কত ২ মালিগণ তাহার তদবির কারক শোভান্বিত ফুলওয়ারি তাহাতে ভ্রমরা-ভ্রমরি ঝঙ্কার দিতেছে।...এই মত শোভাকর উদ্যান। প্রথমত নগর বেষ্টিত বাট। তৎপরে সহর। তারপর সরোবর। তারপর উদ্যান ক্রমে ২ এ চারিস্থান। এ চারির আয়তন এক ক্রোশ। তৎপরেতে চন্দ্রপ্রভা পুরির আরম্ভ।..." (পৃঃ ৮১)

রাম রাম বসুর নিজের কথায় পুরীর বর্ণনা ঃ

যশহর পুরীর বর্ণনা। চারি দিগে গড় তাহার দীর্ঘ প্রস্থ এক ২ দিগে পাঁচ ২ ক্রোশ আয়তন গড় প্রসস্তে একশত হাত বিংশতি হাত ভিতর গড়ের উপর মৃত্তিকার পোস্তা ত্রিংশতি হাত উচ্চ গোড়ায় ষাইট হাত মাথায় দশ হাত এ কেবল মাটিয়া পোস্তা। পোস্তার বাহির ভাগে গড় তাহার দুই পার্শ্ব এবং মধ্য স্থল সামুদাইক রেকতায় গ্রন্থিত। গড়ের মধ্যভাগে কোর হইয়া মাটিয়া পোস্তা লাগিয়া দশ হস্ত পরিসর দেয়াল গাঁথন মাটিয়া পোস্তার মস্তক পর্য্যন্ত এবং পোস্তার ভিতর পার্শ্বেও সেই মত পাঁচ হাত প্রসস্ত প্রস্তরের দেয়াল। দুই পার্শ্বের দেয়ালের মাথায় মাথায় খিলান তৎপরে সেই খিলানের উপরে আর পাঁচ হাত দেয়াল উচ্চই হইয়া সেই স্থানে মুরচারবন্দি দশ ২ ব্যামান্তরে এক ২ তোব রাখিবার স্থল এবং আয়োজন সমেত তোব সেই স্থানে নিয়োজিত ও তোবচিন এক ২ তোবের সাতে দুই ২ ব্যক্তি এবং তাহারদের রহিবার স্থান তথা হইল।—

এই মত তোব গড়ের চারিদিগে ও চারি দিগে চারি দ্বার তাহার উপরে নৌবৎখানা। জন্ত্রী নানান প্রকার জন্ত্র সমেত সে স্থানে আছে দণ্ডে ২ প্রহরে ২ সায়াহ্নে ও প্রভাতে তাহারদের নিয়মানুযায়ি সময়েতে বাদ্যধ্বনি করিতেছে। তাহার উপরি ভাগে ঘড়িঘর তাহাতে তরো বতরো ঘড়ি ঘড়িয়ালেরা দণ্ডে ২ তাহারদের কাংস্য ঝাঁজের উপরে মুদ্গর ক্ষেপণ করিতেছে। তদুপরি মন্দিরের আকার চূড়া তাহার নাম ঘণ্টাঘর তাহাতে বৃহৎ সত নাদীয় ঘণ্টা কলে বান্ধা হইয়া দোলায়মান সময়ক্রমে ঘণ্টা বাদক কল ফিরাইলেই আপনা হতে ঘণ্টা ঠনাঠন শব্দ করে।—

চারি দ্বারে গড়ের উপরে লৌহ নির্ম্মিত কলের পুল কল সহযুক্তে প্রস্তুত হইয়া আছে দ্বারপালেরা সে পুল ক্ষেপণ করিলে গড়ের উপর বন্ধিমত লোকেরদের গতায়াতে পথ হয় সময়ক্রমে কল আকর্ষণ করিলে পুল উঠিয়া দ্বার বন্ধ করে। এই ২ মত সর্ব্ব দ্বারে সকলেই আপন কার্য্যে নিযুক্ত।—

গড়ের পোস্তার নিচে প্রথম দিব্য বাগান একপোয়া পথ প্রসস্ত চারি দিগে সমান নানা প্রকার মেওয়া গাছ ও পুষ্প কানন ও মধ্যে অপূর্ব্ব কেয়ারি ও রহিবার রম্য স্থল। পরে সৈন্যের স্থল চারি দিগেই সমান আয়াতন। তৎপরে চারি দিগে সহর বাজার গোলা ও গঞ্জ বহুমতে খরিদ ফ্রোক্ত হইতেছে দেশ দেশের মহাজন লোক গতায়াত করিয়া খরিদ ফ্রোক্ত করে। এই মত সহর বাজার চারি দিগে অর্দ্ধ ক্রোশ প্রসস্ত। পরে দ্বিতীয় গড় তাহার সমস্তই এই মত। পরে তৃতীয় ও চতুর্থ ও পঞ্চম গড় সমস্তই একি সরঞ্জাম।—

পঞ্চমীয় গড়ের মধ্যে অপূর্ব্ব শোভাকর পুরী আয়াতন সর্ব্ব সমেত দেড় ক্রোশ দীর্ঘ ও প্রসস্তেও সেই মত। রাজার পুরের

শোভা অতি মনোহর আখ্যান ভব হেন্দোস্থানে এ মত পুর কখন কেহ করিতে পারেন না।—

তাহার প্রথমত চতুর্দ্দিগে নগর বেষ্টিত এক পরিপাটির রাস্তা সে রাস্তা পার হইয়া গেলে দিব্য সহর হাট বাজার গোলা গঞ্জ তাহার স্থানে ২ ভিন্ন ২ সামিগ্রি সকল বিক্রয় হইতেছে লোকেরা দালানের মধ্যেতে বসিয়া ক্রয় বিক্রয় করে নানাবিধ সামিগ্রি তাহার স্থানে স্থানে পরিপূর্ণ চারি দিগেতেই এই মত নগর।···

কোন দিগে চালু ধান বহুবিধ ভূষি বস্তু বিকিকিনি হইতেছে ডালি হারার পটি এক দিগে। কোন স্থানে নানা বিচিত্র বস্ত্র। কোন ঠাঁই কাঁসারি হাটা। কোন এক দিগে কামার হাটা সকলেই আপন ২ স্থানে বসিয়া নিজ ২ জিনিস বিক্রয় করিতেছে। কোন দিগে জওহরিরদের দোকান তাহাতে মুক্তা প্রবাল মনি চুনি রকমে ২ বহুমূল্য প্রস্তর। কোন স্থানেতে হালইকরেরা মিষ্টান্ন পর্কান্ন বেচিতেছে। গোপগণেরা কোন দিগে দধি দুগ্ধ যাচয়মান হইয়া বেচিতেছে মাক্ষণ ও লবনি খির ও সর ছানা দোকানে ২ প্রস্তুত। কোন দিগে গোয়ালিনীরা বলিতেছে আমার এ আচ্ছা দধি আসিয়া কিন ইহা। তৈল ঘৃত লবণ কোন ২ স্থানে। কোন দিগেতে দোকানে মৎস্য পরিপূর্ণ। কোন ২ পটিতে কেবল মুদিখানা দোকান। কোন স্থানে চিনি ও মিছ্রির কারখানা। কোন স্থানেতে নানা জাতি ফল বিক্রি হইতেছে। আর এক স্থানে চিনাদি বিক্রীয় দ্রব্য। কোন ভাগে সুঁড়িগণের দোকান। কোন স্থানে তামাক গাঁজা ভাঙ্গ চরস বিক্রি হইতেছে। এক দিগে শাঁখারিগণ শঙ্খ তৈয়ার করিতেছে. কোন স্থানে ছুতার লোক দোকান করিয়াছে কাষ্ঠের নানা মত সামিগ্রি প্রস্তুত। কোন ভাগে পাথর কাটারদের দোকান। কোন স্থানে সুবর্ণ বণিকেরা দোকানে বসিয়াছে তাহারদের কেহ ২ টাকা মোহর

বদলাই করে কেহ ২ কড়ি বেচে কেহ ২ কেবল সোনা রুপা। সোনা ও রুপার বাসন কোন স্থানে থরে ২ রাখিয়াছে। কোন স্থানে পশ্চিমীয় বজাজেরা দোকান দিয়াছে বহুবিধ জিনিস তাহারদের দোকানে সাল পামরি বনাত পটু ভোট কম্বল জমাট ইত্যাদি বস্তু রকমে ২। শাদা থান পাটনাইয়া ঢাকাই মালদহিয়া পৃথক ২ আড়ঙ্গের রেসমি বস্ত্র তরোবতরো। শত ২ দোকান কোন স্থানেতে তুলিচা গালিচা সতরঞ্চি মথমল। কোন দিগেতে কারোয়ানেরা ঘোড়া হাতি উট খর গরু মেষ অজা ইত্যাদি পালে ২ লইয়া বসিয়া আছে। এই মত বৃহৎ শোভাকর সহর।

তারপরে চারি দিগে চারি সরোবর নানাবিধ পুষ্প তাহাতে সুগন্ধ আমদ করে। বিলক্ষণ মিঠা জল বিস্তর ২ বিহঙ্গম তাহাতে জল ক্রীড়া করে। চারি সরোবরের পার্শ্বেতে অপূর্ব্ব বাগান বিধানে ২ সহস্রাবধি পুষ্প তাহায় শোভা পাইতেছে। লক্ষ ২ মেওয়া বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কত ২ মালিগণ তাহার তদবির কারক শোভান্বিত ফুলও-য়ারি তাহাতে ভ্রমরা ভ্রমরি ঝঙ্কার দিতেছে।—

চতুর্দ্দিগেতে কোকিলেরা সুনাদ করিয়া বুলিতেছে আর ২ পক্ষিরা ডালে ২ বেড়াইতেছে মউর পেকম ধরিতেছে খঞ্জনেরা নৃত্য করে সহস্রাবধি আর ২ পক্ষি চারি দিগে কলধ্বনি করিতেছে। এই মত শোভাকর উদ্যান। প্রথমত নগর বেষ্টিত বাট। তৎপরে সহর। তারপর সরোবর। তারপর উদ্দ্যান ক্রমে ২ এ চারি স্থান। এ চারির আয়াতন এক ক্রোশ। তৎপরেতে চন্দ্রপ্রভা পুরীর আরম্ভ।—

প্রথমত মল্লগণেরা ও অশ্ব ও আর ২ সওয়ারির পশুগণের রঙ্গভূমি অর্দ্ধ ক্রোশ প্রসস্তে পুরীর চারিদিগ বেষ্টিত। ইহাতে দূর্ব্বা ঘাশ জমাইয়াছে অর্দ্ধ হাত পুর দূর্ব্বা সমশির। শত ২ মালিরা তাহার

তদবির করে নিরবধি ছাপ ও সমশির রাখিতেছে। অতএব এই মত সে রঙ্গভূমি দূর্ব্বা যেন সবুজ বর্ণ মখমলের ন্যায় দেখা যায়।—

ইহা ছাড়াইলে পুরীর আরম্ভ। পূবে সিংহদ্বার পুরীর তিন ভিতে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে সরাসরি লম্বা তিন দালান তাহাতে পশুগণের রহিবার স্থল। উত্তর দালানে সমস্ত দুগ্ধবতী গাভীগণ থাকে দক্ষিণ ভাগে ঘোড়া ও গাধাগণ পশ্চিমের দালানে হাতি ও উট তাহারদের সাতে আর ২ অনেক ২ পশুগণ।—

এক পোয়া দীর্ঘ প্রস্থ নিজ পুরী। তার চারি দিগে প্রস্তরে রচিত দেয়াল। পূবর দিগে সিংহদ্বার তাহার বাহির ভাগে পেট কাটা দরজা। শোভাকর দ্বার অতি উচ্চ আমারি সহিত হস্তি বরাবর যাইতে পারে। দ্বারের উপর এক স্থান তাহার নাম নওবৎখানা তাহাতে অনেক ২ প্রকার জন্ত্রে দিবা রাত্রি সময়ানুক্রমে জন্ত্রীরা বাদ্যধ্বনি করে।—

নওবৎখানার উপরে ঘড়িঘর। সে স্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহারদের ঘড়িতে নিরক্ষণ করিয়া থাকে দণ্ড পূর্ণ হবা মাত্রেই তারা তাহারদের ঝাঁজের উপর মুদ্গর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।— ...

ঘন্টাঘরের চূড়ার উপরে ধ্বজ। তাহাতে উড্ডীয়মান পতকা শোভা পাইতেছে কৃষ্ণবর্ণ পতকা উড়িতেছে সে ধ্বজের উপরে তাহা অন্য লোকেরা দ্বারে থাকিয়া দেখিতে পায় যে মত মেঘ পবনের তেজে গতি করিতেছে। এ মত আশ্চর্য্য সিংহদ্বার গঠন করিয়াছে হেন্দোস্থানের মধ্যে এ মত স্থান কুত্রাপি দেখা যায় না।—

দ্বারে দ্বারপাল সের আলি খাঁ নামে পাঠান ভয়ঙ্কর তাহার মূর্ত্তি দুর্দ্দর্শ কায় মহা পরাক্রমে। আফিম চরস ইত্যাদি খায় সদাই ক্রোধি শত ২ পাঠান তাহার পরিবার অতি দম্ভেতে সে দ্বার রক্ষা করে তাহাকে দেখিলেই বিপক্ষ লোক পলায়নপর হয়। সে দ্বারের

মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার পর অপূর্ব্ব সুশোভিত নগর চারি দিগেই দোপটি সহর ছেমহলা বালাখানা তাহাতে পৃথক ২ স্থানে বেশ মূল্য সামিগ্রির মহাজন লোকের দোকান। বহুমত প্রকার বস্তু সেখানে বিক্রি হয়।—

যদি সে পুরে প্রবেশ করিতে চাহ তবে শুন তাহার পথ এই ২ দিগে।—

পূর্ব্ব দ্বার পুরী। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে প্রথমত উত্তর-বাহিনী হইয়া সে পথের সীমা পর্য্যন্ত যাইও পরে পশ্চিম মুখে যাইয়া দক্ষিণ মুখে হইবা তাহার অর্দ্ধপথ গেলে দ্বার পাইবা সে দ্বিতীয় দ্বার সিংহদ্বারেরি মত। পূর্ব্বমুখ হইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিবা পূর্ব্বমত সহর বাজার চৌদিগে ছেমহলা শোভা পায়। পরে উত্তর দিগে গতি করিয়া পথ না পাইলে পূর্ব্ব মুখে যাইও। দক্ষিণ মুখে অর্দ্ধপথ গেলে আর এক দ্বার পাইবা সে দ্বারও সিংহদ্বারের তুল্য। পশ্চিম হইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিবা এক দিব্য চক। অতি শোভান্বিত চক চিনার ভাস্করেরা তাহার চুণকামকারক। চকের চারি দিগে স্ফটিকের বেদি। ইহাতে সে স্থানে তেজস্কর ঝিকমিক করে।—

মধ্যে স্থলে নানা বর্ণের প্রস্তরে রচিত এক উচ্চইতর দিব্য মঞ্চ তাহার উপরে শ্রীমূর্ত্তির বার হয় বিশেষত পর্ব্ব উচ্ছবের সময়ে গোবিন্দ দেব তাহার উপরে বিরাজমান হএন। চকেতে প্রবেশ করিয়া বামদিগে গতি করিও কতক দূর এই মতে গেলে দ্বার দৃষ্টি হবেক সে দ্বারও বৃহৎ দ্বার সিংহদ্বারের ন্যায়। নওবৎখানা ঘড়ি ও ঘণ্টা ঘর সমস্তই একি সিংহদ্বারের মত কেবল এ দ্বারের দ্বার-পালেরা রাজপুত নতুবা আর কিছু বিভেদ নাই সিংহদ্বার হইতে। সে দ্বারে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম মুখ হইয়া কতদূর গেলে সম্মুখে

এক বিলক্ষণ দরজা পাইলে পশ্চিম মুখে সে দ্বারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উত্তব মুখ হইয়া ডাণ্ডাইও তাহাতে সম্মুখে অতি সান্নিধ্য এক দ্বার পাবা তাহার মধ্য দিয়া গেলে পশ্চিম দিগে কতদূর যাইও।—

ডান দিগে দ্বার পাইলে উত্তর মুখে হইয়া তাহাতে পসিও। তৎপরে ঐ মতে কতক দূর যাইতে২ দেখিবা বামে দ্বার তাহে সাদাই ঐ দিগেই গমন করিও দূরে সম্মুখে এক দ্বার পাইবা উত্তর মুখে তাহার মধ্যে গেলে এক মনোরম পুরী দেখিবা সে অতীতসালা দেশ দেশেব যাবদীয় অতীত রাজবাটীতে উত্তরিলে সেই পুরাতে তাহাবদেব স্থিতি হয়। ছেমহলা সে পুরী। অদ্যাপর্য্যন্ত অতীতেরদের স্থিতি সেই আলয়তেই হয়।—

সে পুরীব দক্ষিণ পশ্চিম কোনে এক দ্বাব পাইবা। মনোহর ফুল বাগান তাহার মধ্যে এক দিব্য চবুতারা তাহাতে কখন২ বৈঠক হয়। তাহার পশ্চিম দিগে দক্ষিণ মুখ দ্বার পাইবা তাহার ভিতর গেলে দেখিবা ভাণ্ডারের পুরী। তাহাতে২ স্তুপ২ ঢেরি২ খাদ্য সামিগ্রি কত২ ভাণ্ডারিরা তাহাতে নিযুক্ত দ্রব্যজাতি আনয়ন করিতেছে এবং বিতরণ করিতেছে এইমত তাহারদের ক্রিয়া দিবারাত্রি।—

দোমহলা বেশ ঘর। তাহার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোনে এক দ্বার পাইবা তাহা দিয়া গেলে সে স্থানে দেখিবা এক দিব্য সরোবর। রাজপুরের যাবদীয় পুরুষ মানুষ সেই সরোবরে সবেই স্নান করেন। তাহার অপূর্ব্ব নির্ম্মল জল। সরোবরের চারি পার্শ্ব তাহার তলা হইতে প্রস্তরে গ্রন্থিত। চারি পাড়ের উপরে স্ফটিক বিরচিত চারি বেদি। চারি দিগে শেত প্রস্তরে রচিত চারি ঘাট। ঘাটের উপরে অপূর্ব্ব বিরাজের স্থল দোমহলা। সে স্থান বড় সুগঠন।—

সরোবরের মধ্য স্থলে এক বেদি। প্রস্তরের ত্রিশ স্তম্ভ রোপণ করিয়া তাহার উপর দিব্য চবুতারা। চবুতারার চারি পার্শ্বে

সহস্র ২ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে এবং ভ্রমরেরা তাহাতে ঝঙ্কার ধ্বনি করিতেছে। এই মত শোভাকর সরোবর।—

সরোবরের দক্ষিণ পশ্চিম কোনে আর এক দ্বার পাবা। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বরাবরি যাইয়া ডাহিন দিগে দ্বার পাইলে তাহার মধ্যে পসিও সেখানে দেখিবা পৃথক স্থান তাহাতে দেয়ান মুছদ্দিগণের বৈঠক হয়। তাহার কোন স্থানে মালের কাছারি। কোন দিগে দেয়ানী ও ফৌজদারি আদালত তেজারতের কাছারি। এক দিগে কোন স্থানে পোদ্দারেরা টাকা পরখাই করিতেছে। এই মত অতি জলজলাট দিবা রাত্রি সে স্থানে।—

তারপর তার উত্তর পশ্চিম কোন দিয়া চলিয়া যাইও উত্তর মুখ হইয়া বহু দূর গেলে বাম দিগে দ্বার পাইবা তাহা পার হইলে দেখিবা পুরী দেবালয়। তাহা হইতে দক্ষিণ মুখে বার হইবা মাত্রেই যে দ্বার পাইবা তাহার মধ্যে খাজনাখানা জানিও। সমস্ত আমদানির টাকা সেই স্থানে থাকে। খাজনাখানার পশ্চিম দিগে দ্বার পাইলে তাহে পসিলে দেখিবা দেবী পূজার পুর। তাহারি উত্তর পশ্চিম কোনে দ্বার সেথায় এক সল্প স্থান সেখানে বোধনের গাছ।

তাহা পাচ করিয়া পশ্চিম মুখ দ্বারে গেলে দিব্য পুরী তাহার নাম দেয়ানখানা। তাহাতে রকমে ২ মিনার কারখানা। তাহা দেখিয়া তাহার পশ্চিম দক্ষিণ কোনে গেলে দ্বার পাইবা সে তোসাখানা রাজার যাবদীয় ধন রত্ন রাখিবার স্থান। সেস্থান হইতে চলিতে ২ দক্ষিণ মুখে হইয়া যাইও দক্ষিণ পূর্ব্বে দ্বার পাইবা তাহাতে পসিও। মহারাজার কুটুম্ব অন্তরঙ্গ রহিবার স্থান। সে পুরীর পূর্ব্ব দিগে দ্বার তাহার মধ্যে বালকেরদের পাঠশালা।—

তাহা ছাড়াইলে দক্ষিণ মুখ হইয়া গতি করিও। পূর্ব্ব দক্ষিণ কোনে দ্বার পাবা সে পুরীর নাম নাচঘর। সে পুরী দেখিলে আশ্চর্য্য

বোধ হবেক যে এ মত স্থান মানুষে কি মত গঠন করিল। ঝিকি মিকি করে তাহাতে দৃষ্টি করা কঠিন এ কারণ তাহার যাবদীয় স্থান রজত মণ্ডিত। তাহার মধ্য স্থল এক অপূর্ব্ব স্থান তাহার মধ্যে নটীরা নৃত্য গীত করে। অনেক ২ যন্ত্র তথায় আছে। কোন দিন নৃত্য দেখিতে মহারাজা আসনে রাণীগণের সহিত আগমন করেন।—

সে পুরের দক্ষিণ পশ্চিমে গেলে পুন দ্বার পাবা বৈঠকখানা পুরী তাহার নাম। এবং মহারাজার জল পানীয় সামিগ্রি সেই স্থানে থাকে তাহার অজ দক্ষিণে দ্বার সে মহারাজার ইষ্ট পূজার স্থল। সে পুরীর পশ্চিমে যে দ্বার সেই অন্তঃপুর যাওনের পথ। তাহার মধ্যে যাইয়া প্রথমত দেখিবা দিব্য দ্বার রক্ষক নপুংসকগণ অনেক নপুংসক সেই দ্বার রক্ষা করে। মহা বলবান তারা যমে নাহি ডরে।—

সে দ্বার পার হইয়া গেলে অন্তঃপুরে পসিয়া বামে দ্বার। দক্ষিণ মুখ হইয়া সেই দ্বারে প্রবেশ করিও পরে পশ্চিম মুখে পুনঃ দ্বার তাহা দিয়া যাইও উত্তর মুখ হইয়া। অর্দ্ধ পথ গেলে সে ঘরের দ্বার পাইবা। উত্তর দক্ষিণ দিঘল চৌমহলা সে ঘর। তাহার সর্ব্ব উপরে মহারাজার রহিবার স্থল। ছেমহলা অবধি নিচে আর ২ লোকের ঘরের পশ্চিমে এক লম্বা দোমহলা ঘর তাহাতে আর ২ দ্রব্যজাতি থাকে। তাহার উত্তর ভাগে রসইশালা।—

রসইশালার পশ্চিম দিয়া পুষ্কর্ন্নির পথ। বড় ঘরের নিজ দক্ষিণেই অন্দরের বাজে লোকের সেতখানা আর ২ সেতখানা দোমহলা ছেমহলা চৌমহলা মহলা মহলায়তেই আছে। এই ২ মত ধুমঘাটের পুরী।”

এবার বার ভুঁইয়াদের কথা ঃ

“সে সময় ও প্রদেশে বারো ভূঁয়া ছিল। বাঙ্গলা বেহার

উড়িস্যার কতক আসাম এই ২ দেশ তাহারদের বারো জনের অধিকার। তাহারদের একজন রাজা প্রতাপাদিত্য এই ২ মত বিবেচনা করেন। এবং সৈন্য সংগ্রহ করিতে প্রবর্ত্ত ক্রমে ২ সৈন্য জমা করিতেছেন। রাজা প্রতাপাদিত্য অতি ভাগ্যমন্ত রাজা।—

লোকে বলে যশহরীশ্বরী ঠাকুরাণী। তিনি অদ্যাপিও আছেন। মহারাজাকে সদয় হইয়া বর দিলেন তাহাতেই উহার এতেক প্রদপ্ততা। তাহার বিবরণ এই শুনিয়াছি।

এক দিবস রাজার বাহির গড়ের সেনাপতি কমল খোজা নামে একজন মহা পরাক্রান্ত এবং রাজার কাছে বড়ই প্রতিপন্ন হাত যোড় করিয়া নিবেদন করিল রাজার গোচরে। মহা রাজা আমি দুই তিন দিবস হইতে দেখিতেছি রাত্রি দুই প্রহরের পরে ঐ জঙ্গলটাতে অকস্মাত অগ্নি আকার প্রজ্বলিত হয় বড়ই দীপ্তিকর প্রচণ্ড আনলের ন্যায় তাহাতে প্রথম দিবস ঠাওরাইলাম বুঝি কোন রাখাল ইত্যাদি লোক এ বনে অগ্নি দিয়া থাকিবেক তাহাতে রাত্রে প্রজ্বলিত হইয়াছে। প্রাতে ঘোড় শোয়ারিতে যাইয়া দেখিলাম বন পূর্ব্ব মতই আছে বরং অধিক তেজস্ব। দুই তিন দিবস হইতে আমি এই মত ২ দেখিতেছি। মহারাজা আমাকে ভ্রান্ত জ্ঞান করিবেন এ পরাভয় প্রযুক্ত নিবেদন করি নাই।—

অদ্য সেই স্থানে এক আশ্চর্য্য ক্রিয়া হইয়াছে। রাখাল ছোক্রারা প্রত্যহ ঐ মাটে গরু ছাড়িয়া দিয়া ঐখানে খেলায়। অদ্য তাহারা পূর্ব্ব মত করিয়াছিল তাহাতে সেই স্থানে একটা ঢিপি আছে বনের ফুল ইত্যাদি সেই ঢিপিতে সাজাইয়া নিরূপিত করিল এক কালী ঠাকুরাণী এবং ফুল দিয়া সেই ঢিপিতে পূজা করিল। ওই রাখালেরদের কেহ নিরূপিত হইল কর্ম্মকর্ত্তা। কেহ পুরোহিত। তাহারদের কেহ ছাগল। এক গাছ হোগলা ঘাশ আনিয়া নিরূপণ করিল খড়্গ।—

পরে ছাগল নিরূপিত ছোক্‌রা উপুড় হইয়া পড়িলে বলিদান কারক নিয়োজিত হোগলায় খড়্গ উঠাইয়া এক কোপ মারিল তাহার ঘাড়ে তাহাতেই তাহার শিরচ্ছেদ হইয়া বেগে রক্ত ছুটিল ছোকরা ধড়ফড় করিতে লাগিল। অন্য অন্য ছোকরা পলায়নপর পরে সে শিরকাটা ছোকরার মাতাপিতা নালিস করিলে অন্য ২ ছোকরারদিগকে আক্রমণ করিয়া আনা গিয়াছে। সমস্ত ছোকরারা এই মত কহে এবং সে কাটা শব সেই স্থানেই আছে এবং তাহার পিতামাতার চৌকিদার।—

রাজা এই আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ মাত্রেই সমস্ত সভা সমেত উত্থান করিয়া আপন ২ জনারোহণে সেই স্থানে গেলে খোজা সেনাপতির বাক্য তৎমতে বিদিত হইল। দেখিলেন সে ঢিপিতে নানা প্রকার ফুল সাজাইয়াছে এবং মুণ্ড কাটা ছোকরা ও সে হোগলার খাঁড়া রক্ত মিশ্রিত। রাজা আর ২ ছোকরারদিগকে নিকটে ডাকিয়া বিবরণ তৎমতে জ্ঞাত হইলেন তাহারদিগ হইতে কিন্তু ইহার হেতু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।—

শব মৃত শরীরের লক্ষণ কিছুই হয় না শরীরের উত্তাপ জীবিত শরীরের মত ফুলেও না এবং দুর্গন্ধও হয় নাই কেবল স্কন্ধ মুণ্ড আলাদা ২ হইয়া রক্ত অনেক পাত হইয়াছে এ সকল ধারা নির্য্যাস করিতে পারিলেন না। এক সিন্দুক আনাইয়া তাহার মধ্যে ছোকরার মুণ্ড সমেত শরীর রাখিয়া সিন্দুকের চাবি আপন কাছে রাখিলেন। ছোকরার মাতাপিতাকে কহিলেন কল্য প্রাতে ইহার বিচার করিব। আজি তোরা সমস্ত যা।—

এই মতে সকলে আপন স্থানে গতি করিলে রাজা সে খোজা সেনাপতি সমিভ্যারে করিয়া বাহিরের গড়ে স্থিতি করিলেন সে দিবস এবং রজনীতে ঘোর নিশায় দেখেন এক অগ্নি আকার পড়িল শূন্য

হইতে এবং তিষ্ঠিল সেই বনে। ক্রমে ২ সেই জ্যোতির বৃদ্ধি হইয়া গগণস্পর্শীয় প্রলয় আনলাকার হইল। রাজা অতি সাহসি খোজাকে সাতে করিয়া অশ্ব আরোহণে গতি করিলেন সে স্থানে। কত দূর যাইতে ২ খোজা অজ্ঞানাবৃত হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িলে ঘোড়া পলায়ন করিল। খোজা পশ্চাৎগামি ছিল একারণ রাজা জানিতে পারিলেন না সে সকল বৃত্তান্ত। রাজা অতি নিকটাবর্ত্তি হইলে তাহারও ঘোড়া ত্রাসে পড়িয়া গেল তাহাতেও তিনি না পাছাইয়া অগ্রে বেগে গতিতে জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিলেন জ্যোতি সে বনের উর্দ্ধে শূন্যে স্থাপিত। তাহারি মধ্যে দৃষ্টি করিতে ২ দেখেন সিংহাসনাস্থ এক সুন্দরী আকার তাহারি শরীর হইতে এ সমস্ত জ্যোতি।—

কিঞ্চিত পরে মূর্চ্ছাপন্ন পড়িলেন মৃত্তিকাতে বাহ্য জ্ঞান রহিত কিন্তু শপ্নাকার দেখিতেছেন। আকাশবাণী হইল সেই জ্যোতির মধ্যে হইতে। প্রতাপাদিত্য চাহিয়া দেখ আমি তোর ইষ্ট দেবতা। আমি প্রসন্ন আছি তোকে একারণ আমার স্থানের নিকট বাস দিলাম তোকে। এ ঢিপি খোদন করিয়া যাহা পাইবি ইহার মধ্যে তাহা এই স্থানে স্থাপিত করিস। সে আমারি অনুকল্প জানিবি। তোর প্রজা পুত্র রাখাল মরে নাই। তাহাকে পাইবি তাহার মাতার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া রহিয়াছে।—

তোর ঐশ্বর্য্য হবেক বৃহৎ তোর পিতৃ পিতামহ হইতে। এ ভূমি সমস্ত হবেক তোর করতল। আমি কন্যা ভাবে স্থিতি করিব তোর গৃহে যাবৎ তুই বিদায় না করিবি আমাকে। এবং আমার এই আজ্ঞা মানিস স্ত্রীম্ন কি তাহার দুঃখদাতা কদাচ হইবি না। সেই হবে তোর কালের অন্ত। এই মাত্র শুনিল।—

পরে চৈতন্য পাইয়া দেখিল ঘোরতর অন্ধকার। কমল খোজা

কোথায়। কোথায় বাহন। অশ্ব কোথায়। সে দীপ্তি কিছুই দেখিতে পায় না। কেবল দেখে আপনি ধূলাতে লোটাতেছে কিন্তু শপ্নের ন্যায় যে সমস্ত দেখিল তাহা সমস্তই তাহার মনে পড়িয়াছে।—

উত্থান করিয়া খোজা সেনাপতির অন্বেশন করিতে ২ দেখেন সে পড়িয়া রহিয়াছে একটা খাধের মধ্যে। তাহাতে চেতনা করিয়া বলিল এ কি। এথায় পড়িয়াছ কেন। সে বলিল আমি ইহার কিছুই জানি না মহা তেজ দেখিতেছিলাম। এই ২ মাত্র মনে আছে। আর কিছুই জানি না। রাজা বলিলেন আইসহ আমার সাতে আগে দেখি যাইয়া সিন্দুক কোথায়। এবং তল্লাস করিয়া দেখেন সিন্দুকের তালা এক স্থানে ও খোল আর এক স্থানে মৃত ছোকরা তাহার মধ্যে নাই। মহারাজ খোজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কেমন। তুমি এ ছোকরার বাটী কোথায় জান। খোজা বলিল হাঁ মহারাজা এই যে গড়ের নিকটেই তাহার পিতা মাতার ঘর। দুই জন সেই ক্ষণে তাহারদের বাটীতে যাইয়া দেখিলেন ঘরের দ্বার খোলা কিন্তু মানুষ সমস্ত নিদ্রিত।—

খোজা সোর করিয়া ডাকিলে সেই ক্ষণে সে আসিয়া জানিল মহারাজা তাহার বাটিতে। ত্রস্ত হইয়া কাকুতিতে বলিল মহারাজ আমার কি তকসির। মহারাজ এত রাত্রে এ কাঙ্গালির কুড়িয়ার দ্বারে কেন। রাজা কহিলেন তোর কোন তকসির নহে। তোর ছায়াল কোথায়। সে কাঁদিতে ২ বলিল মহারাজ সে মহারাজার সিন্দুকের মধ্যে হায় ২ করিতেছে। রাজা কহিলেন ভাবনা নাই আলো জ্বাল। তাহা করিলে দেখে সে ছোঁড়া শুইয়া আছে তাহার মাতার সহিত। মহারাজা ছোকরা ও তাহার পিতাকে সাতে করিয়া আনিলেন তাহার গড়ের মধ্যে।—

প্রাতে ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কি সমাচার। তোর এ

গতিকের বৃত্তান্ত কি। ছোকরা বলিল মহারাজ আমি আর কিছুই জানি না আমরা ঐ টিপিতে পূজা করিতেছিলাম তাহাতে আমি অজা নিরূপিত হইয়াছিলাম। আমি স্নান করিয়া আসিয়া শয়ন করিলাম বলিদান হওনের কারণ এই মাত্র আমি জানি পরে বাবা ডাকিলেন চেতনা হইয়া দেখিলাম মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছি।—

রাজা ছোকরা ও তাহার পিতাকে বিস্তর ২ ইনাম বখশিষ দিয়া সে টিপি খোদাইতে ২ দেখিলেন এক প্রস্তরের মুণ্ড প্রকাশ হইল। তাহার গলা পর্য্যন্ত খোদন হইলে অকস্মাত এই শূন্যবাণী হইল। স্থকিত হও এই পর্য্যন্ত। তাহাতে আর মৃত্তিকা না কাটিয়া ওই তাগাদি মুড়া দিলেন এবং তাহারি চারি ভিত লইয়া ঘর গ্রন্থিত করাইয়া দিব্য সেবার বন্ধান করিয়া দিলেন।”—

* * *

অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে আদর্শহীন গদ্যের যুগে ফারসী-আরবী, বাংলা ও সংস্কৃত শব্দকোষের সাহায্যে রাম রাম বসু বাংলায় যে গদ্য সাহিত্য রচনা করেন তা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা ‘অপাঠ্য কদর্য’ বলে অপাংক্তেয় করে রাখতে পিছপা হননি। রাম রাম বসুর প্রথম প্রচেষ্টায় গলদ আছে ঠিক। ব্যাকরণ দোষে তা যেমন দুষ্ট, প্রতি পদে পদেই তেমনি গতিরোধ করে ‘বিজাতীয়’ ফারসী ও আরবী শব্দের কণ্টকজাল। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, রাম রাম বসু যে যুগে জন্মেছিলেন তখনকার লেখাপড়া জানা অধিকাংশ বাঙালীই ছিলেন পাঁচ-ছয় শ’ বছরের মুসলমানী কৃষ্টি ও সভ্যতা এবং আদব-কায়দার জারক-রসে জরিত। মকতব আর পাঠশালায় বাঙালী ছেলে-পিলেদের মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে আরবী-ফারসীরও পাঠ নিতে হোত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল সাধারণতঃ সংস্কৃতের

অনুশীলন। সাধারণ আলাপ-আলোচনা আর কথাবার্তায় আরবী শব্দ সমানে ব্যবহৃত হোত। যেমন দেড়শ' কি দুশ' বছরের ইংরেজী শাসন-এর ফলে বহু ইংরেজী শব্দ আমাদের আজ রপ্ত হয়ে গেছে। কেরীর ডায়ালগস্ বা কথোপকথনের এমনি ফারসী-আরবী শব্দের প্রয়োগ পাশাপাশি দেখা যায়। তা ছাড়া যাঁদের জন্য মূলতঃ বইখানি রচিত তাঁরা নিশ্চয় সংস্কৃত শব্দ বহুল বাংলা ভাষার চাইতে বইয়ের উল্লেখিত ভাষাতেই ছিলেন বিশেষভাবে অভ্যস্ত। এদিক থেকে বিচার করলে, রাম রাম বসু 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' বাংলা আর সংস্কৃত শব্দের পাশাপাশি আরবী-ফারসী শব্দ সাজিয়ে 'মোজাই বিচিত্র করা' এক নতুন কথ্য ভাষাই সৃষ্টি করে গেছেন বলতে হবে।

"অপাঠ্য কদর্য" ভাষার জন্যই হোক বা লেখকের চরিত্রগত ত্রুটি-বিচ্যুতির (মিশনারীরা তাঁকে মিথ্যাবাদী, এমন কি বিধবার ভ্রূণ-হত্যাকারী বলে প্রচার কবতেও পিছপা হয়নি) জন্যই হোক, 'বাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র পরবর্ত্তী সংস্করণের উল্লেখ কোথাও মেলে না। বরং সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার রাম রাম বসুর এই বইখানাকেই পরবর্ত্তীকালে সহজ বাংলায় রূপান্তরিত করে প্রকাশ করেছেন দেখা যায়। এসব বিরুদ্ধ সমালোচকদের মনোভাব আঁচ করেই বোধ হয় রাম রাম তাঁর পরবর্ত্তী বইয়ের ভূমিকায় লিখে গেছেন ঃ "অন্যান্য বিদ্বান লোকের স্থানে আমার এই আকাঙ্খা যে যদি আমার রচিত এই পুস্তকের মধ্যে কদাচিত ক্রমে কশ্চিত দোষ হইয়া থাকে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক দৃষ্টিমাত্রে নিন্দামদে মত্ত না হয়েন এ কারণ কোন লোক দোষ ভিন্ন হইতে পারে না।—

মানব সৃজন বিধি করিল যখন।
সেইকালে ষড়রিপু কৈল নিয়োজন।
অতএব ভুল-ভ্রান্তি আছে সর্ব্বজনে।
মানব লক্ষণ বসু রাম রাম ভনে।
শতাদিত্য বসু বর্ষ পশু শ্রেষ্ঠ মাস।
পরম আনন্দে রাম করিল প্রকাশ।”

লিপিমালা*

'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র বছরখানেক পর প্রকাশিত হয় এ "লিপিমালা।"

লেখক লিপিমালার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে ভূমিকায় লিখেছেন: "...এ হেন্দুস্থান মধ্যস্থল বঙ্গদেশ কার্য্যাক্রমে এ সময় অন্যোন্য দেশীয় ও উপদ্বীপীয় ও পর্ব্বতস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে এবং অনেক অনেকের অবস্থিতিও এইস্থানে এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহার এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত নইলে রাজক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেন না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্য ক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে এ-ভূমীয় যাবদীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুইধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপিমালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল।..."

'লিপিমালা'র প্রায় প্রত্যেক পত্রেই কয়েক ছত্র করে পদ্য দেওয়া আছে। লিপিমালায় সবসুদ্ধ ৪০খানি লিপি পরিবেশিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম ধারায় রাজা অন্য রাজাকে দশখানি, রাজা চাকরকে পাঁচখানি এবং দ্বিতীয় ধারায় পিতা পুত্রকে, গুরু লঘুকে, সমান সমানকে, চাকর মনিবকে, মনিব চাকরকে প্রভৃতি পঁচিশখানা চিত্তাকর্ষক লিপি আছে। লিপিমালার পত্রগুলি সব এক ধাঁচে লেখা নয়। প্রথম ধারায় অধিকাংশ পত্রই ইতিহাস, পুরাণ বা ধর্মসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রচিত

---

* লিপিমালা পুস্তক।—রামরাম বসু রচিত।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—১৮০২।—

যার উদ্দেশ্য বোধ হয় ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিদেশীয়দের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। রাজা অপর রাজাকে শীর্ষক পত্রে তাই দেখতে পাই পরীক্ষিৎ রাজার উপাখ্যান; রাজা প্রজাকে লিখিত পত্রে পাওয়া যায় দক্ষ যজ্ঞের বিবরণ; পুত্র পিতাকে লেখা পত্রে রয়েছে নবদ্বীপের বর্ণনা আর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কথা। কোন কোন পত্রে দেখা যায় শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষক রাবণ রাজার কাহিনী ব্যাখ্যা করছেন। দ্বিতীয় ধারার সামাজিক ও বৈষয়িক পত্রগুলি কিন্তু আরও মধুর ও সুখপাঠ্য। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র মত ফারসী-আরবী শব্দের চড়াই-উৎরাই ভাঙতে হয় না তাতে তেমন। বরং সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের প্রতি লেখকের ঝোঁক দেখা যায়। রচনারীতিও সহজ-সরল অনাড়ম্বর—আপন খেই ধরে চলেছে। হোঁচট খেতে হয় না বড় একটা। কেতাবী বিদ্যার জাহাজ না ভাসিয়ে জন-সাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় আপন বক্তব্য প্রকাশের কায়দা এরই মধ্যে তিনি শিখে নিয়েছেন। এদিক থেকে কেরী আর তাঁর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বা রামমোহনের প্রভাব 'লিপিমালা'য় লক্ষ্য করবার। 'লিপিমালা' থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা গেল নিদর্শন হিসেবে। 'লিপিমালা'র একখানি পারিবারিক পত্র—লঘু পোষ্য গুরুকে:

"...ওখানকার সমাচার অনেক দিবস না পাইয়া একান্ত ভাবিতেছিলাম এখন শ্রীবিজয়গোপাল ঘোষের হাতপাত্র (পত্র?) পাইয়া সমস্ত সমাচার জ্ঞাত হইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। লিখিয়াছে আপনার কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ রায়ের পুত্রের সহিত হইয়াছে তাহার কুলমর্যাদা একশত টাকা দিতে হইবেক সম্বন্ধ ভাল বটে কিন্তু টাকার সাংগত্য বৃহৎ ব্যাপার।..."

লেখক আর এক স্থানে লিখছেন: "শ্রীযুক্ত রামসুন্দর বসুজাকে আশীনাদিতে পাঠাইবেন এক আদ কার্য্য অবশ্য করিয়া দিতে পারিব

আমাকে সাহেবের নিতান্ত অনুগ্রহ আছে ইহাতে যখন যাহা সাহেবককে কহি তাহা প্রামাণ্য করেন…সম্প্রতি এক কার্য্য উপস্থিত আছে বড় মন্দ নহে বসুজাকে যদি শীঘ্র পাঠাইতে পারেন তবে ইহাতেই প্রবর্ত্ত করিয়া দিতে পারি।…” ইত্যাদি। ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ থেকে ‘লিপিমালা’য় রামরাম বসুর ভাষার ক্রমোৎকর্ষতা লক্ষ্য করবার।

সৃষ্টিই স্রষ্টার আপন পরিচয়। তার অন্য পরিচয়-পত্র প্রয়োজন হয় না বড় একটা। রামরাম বসুর বেলায়ও এ কথা থাটে। তাঁর বাল্যজীবন সম্বন্ধে কিছুই বিশেষ পাওয়া যায় না। অনেকের মতে তিনি চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং লেখাপড়া শেখেন ২৪-পরগণা নিমতা গ্রামে। তাঁর হাজার চারিত্রিক দোষ-ত্রুটী থাকলেও তিনি ছিলেন সে যুগের অন্যতম বাঙালী মনীষী যিনি আপনার অদম্য অধ্যবসায় ও প্রতিভার বলে বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম সূত্রপাত করে গেছেন।

সেকালে চিঠিপত্রে সম্ভাষণের বহর লিপিবদ্ধ আছে ‘লিপিমালায়’ঃ ‘‘রাজাধিরাজ হিন্দুস্থান মাঝ। মহা দর্পময় ক্ষমা অতিশয়। শবলান্তঃকরণ রূপ হেম বরণ। শক্তিমন্ত ধীর অতি মহাবীর। আত্মলোক পাল বৈরি মর্দ্দকাল। শ্রীমান গুণধর মহারাজ রাজেশ্বর রাজ। চক্রবর্ত্তির সাহায্য আকাঙ্ক্ষার্থ সাহায্য লিপি লেখা যাইতেছে।…”—“রাজা অন্য রাজাকে।”

* * *

আরও কয়েকটি নমুনা ঃ

“গুণসিন্ধু দীনবন্ধু মহাদর্পময়।
আত্মপাল বৈরিজাল তুষ্টে করে ক্ষয়।

মহারাজ ক্ষিতিমাজ দানে অকাতর।
দয়ামন্ত অতিশান্ত শরল অন্তর।
মহাবীর্য্য যেন স্থর্য্য প্রতাপ তুর্জ্জয়।
পরাক্রম যমসম রাজা মহাশয়।

ধীমন্ত, নম্রতায় শ্রীগুণসিন্ধু মহারায় রায়ের লিপি প্রত্যুত্তরমিদং। এ বসন্ত কাল প্রফুল্লতার সময়ে তৃপ্তিজনক মাহেন্দ্রোদ্যানে বাস করিয়া নানা প্রকার স্থখভোগে কাল যাপন করা যাইতে ছিল। ইতি মধ্যে প্রেমোক্ত লিপি পূর্ব্বাহ্নে প্রকাশ হইয়া আমোদিত করিল। ইত্যাদি..." ["রাজা অন্য রাজাকে।"]

* * *

"স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় যাহার আজ্ঞা হইতে।
প্রণাম করিয়া তার চরণ যুগেতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বর্গ নরক যে জন করিল।
ধর্ম্মশাস্ত্র পৃথিবীর মধ্যে প্রচারিল।
তার উদ্দেশেতে নত হইয়া নম্রকায়।
ত্রাণ বিবরণাকাঙ্ক্ষ প্রকাশ করয়।

হিন্দুস্থলীতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র (?) এই চাবি বর্ণ আদি পরে ইহা হইতে কতেক ২ জাতি উদ্ভব হইয়াছে।" ...["রাজা অন্য রাজাকে।—"]

অথবা

"শুদ্ধ স্থিতি মহামতি প্রভু অনুরক্ত।
দানশীল ধর্ম্মশীল দয়া অভিষিক্ত।..."

["রাজা চাকরকে।"]

* * *

দ্বিতীয় ধারার প্রথম অধ্যায় পর্যায়ের পত্রটি হোল 'পিতাকে এবং পিতৃতুল্য সমস্তকে'। [একটা লিপি উদ্ধৃত করা গেল এ প্রসঙ্গে। সে কালের সামাজিক জীবনধারা ও বন্যা-বিধ্বস্ত দেশের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাবে।]

"পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত পিতা মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু। সেবক শ্রীঅমুক ঘোষ দাসস্য প্রণামা পায়ে পরাৰ্দ্ধং নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। শ্রীমন্মদীশ্বর মহাশয়ের শ্রীচরণাদ্ধ ধ্যানত এ সেবকের ঐহিক পারত্রিক নিস্তার পরং শ্রীচরণ নিকট হইতে আইসনাবধি মহাশয়ের কৃপা পত্রী দুইবার পাইয়া চরিতার্থ হইয়াছি বাটীর সকলেই প্রাণ-গতিক (?) কুশলে আছেন সময়ানুরূপ সেই মঙ্গল এ দেশের বিভ্রাট যথোচিত অদ্য দুই বৎসরাবধি হইতেছে গত বৎসর বন্যা আসিয়া যাবদীয় লোকের ধান্য ইত্যাদি কৃষিব অতিবিঘ্ন জন্মাইয়াছে এমত বন্যা এ দেশে কখন হয় নাই অশিতি বৃদ্ধ লোকেরা কহে তাহারাও এমত বন্যা এ প্রদেশে আইসন সমাচার শ্রবণ করেন নাই অতি ব্রহ্ম ডাঙ্গার উপর সাত আট হাত জল দেশস্থীয় সমস্ত লোক স্বপরিবারে তিন মাস পর্য্যন্ত নৌকারোহে প্রাণ রক্ষা করিয়াছে কতক দৈব ক্রমে দেশান্তরী হইয়া রক্ষা পাইয়াছে গরু বাছুর ও আর ২ সমস্ত পশু ইত্যাদি এক কালীন তাহার পদাপদ্য নাই তাহাতেই এখানকার সকল লোকের কৃষি ইত্যাদি গত বৎসর কিছুই হয় নাই লোক দুঃস্থ অতিশয় রাজস্ব দেওনের সংস্থান নাই উপায় কি তাহাতে দ্বিতীয় উপদ্রব বন্যাতে যাবদীয় লোক নিধর্ন হইয়াছে তাহাতে যাহারা গোঁয়ার এবং বলবান তাহারা দস্যুবৃত্তিতে প্রবর্ত্ত ইহাতে যদিবা কাহার কিছু ছিল তাহারা প্রায় নির্ম্মূল করিল বক্রি লোকেরা দেশে তিষ্টিতে পারে না দেশ ভঙ্গ হইল এমত বুঝা যাইতেছে গত বৎসরের রাজস্বের বিলি হইল না সমাচার প্রতীক্ষায় লিখিয়াছি

সেখানকার আজ্ঞানুযায়ি করা যাইবেক বাটীতে ব্যায় ব্যসনের অনাটন হইয়াছে তাহাতে ঈশ্বর পূজার সময় সান্নিধ্য হইল তাহার আর অধিক কি বস্ত্রাদি এখন কিনিতে পারিলে পশ্চাত দ্বিগুণ মূল্য হইবেক তাহা ভাবিতেছি সংপ্রতি চারি টাকা পাঠাইতেছি লইয়া অত্যাবশ্যক যাহা কিছু তাহা করিতে আজ্ঞা হইবেক আমাকে একবার বাটী পৌঁশিতে আজ্ঞা লিখিয়া ছিলেন দেবতা করেন তবে ত্বরাই পৌঁশিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিব এমত বাঞ্ছা তবে বলা যায় না ভগবদ্দিচ্ছা অমুক প্রভৃতি এখানে সুস্থ আছেন কার্য্য কর্ম্মের কিছু বন্ধান (?) করিয়া দিতে পারি নাই ঠাওরাইতেছি শ্রীযুক্ত কর্ত্তা রাজা মহাশয়ের আগমন হইলে এক প্রকার করিতে পারি বা। বিশেষ পশ্চাত নিবেদন লিখিব। শ্রীযুক্ত কালীসঙ্কর রায়েরদের বাটীতে মহাভারত পুস্তক আরম্ভ হইবেক তাহার সম্রাট (?) বড়ই করিতেছেন তাহাতে আপনারদেরও কিঞ্চিত ব্যায় ব্যসন চাহি শ্রোতা ইত্যাদি দিতে হইবেক এবং আর ২ ব্যায় ব্যসন তবে মহাশয় কর্ত্তা যাহা আবশ্যক হয় করিবেন আমাকে লিখনাধিক আর কিছু অর্থ সাঙ্গত্য যাহা হয় ত্বরাই পাঠাইব কল্যাণপুরের শ্রীযুক্ত ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাশয়ের আজ্ঞা পত্র লইয়া এখানে অদ্য চারি দিবস হইল পৌঁশিয়াছেন তাহার বিষয় মহাশয়ের পত্রে এবং তাহার প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি সময় অতি মন্দ একারণ সম্যক সুসার কদাচিত করিতে পারি কিন্তু ইহার প্রতুল এখান হইতে যদিতু না হয় তবে চন্দ্রাদিত্য কলঙ্ক এবং ঞেহারাও অন্য স্থানে যাচিঞা করিতে পারিবেন না অতএব এ নিমিত্ত কিছুকাল যত্নপূর্ব্বক প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া যে পর্য্যন্ত হয় তাহা করিয়া ভট্টাচার্য্যকে স্যাতি সাংগত্য করিয়া পাঠাইব সে জন্য কোন চিন্তা করিবেন না ইহা শ্রীচরণে নিবেদনমিতি।"—"পিতাকে এবং পিতৃতুল্য সমস্তকে।"

[পৃষ্ঠা—১১৬—১২০]

গুরু লঘুকে লেখা লিপির শিরোনামা ঃ

"পরম শুভাশীর্বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ ভবমঙ্গল কামনয়া অত্রানন্দ পরং।—"

অথবা—"পরম শুভাশীর্ব্বাদবিজ্ঞাপনঞ্চ। বিশেষঃ তবকল্যাণারোগ্য কামনয়া অত্রানন্দ পরং।"···

লঘু গুরুকে ঃ

"প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। মহাশয়ের আশীর্ব্বাদতোত্রশিবঞ্চ পরং।—"

অথবা—"নতি বিজ্ঞাপনাঞ্চ বিশেষঃ। ভবাশী সর্ব্বাদতোত্রানন্দ পরং।—"

লঘু যদি গুরু প্রতিপালক হয়ে থাকেন তবে লেখা হোত ঃ

"প্রতিপাল্যস্য পরম শুভাশীর্নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। মহাশয়ের স্থির রাজলক্ষ্মী সতত কামনয়াত্র নির্ব্ব্তি পরং।—"

পিতা পুত্রকে এবং পুত্রতুল্য সমস্তকে ঃ

"প্রাণ প্রতিম শ্রীযুক্ত অমুক পরম কল্যাণবরেষু—"

* * *

সমান বয়োধিক সমানকে ঃ

"নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ আপনার মঙ্গলাদি সতত কামনীয় তাহাতে অত্রানন্দ পরং।—"

মনিব চাকরকে ঃ

"বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ তোমার কুশল বাঞ্ছনীয় তাহাতে অত্র সন্তোষ পরং।—"

আর চাকর যদি সামান্য হয় তবে লিপি উদ্দেশ করতে হবে—

"শ্রীঅমুক ২ সুচরিতেষু আগে।—"

যেমন, মনিব সামান্য চাকরকে লেখা একখানি লিপি ঃ—

"শ্রীরাধানাথ দত্ত ও শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রীকালিচরণ দাস প্রতি

আগে তোমারদিগের নামে অগর পাড়া পরগণার পরমানন্দপুর গ্রামের শ্রীহারানন্দ বিশ্বাস আমার এখানে নালিস করিয়াছে তোমারা ও তোমারদিগের গ্রামের প্রজারদিগকে সাত লইয়া সহসা মারি পীট করিয়াছ ইহা কারণ জানিতে পারিলাম না বিশ্বাস এখানে আছে তোমারা পত্র পাঠ এখানে পৌশিয়া এ বিষয়ে বিদিত হইয়া বিচার করা যাইবেক আর তোমারদিগের এতমাসের পরবি দিগর যাহা পাওনা তাহা আনিবা পাঁঠা ছাগল তিন শত তোমারদিগের এতমাসে এবার বিলি করিতে হইবেক এবং মহীশ পঞ্চাশটার জন্য গোপেরদিগের সহিত কথা বার্ত্তা স্থির করিয়া কিছু টাকা তাহারদিগকে দিয়া মহীষ বায়না করিবা ছুই শত মোন (?) দধি এক শত মোন দুগ্ধ ঘৃত ষাটি মোন পাকা কলা এক শত কাঁন্দি বিলি করিবা যে সকল লোকেরদিগকে ফরমাইস করিবা তাহারদিগকে কিছু কড়ি এখন দিবা বক্রি হিসাব করিয়া পশ্চাত দেওয়া যাইবেক নারিকেল তিন হাজার আর গুবাক ছুই শত কাঁন্দি দিতে হইবেক তাহার চেষ্টায় থাকিবা গ্রামের প্রজারদিগকে নিমন্ত্রণ করিবা ঈশ্বরী পূজার সময় সকলে এখানে আইসে এ সকল দ্রবের চেষ্টায় থাকিবা দিন সংক্ষেপ হইল পশ্চাদ্ব্যামোহ না হয় তাহা করিবা সৈদন্যপুরের শ্রীরামকৃষ্ণ দালাল প্রভৃতি দেড় শত থান বস্ত্রের ফরমাইস লইয়া গিয়াছে এবং তিনবারে তাঁহার চারি শত টাকাও লইয়াছে বস্ত্রের কি পর্য্যন্ত করিয়াছে জানিতে পারিলাম না তোমারদিগের এখান হইতে সে গ্রাম নিকট অতএব তোমরা একজন সে স্থানে যাইয়া বস্ত্র কি পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে জানিয়া আসিবা আর বাকী প্রস্তুত হইতে কত দিবস হইবেক তাহা নিশ্চয় জানিয়া আসিবা ঈশ্বরী পূজার মধ্যে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দেয় তাহারদিগের যাহা পাওনা তাহা লইয়া যায় আর তাহারদিগকে যথেষ্ট তাকিদ করিবা আর

শুনিলাম তোমারদিগের গ্রামে কালী কীর্ত্তনীয়া এক সম্প্রতা (?) আসিয়াছে তাহারা কি প্রকার গান করে জানিতে পারি নাই যদি ভাল হয় এমত বুঝহ তবে তাহারদিগের সম্প্রতা সমেত পাঠাইবা এখানে কীর্ত্তন হইবেক এবং রাম যাত্রাও জানে যদি এমত লোক তোমারদিগের ওখানে থাকে তবে তাহারদিগকে কহিবা ঈশ্বরী পূজার তিন দিবস এ বাটীতে আসিয়া যাত্রা ও নাম সংকীর্ত্তন করে যদি ও স্থানে না থাকে তবে স্থানান্তর হইতে আনইবা তোমারদিগের এতমাসের রাজস্ব ভাদ্র পর্য্যন্তের বক্রি নয় হাজার টাকা তাহার মধ্যে চারি হাজার টাকা পাঠাইয়াছ এ কি মত বিবেচনা বুঝিতে পারিলাম না তিন মাহা (?) তৌজি অদ্যাপি হস্তাগত করিতে পারিলা না কি বুদ্ধিতে জানি নিশ্চিন্ত আছহ এখন পর্য্যন্ত তোমারদিগের ভাদ্রেব নিমিত্ত লিখিতেছি যদি ভাদ্র পর্য্যন্তের রাজস্ব সহিত শীঘ্র পৌশিহ পুনরায় তাগিদ না করিতে হয় এক পত্রে হাজার ২ তাকিদ জানিবা ঈশ্বরী পূজার পরে তোমারদিগের গ্রামের বন্দোবস্ত হইবেক শ্রীরামপ্রসাদ দাসের প্রমুখাত শুনিলাম তোমারদিগের ওখানে চিনির মহাজনেবা আসিয়া চিনি বিক্রী করিতেছে সেই মহাজনেরে জনেককে এখানে পাঠাইবা কিংবা তোমরা তাহারদিগের নিকট যাইয়া ভাল ফুল চিনির ফরমাইস দিবা চিনি প্রস্তুত হইলে এখানে সমাচার লিখিবা টাকা লইয়া লোক যাইবেক পত্রানুসারে এ সকল দ্রব্য বিলি করিয়া পত্র পাঠ তোমরা এখানে পৌশিবা বিলম্ব না হয় ইতি।—” [২৩৮ পৃষ্ঠা]

'লিপিমালার' শেষ লিপি। এটিও মনিব সামান্য চাকরকে লেখা :

শ্রীঅমুক ২ সুচরিতেষু আগে।—

তোমার ২৩ কার্ত্তিকের পত্রেতে জানা হইল পরগণে মধুদীয়ার কএক গ্রামের প্রজারা নষ্টতা করিয়া রাজস্ব না দিয়া তোমার নামে

জিলার আদালতে নালিস করিয়াছে সে জন্য চিন্তার বিষয় কি সে নিমিত্ত জিলার উকিলকে লেখা গেল এবং এখানেও যেমত ২ সুপথ আছে তাহার চেষ্টাও হইতেছে তুমি ওখানে বিলক্ষণ শক্তিতে কার্য্য প্রয়োজন করিবা কোন বিষয় ভয় করিয়া কার্য্য করিবা না প্রজালোকের নষ্টতায় কি হইতে পারে যে সকল প্রজা দুষ্টতা করিয়া করিয়া জিলায় নালিস করিতে গিয়াছে তাহারদিগের নাম এক ফর্দ্দ করিয়া শীঘ্র এখানে পাঠাইবা আর তাহারদিগের বৃত্তি বিভোগ যাহা থাকে তাহা নিশ্চয় জানিয়া ফর্দ্দ করিয়া এখানে পাঠাইবা এবং তুমি আইন মত সাত দিবস মেয়াদ এস্তহার টানাইয়া দিবা যদি মেয়াদের মধ্যে তাহারা সাক্ষাত হইয়া আপন ২ রাজস্ব বন্দোবস্ত করে ভাল নতুবা এস্তারের মেয়াদ গত হইলে পরে কাজিকে সমাচার দিয়া বক্রির উপযুক্ত তাহারদের বৃত্তি বেশাত বিক্রী করিয়া লইয়া এখানে সমাচার লিখিবা যে ২ প্রজার বক্রি উপযুক্ত বৃত্তি বেশাত হয় তবে তাহার সারোদ্ধার জানিয়া এখানে লিখিবা কাছারির সরঞ্জামির ফর্দ্দ পাঠাইয়া ছিলা জ্ঞাত হওয়া গেল ইহার যে হয় আগত মাসের পরে ফর্দ্দে নিশ্চয় করিয়া পাঠান যাইবেক সাদা জালানি গত বৎসরের মত এখন করিবা পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া যে বিহিত করা যাবেক পরগণা হইতে যে রাজস্ব জিলার উকিল পর্য্যন্ত চালান করিবা তাহা সহি সিক্কা টাকা সমস্ত দিবা গড়া টাকা যাহা চালান করিবা তাহার যে কমি হইবেক তাহা তোমার নামে খরচ লিখিতে উকিলকে লিখিয়াছি ইহা বুঝিয়া কার্য্য করিবা পশ্চাৎ ইহার কোন আপত্তি শুনা যাবেক না আর পত্তন কি প্রকার হইতেছে তাহার বিশেষ লিখিবা আর যখনকার যে বিষয় উপস্থিত হয় এ পর্য্যন্ত বিদিত না করিয়া কিছু করিবা না ইতি।—”

বেদান্ত গ্রন্থ

রাজা রামমোহনের সহধর্মিণী উমা দেবী একদা নাকি রাজাকে শুধিয়েছিলেন ঃ

'ওগো, বলো তো জগতে কোন্ ধর্মটি সত্য ?'

রাজা নাকি তখন হেসে জবাব দিয়েছিলেন ঃ 'গরু তো নানা বর্ণের। কোনটার রঙ কালো, কোনটার সাদা। কিন্তু দুধ তাদের একই বর্ণের। তেমনি সাম্প্রদায়িক ধর্ম নানা প্রকার, কিন্তু তাদের মধ্যে যা সত্য, তা একই !'

রামমোহন ছিলেন বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদী ; অসাম্প্রদায়িক, উদার ও সার্বভৌম উপাসনার ভিত্তিতে তিনি এক অদ্বৈত ধর্মমতের ব্যবস্থাপনা করে যান। মহানির্বাণ তন্ত্রকে মেনে নিয়েও তিনি বৈষ্ণবরাজ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে চৈতন্যদেব বলে সম্মান করতেন। তাঁর মনের বৃত্তিসমূহের মধ্যে উদার সামঞ্জস্য ছিল বলেই তিনি যীশু, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ও মহম্মদ—এ তিন পরম পুরুষকে সমান ভক্তি করতে পেরেছিলেন। রামমোহন রায়ের শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি, তর্কশক্তি ও শাস্ত্র-জ্ঞানের প্রগাঢ় পরিচয় মেলে। রামমোহনকে কেবল ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক বলে ধরে নিলে অবিচার করা হবে। অদ্ভুতকর্মা এই মনীষীটি সত্যিই ছিলেন ভারতবর্ষের আধুনিকতার অগ্রদূত। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম—সবদিক থেকেই তিনি ছিলেন নবযুগের উদ্বোধক। ভারত-পথিক !

কথায় বলে, সকাল দেখেই দিনটা কেমন যাবে বলা যায়। রাম-মোহনের বেলায়ও কথাটি খাটে। রামমোহন তখন ষোল কি সতেরো বছরের এক ছোকরা। হিন্দু-সমাজের তখনকার কুসংস্কার ও

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ফারসী ভাষায় তিনি একখানা চটি বই লিখেছিলেন। বইখানা একদিন রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ের হাতে গিয়ে পড়ে। গোঁড়া ব্রাহ্মণ রামকান্ত তো ছেলের পাকামী ও জ্যাঠামী দেখে চটে আগুন। পিতা পুত্রে এ নিয়ে ভয়ানক তর্ক লেগে গেল। ছেলেকে বাপের মুখের ওপর যুক্তিপূর্ণ পাল্টা জবাব দিতে দেখে বাপের আত্মসম্মানে বুঝি ঘা ও লাগলো। মনোমালিন্যের সৃষ্টি হোল পিতা-পুত্রের। পিতৃগৃহ ছাড়তে বাধ্য হলেন রামমোহন।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভারতের নানান জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়ালেন। তিব্বতে ছুটলেন বৌদ্ধধর্মে পাকা-পোক্ত হয়ে উঠতে। এভাবে বহু বৎসর বাইরে বাইরে কাটিয়ে আর নানান শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে রামমোহন কলকাতায় ফিরে এলেন। আর লেগে গেলেন ধর্ম সংস্কারের কাজে। বেদ-উপনিষদের চর্চা তখন বাংলাদেশে একরূপ লোপ পেতে বসেছিল। রামমোহনই নতুন করে বেদান্ত আলোচনার পত্তন করলেন। বাংলা ভাষায় তিনিই হলেন বেদান্তের প্রথম ভাষ্যকার। নিজের ধর্ম-মতের সমর্থনে আর প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই তিনি মেতেছিলেন এ বেদান্ত আলোচনায়।

রামমোহনের বেদান্ত গ্রন্থ ১৮১৫ সালে হয় প্রকাশিত। তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৭+১৬৬। এ 'বেদান্ত গ্রন্থই' বেদব্যাসের সংস্কৃত বেদান্তসূত্রের বাংলা অনুবাদ। ভূমিকা ও অনুষ্ঠানপর্ব ছাড়া 'বেদান্ত গ্রন্থে' রয়েছে চারটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু: (১) ব্রহ্মবোধক শ্রুতির সমন্বয়; (২) উপাস্য ব্রহ্মবাচক শ্রুতির সমন্বয়; (৩) জ্ঞেয় ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতির সমন্বয়; (৪) অব্যক্তাদি পদ সকলের সমন্বয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে: (১) সাংখ্য ইত্যাদির সঙ্গে বেদান্ত মতের বিরোধ পরিহার; (২) সৃষ্টি ও ব্রহ্মবিষয়ক নানা মতের বিচার, (৩) মহাভূত ও জীববিষয়ক শ্রুতি-বিরোধ ভঞ্জন;

(৪) ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও জীবের সম্বন্ধ বিচার। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে: (১) জীবের জন্মাদি প্রকরণ, (২) জীবের চেতন, স্বপ্ন ও অচেতন অবস্থা, (৩) নানা প্রকার উপাসনা, (৪) জ্ঞানসাধনের শ্রেষ্ঠত্ব। আর চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হোল: (১) ব্রহ্মোপাসনার প্রকরণ, (২) মৃত্যু, (৩) মরণের পর জীবের গতি এবং (৪) মুক্তি।

বেদান্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে ৺চন্দ্রশেখর বসু বলেন: "তিনি (রামমোহন) তাঁহার (বেদান্তের) যে প্রকার বাঙ্গালা অনুবাদ দিয়াছেন, তাহা যদিও অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি বেদান্তের সমুদয় সার তাৎপর্য্যই তদ্দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী না হইলে কিছুতেই ঐরূপ ভাষ্য করা যায় না। তিনি যে সহজ প্রণালীতে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেমন শাস্ত্রানুমোদিত, তেমনি হৃদয়গ্রাহী। বিচারতঃ তাঁহাকে একজন হিন্দু-শাস্ত্রীয় দর্শনকার বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।"

বেদান্ত দর্শনকে মূলভিত্তি করেই রামমোহন হিন্দু পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্র বিচারে মেতেছিলেন। বেদান্ত শাস্ত্রের মর্মার্থের সঙ্গে সাধারণের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই বাংলা 'বেদান্ত গ্রন্থ' রচনা। খৃষ্টান পাদ্রীদের জন্য তিনি এর একখানি ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ করেন। আর তার হিন্দুস্থানী অনুবাদ করে বিনামূল্যে সেই ভাষাভাষী জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন বলেও শোনা যায়। 'বেদান্ত গ্রন্থ'ই রামমোহন রায়ের প্রথম প্রকাশিত বাংলা বই। কঠিন ও দুর্বোধ্য 'বেদান্ত গ্রন্থ' জনসাধারণের বুঝতে অসুবিধে হবে বলে রামমোহন 'বেদান্ত গ্রন্থের' সংক্ষিপ্ত এক সংস্করণ বার করেছিলেন 'বেদান্ত সার' নাম দিয়ে।

প্রয়োজনবোধই ছিল রামমোহনের সাহিত্য রচনার গোড়ার কথা। ১৯ শতকের প্রথম পাদে বাংলা গদ্য সাহিত্য সৃষ্টির মূলেও ছিল এই

প্রয়োজনবোধ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করে বিদেশ আগত সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচয় করে দেবার জন্য একদিকে যেমন চলছিল বাংলা গদ্যের অনুশীলন, রামমোহনও তেমনি লোক-শিক্ষার জন্য—প্রতিপক্ষের সঙ্গে শাস্ত্রবিচারের হাতিয়ার হিসেবে বাংলা সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। রামমোহনের আমলে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের যে খুব একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না, তার প্রমাণ দেখতে পাই রামমোহন তাঁর 'বেদান্ত গ্রন্থে' বাংলা গদ্য কিভাবে পড়তে হয় তার নিয়মকানুন শেখাচ্ছেন দেখে। এখনকার দিনের মত বাংলায় কমা বা সেমিকোলন প্রভৃতি বিরাম-বিরতি চিহ্নের বালাই তখন বড় একটা ছিল না। রামমোহনই প্রথম তাদের প্রচলন চালু করেন। তিনিই প্রথম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের লেখা সংস্কৃত ঘেঁষা পণ্ডিতী বাংলা আর পাদ্রীদের লেখা চলতি বাংলার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন। তাঁর ভাষা ছিল সহজ-সরল ও ছিম-ছাম—বক্তব্যের উপযোগী। কবি ঈশ্বর গুপ্ত ঠিকই লিখেছেন: "দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাব সকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত। এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পরিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।"...

রামমোহন বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক ছিলেন কি ছিলেন না, সেটাই আজ বড় কথা নয়। এটা ভুললে চলবে না যে, অদ্ভুতকর্মা এই মনীষীটিই 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাঠ্য-পুস্তকের বাইরে বাঙ্গলা গদ্যের ব্যবহার করেন সর্বপ্রথম'। [—ডাঃ সুকুমার সেন।]

রামমোহনের প্রথম প্রকাশিত বই 'বেদান্ত গ্রন্থে'র ভাষার কিছুটা নমুনা দেওয়া গেল:

"কেহো কেহো এ শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইবার উৎসাহের ভঙ্গ নিমিত্ত কহেন যে বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে এবং শূদ্রের এ ভাষা শুনিলে পাতক হয় তাহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে যখন তাঁহারা শ্রুতি স্মৃতি জৈমিনিসূত্র গীতা পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান তখন ভাষাতে তাহার বিবরণ করিয়া থাকেন কি না আর ছাত্রেরা সেই বিবরণকে শুনেন কি না আর মহাভারত যাহাকে পঞ্চম বেদ আর সাক্ষাৎ বেদার্থ কহা যায় তাহার শ্লোক সকল শূদ্রের নিকট পাঠ করেন কি না এবং তাহার অর্থ শূদ্রকে বুঝান কি না শূদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ ও ইতিহাস পরস্পর আলাপেতে কহিয়া থাকেন কি না আর শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্র নিকটে ঐ সকল উচ্চারণ করেন কি না যদি এইরূপ সর্ব্বদা করিয়া থাকেন তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে দোষের উল্লেখ কিরূপে করিতে পারেন।..."
["অনুষ্ঠান"।]

অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

চিত্তশুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার হয় এই হেতু তখন ব্রহ্মবিচারের ইচ্ছা জন্মে ॥১॥ ব্রহ্ম লক্ষ্য এবং বুদ্ধির গ্রাহ্য না হয়েন তবে কিরূপে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার হইতে পারে এই সন্দেহ পরসূত্রে দূর করিতেছেন ॥

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ২ ॥

এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি নাশ যাহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম। অর্থাৎ বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মকে নিশ্চয় করি। যেহেতু কার্য্য থাকিলে কারণ থাকে। কার্য্য না থাকিলে কারণ থাকে না। ব্রহ্মের এই তটস্থ লক্ষণ হয় তাহার কারণ এই জগতের দ্বারা ব্রহ্মকে নির্ণয় ইহাতে করেন। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন যে সত্য সর্ব্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ যাহার সত্যতা দ্বারা সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে।

যেমন মিথ্যা সর্প সত্যরজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্পের ন্যায় দেখায় ॥২॥ শ্রুতি এবং স্মৃতির প্রমাণের দ্বারা বেদের নিত্যতা দেখি অতএব ব্রহ্ম-বেদের কারণ না হয়েন। এ সন্দেহ পরসূত্রে দূর করিতেছেন ॥...”

[বেদান্ত গ্রন্থ]

রামমোহনই বাংলাদেশে বেদ-বেদান্তের চর্চার সূচনা করেন। যে বেদ শূদ্রে উচ্চারণ করলে জিভ কেটে দেবারই ব্যবস্থা ছিল, রামমোহনই তাকে দিলেন আপামর জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে। বাংলার জাতীয় জীবনে তাঁর অবদান নেহাৎ কম নয়। ফলে সনাতন হিন্দুসমাজের যে টনক নড়ে উঠবে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? নির্যাতন ও নিপীড়ন তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল বিস্তর। শোনা যায়, তাঁর জীবননাশেরও একাধিকবার চেষ্টা হয়েছিল। তাতে কিন্তু তিনি দমেন নি। ইংরেজী ‘বেদান্ত গ্রন্থের’ ভূমিকায় তিনি তাই লিখে গেছেন :

“ব্রাহ্মণবংশে আমি জন্মগ্রহণ করে বিবেক ও সরলতার আদেশে যে পথ অবলম্বন করেছি, তাতে আমার প্রবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আত্মীয়-গণেরও তিরস্কার ও নিন্দার পাত্র হ’তে হয়েছে। কিন্তু ইহা যতই অধিক হউক না কেন, আমি এ বিশ্বাসে ধীরভাবে সব সহ্য করতে পারি যে, একদিন আসবে, যখন আমার এই সামান্য চেষ্টা লোকে ন্যায় দৃষ্টিতে দেখবেন, হয়ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করবেন।”

রামমোহনের এ ভবিষ্যদ্বাণী আজ ব্যর্থ হয়নি।

গৌড়ীয় ব্যাকরণ

রামমোহনের বেশীরভাগ রচনাই শাস্ত্র-বিচার বা সমাজ-সংস্কার বিষয়ে। যদিও তিনি সংবাদ-সাহিত্যিকরূপেও ছিলেন সকলের অগ্রণী। প্রতিপক্ষকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে তাঁর লেখনী কোনদিন ক্ষান্ত হয়নি। (যেমনঃ 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার', 'পথ্য-প্রদান', 'পাষণ্ড-পীড়নের' জবাবে, 'কবিতাকারের সহিত বিচার' ইত্যাদি।) এমনি ধরণের অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ছাড়া বাংলা ভাষায় রামমোহনের আর একখানি উল্লেখযোগ্য বই হোলঃ 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। [হিন্দু-কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের আদেশে পাঠশালার ব্যবহারার্থ রাজর্ষি রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের সংক্ষেপ সংগৃহীত। শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তীর মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১২৪৭ (পরবর্তী সং।) পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৯।]

বিদেশী ইউরোপীয়ানদের বাংলা ভাষা শিক্ষার সাহায্যার্থে রামমোহন ১৮২৬ সালে একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন ইংরেজীতে। গৌড়ীয় ভাষায় ভালো কোন ব্যাকরণ না থাকায় পরে তিনি ইংরেজী ব্যাকরণটির অনুকরণে এ গৌড়ীয় ব্যাকরণটি লেখেন। এ বইখানি তিনি বিলাত যাবার পূর্বে কলকাতা ইস্কুল বুক সোসাইটির হাতে দিয়ে যান ছাপার জন্য। ১৮৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় ব্যাকরণখানি। ইংরেজী ব্যাকরণের রীতিতেই লেখা রামমোহনের এই ব্যাকরণটি। এ ব্যাকরণেই প্রথম কমা, সেমিকোলন, প্রশ্নবোধক এমন কি 'কোটেশন' চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়। রামমোহনের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'ই বাঙ্গালীর লেখা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বাংলার প্রথম ব্যাকরণ বলা হয়। ডাঃ সুকুমার সেনের মতে, 'বাঙ্গালীর রচিত এই প্রথম বাংলা ব্যাকরণ-খানির উপযোগিতা এখনও একেবারে লোপ পায়নি। 'গৌড়ীয়

ব্যাকরণে' রামমোহন যে সকল পরিভাষা ব্যবহার করেছিলেন সেগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।'

'গৌড়ীয় ব্যাকরণের' আলোচ্য বিষয় সূচীপত্রে যা দেওয়া আছে তা হোল: বর্ণবিধান, বর্ণোচ্চারণ স্থান, পদবিবরণ, বিশেষ্য পদের বিভাগ, নামের রূপবিবরণ, নামের বচন ও রূপ, কর্তৃপদের রূপ, কর্মপদের রূপ, অধিকার পদের রূপ, লিঙ্গ বিষয়, নিয়মাতিক্রান্ত লিঙ্গ, তদ্ধিত, সমাস ও বাক্য রচনা।

বর্ণবিধানে ব্যাকরণের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করে রামমোহন লিখছেন:

"ব্যাকরণ তাহাকে বলা যায় যাহার জ্ঞান দ্বারা উচ্চারণ শুদ্ধি, লিপি শুদ্ধি, অর্থাৎ যথা যোগ্যস্থানে পদ-বিন্যাসের ক্ষমতা হয়।

ব্যাকরণ দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে এক বর্ণ দ্বিতীয় পদ।

পদের অবয়বকে বর্ণ কহা যায়, সে বর্ণ দুই-প্রকার, স্বর ও হল যথা, অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ (ডবল ঌ) এ ঐ ও ঔ অং অঃ এই ষোড়শবর্ণ স্বর হয়।..."

'দশম পরিচ্ছেদ'এ—লেখক বাক্যরচনা সম্পর্কে লিখছেন: "এক সম্পূর্ণ বাক্য অন্তত দুই শব্দের অন্বয় ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, অর্থাৎ এক নাম ও এক ক্রিয়া, উহ্য হউক কিম্বা উক্ত হউক, মিলিত হইয়া হয়, যেমন রাম যান। যদি ক্রিয়া সকর্ম্মক হয় তবে উহ্য কিম্বা উক্ত কর্ম্মের অপেক্ষা করে, যেমন রাম তাহাকে মারিলেন, ঐ নামের সহিত গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের সঙ্কলন হইতে পারে কিন্তু বাক্য দুই শব্দের ন্যূনে কদাপি হয় না। ভূরি শব্দে সঙ্কলিত বাক্যের উদাহরণ, দুর্ব্বৃত্ত ভৃত্যকে আপন ঘরে কিম্বা পরের ঘরে অন্যায়পূর্ব্বক অতিশয় নিগ্রহ করে এবং তাহাকে পশুর ন্যায় বরঞ্চ পশু হইতে অধম জ্ঞান করে।..."

গৌড়ীয় ব্যাকরণের ভূমিকা ও সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

"সকল প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যের এক বিশেষ স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হয়, যে অনেকে পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া একত্র বাস করেন। পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া এক নগরে অথবা এক গৃহে বাস করিতে হইলে সুতরাং পরস্পারের অভিপ্রায়কে জানিবার এবং জানাইবার আবশ্যক হয়। মানুষের অভিপ্রায় নানাবিধ হইয়াছে এবং কণ্ঠ তালু ওষ্ঠ ইত্যাদির অভিঘাতে নানাপ্রকার শব্দ জন্মিতে পারে ; এ নিমিত্ত এক এক অভিপ্রেত বস্তুর বোধ জন্মাইবার নিমিত্তে এক এক বিশেষ শব্দকে দেশভেদে নিরূপিত করিয়াছেন। যেমন ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ সকলের বোধের নিমিত্তে আম্র, জাম, কাঁটাল ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিকে গৌড়দেশে নিরূপণ করেন, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সকলের উদ্বোধের নিমিত্তে রামচন্দ্র, রামহরি, রামকমল ইত্যাদি নাম স্থির করিতেছেন, সেই সেই ধ্বনিকে শব্দ ও পদ কহেন এবং সেই সেই ধ্বনি হইতে যাহা বোধগম্য হয় তাহাকে অর্থ ও পদার্থ কহিয়া থাকেন।

দূরস্থিত ব্যক্তির নিকট শব্দ যাইতে পারে না, এ কারণ লিপিতে অক্ষরের সৃষ্টি করিলেন, যাহার সঙ্কেত জ্ঞান হইলে কি নিকটস্থ কি দূরস্থ ব্যক্তিরা অক্ষর দর্শনদ্বারা বিশেষ বিশেষ শব্দের উপলব্ধি করিতে পারেন, ও শব্দ জ্ঞানদ্বারা সেই সেই শব্দের বিশেষ বিশেষ অর্থ জ্ঞান হয়।

ঐ শব্দ ও ঐ অক্ষর নানাদেশে সঙ্কেতের প্রভেদে নানাপ্রকার হয়, সুতরাং তাহাকে সেই দেশীয় ভাষা ও সেই সেই দেশীয় অক্ষর কহা যায়। সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় শব্দের বর্ণগত নিয়ম ও বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি যে গ্রন্থের অভিধেয় হয়, তাহাকে সেই সেই দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ কহা যায়।···

ছন্দঃ।

ছন্দঃ শব্দে তাহাকে কহি যাহার পাঠের দ্বারা পদ সকলের ধ্বনির পরস্পর লঘু গুরু ভেদে আনুপূর্ব্বিক বিন্যাসের জ্ঞান হয়।

গৌড়ীয় ভাষাতে সংস্কৃতানুসারে আ, ঈ, ঊ, ঋ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ— এই কয় স্বর গুরু হয়; ইহার স্বতন্ত্র উচ্চারণ কিম্বা হলের সহিত উচ্চারণ উভয় প্রকারে গুরু হইয়া থাকে, যেমন আ, কা, ঈ, কী ইত্যাদি। ইহাদের উচ্চারণগত কিছু বৈলক্ষণ্য নাই, যখন কোন হলের পূর্ব্বে কিম্বা অনুস্বার কিম্বা বিসর্গের পূর্ব্বে আইসে, যেমন আক্ ঈক্ আং আঃ ইত্যাদি।...

এক বাক্যে শব্দ সকল আনুপূর্ব্বিক যদি এরূপ থাকে যে পবস্পর ধ্বনির লাঘব গৌরব পরিমাণে শ্রবণে সুশ্রাব্য হয় তবে তাহাকে কবিতা কহি যাহা দ্বারা চিত্ত বিকার হইবার সম্ভাবনা আছে বিশেষত যদি সেই কবিতা গান সম্বলিত হয়।

গৌড় দেশে, না গীতের শৃঙ্খলা আছে, না গৌড় দেশীয় ভাষাতে কবিতার পারিপাট্য উত্তমরূপে আছে, সুতরাং ইহার ছন্দঃ প্রকরণ জানিবার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই; এ নিমিত্ত কেবল দুই তিন ছন্দ যাহা কবিতাতে ভূরি ব্যবহার্য্য হয় তাহাই এ স্থলে লিখিলাম, অতএব ছন্দোবিষয়ে পৃথক্ পরিচ্ছেদ করিলাম না।

প্রথমতঃ পয়ার, তাহার দুই চরণ, তাহাতে উভয়ের শেষ অক্ষরে এক জাতীয় হল ও স্বর হয়, প্রত্যেক চরণে চতুর্দ্দশ অক্ষর হয়, তাহাতে সাত হইতে ন্যূন নহে চতুর্দ্দশের অধিক নহে ধ্বন্যাঘাত হইয়া থাকে, যথা

*১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
রাজা বলে গোঁসাই বাসায় আজি চল।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
করা যাবে উপযুক্ত .কালি যেবা বল।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ডাক্ হাক্ ঢাক্ ঢোল মাল সাট্ সার।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
বাক্যেতে পর্ব্বত কিন্তু কার্য্যে তিলাকার।

দ্বিতীয় ত্রিপদী, যাহার দুই চরণ হয় এবং পয়ারের ন্যায় উভয়ের শেষে এক জাতীয় হল ও স্বর হয়; প্রত্যেক চরণ তিন বিভাগ, তাহার প্রথম দুয়ের আট অক্ষর এবং অন্তে এক জাতীয় অক্ষর হইয়া থাকে আর তৃতীয় ভাগ দশ ২ অক্ষর হয়।

নদী যেন গড়খানা দ্বারে হব্সির থানা
দূরে হতে+ দেখে হয় শঙ্কা।
দয়া সর্ব্বমঙ্গলার লঙ্ঘিবারে শক্তি কার
সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা।

এ ভাষায় আর এক প্রকার ত্রিপদী ব্যবহার্য্য হয় যাহা পূর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পাক্ষর হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রথম দুই অংশে আট অক্ষরের স্থানে

---

* এই সকল অঙ্কের দ্বারা ধ্বন্যাঘাতের প্রভেদ জ্ঞান হয় যেমন
১ ২ ৩ ৪
রা, জা, ব, লে, ইত্যাদি।

+ কথোপকথনে ও কবিতাতে "হইতে" ইহার ই কার লোপ হইয়া "হতে" এ প্রকার রূপ হয়। তদ্রূপ "যেমন" হইতে "যেন" ইত্যাদি শব্দের বিশেষ পাঠকেরা অন্য ২ কবিতা গ্রন্থ দৃষ্টিতে জানিবেন।

ছয় ২ অক্ষর হয় আর তৃতীয় অংশে দশের স্থানে আট ২ অক্ষর হইয়া থাকে, যেমন

আমাকে কাশীতে, না দিল রহিতে,
ভূতনাথ কাশীবাসী।
সেই অভিমানে, আমি এই স্থানে,
করিব দ্বিতীয় কাশী।

অন্য আর এক ছন্দঃ যাহাকে তোটক কহি, গৌড়ীয় ভাষাতে ইহার দুই চরণ হইয়া থাকে; প্রত্যেকে বার ২ অক্ষর হয়, তাহার তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম, দ্বাদশ গুরু হইয়া থাকে, অন্য সমুদায় লঘু অক্ষর হয়। যেমন

দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে।
কবি রাজ কহে যত গৌড় জনে॥

এই ছন্দে পূর্ব্ব ছন্দের বৈপরীত্য হেতুক বিশেষ অবধান হয় ইতি॥ [গৌড়ীয় ব্যাকরণ—সমাপ্তি।]”

কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক

আজ থেকে পুরো একশ' বছর আগেকার কথা। তখনকার নামকরা সংবাদপত্র 'সম্বাদ ভাস্করে' এ-মর্মে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়:

বিজ্ঞাপন।

৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক। এই বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা সর্ব্বসাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে, যিনি সুললিত গৌড়ীয় ভাষায় ছয়মাস মধ্যে "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নামক একখানি মনোহর নাটক রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে সঙ্কল্পিত ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।

রঙ্গপুর পং কুণ্ডী শ্রীকালিচন্দ্র রায়-চৌধুরী
কুণ্ডী পং জমিদার।

সংবাদপত্রের এ বিজ্ঞাপন দেখেই তখনকার কলিকাতা হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের প্রধান অধ্যাপক শ্রীরামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত একখানি নাটক* লিখে পাঠান এবং বিচারে তা শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত হওয়ায় বিজ্ঞপিত পুরস্কারটি তিনি লাভ করেন।

এ হোল 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক' রচনার ইতিহাস। বল্লাল সেনীয় কৌলীন্য প্রথার ফলে বাঙলা দেশে যে দুরবস্থা ঘটেছিল তার

---

* কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক। ইং ১৮৫৪। পৃঃ ১২৭। শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা প্রণীত। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসুর বহুবাজারস্থ ১৮৫নং ইষ্টার্ণ হোপ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সম্বৎ ১৯১১।

পরিণাম প্রতিফলিত করাই এ নাটকের উদ্দেশ্য। অতএব 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব নাটক' প্রচারধর্মী প্রোপাগ্যাণ্ডিষ্ট লেখা।

সংক্ষেপে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের আখ্যানভাগটি হোল এই ঃ

বন্দ্যঘটীর কেশব চক্রবর্তীর পুত্র কুল-পালক বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন প্রধান কুলীন ব্রাহ্মণ। জাহ্নবী, শাম্ভবী, কামিনী আর কিশোরী—তাঁর চার কন্যা। মেয়েদের বয়স হয়েছে কিন্তু বিয়ে হয়নি। প্রতিবেশী কুলধন মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে কুল-পালক তাই বলছেন ঃ

"বয়সের কথা কি বলব ভাই, বয়স কোথা ? বড় কন্যার অদ্যাবধি সকল দন্ত পতিত হয় নাই ; মধ্যমটির সকল কেশও পক্ক হয় নাই ; তৃতীয় কন্যাও প্রায় মধ্যমটিব মত ; আর আমার যে কনিষ্ঠা কন্যা সে অতি শিশু ; বোধহয় গাত্রে সূতিকা গন্ধও থাকিলে থাকিতে পারে, বাছা এই গত পৌষ মাসে সবে পঁচিশ (পরবর্তী সংস্করণে—৫ম সং—কুলপালকের মেয়েদের বয়স এরূপ দেওয়া আছে ঃ বড় মেয়ের ৩২।৩৩ ; মেঝো মেয়ের ২৬।২৭, সেজো মেয়ের ১৪।১৫ আব ছোট মেয়ের বয়স সবে আট বৎসর) বৎসরে পড়িয়াছে।

কুলধন—বিলক্ষণ, এত অল্প বয়সে তুমি তাদের বে দিও না, দেশেল্লোকের কথায় কি করে ; আমারে অমনি নিন্দে কচ্চে ; আমার একটি মেয়ে, তার বে হয়নি বলে কতো কথাই বলচে, বলুক, বেটারা কি কর্ব্বে।

কুলপালক—তোমার মেয়ের বয়স কত ভাই ?

কুলধন—বয়েস বড় অধিক নয়, সেদিন ঠিকুজি খুলিয়া দেখিলাম বলি দেখি দেখি মেয়েটার বয়স কত, তা ভাই বুঝিতে পারিলাম না, ঠিকুজিখানা জীর্ণ হয়েছে আঁকর বোঝা যায় না, তা নাই গেলো, সে তার বড়পিসির বইসী।" (নাট্যকারের শাণিত শ্লেষোক্তি লক্ষ্য করবার)।

ঘরে আইবুড়ো মেয়ে, শান্তিতে কি রাত কাটবার জো আছে? ব্রাহ্মণীর পীড়াপীড়িতে কুলপালক তখন অনৃতাচার্য আর শুভাচার্য নামে দুজন ঘটকচূড়ামণিকে দেশে দেশে পাঠালেন পাত্রের সন্ধানে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কোথায় পাত্র? ঘটক-চূড়ামণিদেরও টিকির পাত্তা নেই। সত্যি বুঝি, 'বিবাহনির্বাহবিধি বিধির ঘটনা!'

অবশেষে এতদিনে বিধি হলো অনুকূল। বিয়ের ফুল ফুটল কুলপালকের কন্যাদের। ঘটকচূড়ামণিকে একশ' টাকা উপঢৌকনের বিনিময়ে যে পরম পাত্রটি জুটল তিনি হলেন সাক্ষাৎ 'বিষ্টুঠাকুরের সন্তান—ফুলের মুখুটি।' কুলীন মহারথি কুমার—হলেও বা বয়স একটু বেশী—এই বছর ষাটেক। রূপে-গুণেও নেহাৎ মন্দ নয়—যদিও বরের সারা গায়ে নাকি দাদ, পা-দুটো যেন মুকি ভরা ওল, বসন্তের চিহ্ন মুখেতে—একটা চোখও যেন নেই। কুলীনের মেয়েদের বিয়েতে দিন-ক্ষণেরও প্রয়োজন কি? তা ছাড়া বিলম্ব হলে বরের আর সব গুণ হয়ত প্রকাশ হয়ে পড়বে। তখন বিয়ে হওয়াই দুষ্কর হবে। তাই 'বিষ্টুঠাকুরের সন্তান ফুলের মুখুটি' পরম কুলীন পাত্রটির সঙ্গে কুলপাবক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চার কন্যারই বিয়ে হয়ে গেল এক সাথে যদিও

'বর দেখি বামাগণ করে গণ্ডগোল।
বিবাহ নির্ব্বাহ হলো হরি হরি বোল॥'

এ হোল 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের মূল গল্পাংশ। 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকে নাটকীয় সংঘাতের পরিচয় বড় একটা মেলে না। ব্যঙ্গচ্ছলে বল্লাল সেনীয় কৌলীন্য প্রথার কুফল ও অসংগতি প্রমাণ করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। তাই দেখতে পাই মূল আখ্যায়িকার সমর্থক আরও অনেকগুলো পার্শ্বচরিত রামনারায়ণ তাঁর নাটকে চিত্রিত করেছেন। যেমন, কুলীন-ঘরের বিবাহিতা মেয়ে ফুলকুমারীকে।

জল সইতে গেলে ঠানদিদি যশোদা ফুলকুমারীকে শুধাচ্ছেঃ 'কি লো, নাতনি। সব মেয়েরা জল সইতে গেছে তোর এতো বেলা কেন্ লো? কালি বুঝি নাজ্জামাই এসেছিলো, তাই বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়েছিলি—এই যে তুই চোক নাল করে বসেছিল, সে কিলো? বড় খিদে হলে কি দু-হাতে খেতে হয়?'

এর উত্তরে ফুলকুমারী সবিষাদে যা জানালো তার মর্মার্থ হোলঃ "গেড়েচ্ছ্যাঙ্ কি স্বর্গ দেখে? তেমন কপাল হলে কি কাল কুলীনের হাতে পড়তাম! তোমার নাজ্জামাই এসেছিল ঠিক, তবে মনের সাধ সাধতে' নয়। এসেছিল টাকার সন্ধানে। মায়ের খাড়ু বাঁধা দিয়ে টাকা এনে হাতে দিলে পর তবে জামাই পা ধূলো শ্বশুর-বাড়িতে। কিন্তু আরও টাকা চাই। রাত্রে ফুলকুমারী তার কাটনা কাটা কড়ি সব বার করে দিলে। কিন্তু তাতেও মন উঠল না কুলীন স্বামীর। অবশেষে রাগ করে বাইরে টোলেতে গিয়ে সে রাত কাটাল। আর ফুলকুমারী কেঁদে কেঁদে সারা রাত চোখ দুটো লাল করল।"

ফুলকুমারীর খেদোক্তি ছাড়াও বিবাহ-বণিকের পুত্র মহাকুলীন অধর্মরুচির সঙ্গে তার ছেলে উত্তমকুমারের আকস্মিক প্রথম সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন, গর্ভবতী হরির মার কন্যা হবার জন্য পুরোহিতের কাছে স্বস্ত্যয়ন, ঘটক-চূড়ামণি অনৃতাচার্যের চরিত্র ও অভব্যচন্দ্রের বিবরণ প্রভৃতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে এ নাটকে ব্যঙ্গ পরিহাসচ্ছলে।

রামনারায়ণ বাস্তবধর্মী নাট্যকার ছিলেন। তিনি যে রিয়ালিষ্ট তার পরিচয় পাওয়া যায় কুলপালকের কৃষাণ ভৃত্য ভোলার কথোপকথনে। ভৃত্যজাতীয় নিম্ন-শ্রেণীর গ্রাম্যলোকের অন্তর বেদনার চিত্রটি লক্ষ্য করবারঃ

'ঐ ওঘরের বাড়ির মুই খ্যানাকাউ গেহালাম, এসতে এসতেই বড়মোশাই বল্যে "ওরে ভোলা, তুই যা, পুরুৎঠাকুরেরে ডাকি আন," তা এই মুই অদ্দূরে থাকি আলাম, তামুক খাতিও পাল্লাম না, এট্টু জিরুতে পাল্লাম না, তাইত মোদের বৌ বলে হালো, বলে 'চাকুরি না কুকুরি' তা খাতিপত্তি পাইনে, না করে কি কর্ব্যো? মুনিব যা বলে তা না কল্যে মেইনে দেবে কেন? খ্যাদোয়ে দেবে যে, তাই যাচ্চি, আসি তবে তামুক খাব। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) ঐ ঝাঃ কেচ্চেখানা ভুলি আলাম, দাদাঠাকুর বল্যে "এসবের বেলা এট্টা থোঁড়ের গাচ আনিস" তা কিদি কাটাবো? আবার ফিরি যাব? (চিন্তা করিয়া) না বেনে, পদেদ্ধারে মোর ঝীয়ের ঘর, সেইস্থেই ন্যাবো।..."

শুধু ভোলার চরিত্রে নয় কুলপালকের অষ্টম বর্ষীয়া (?) কন্যা কিশোরীর উক্তিতেও রামনারায়ণের বাস্তবধর্মী সংলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। কিশোরী বল্লল সেনীয় কৌলীন্য প্রথার শিশুমেদ যজ্ঞের অন্যতম বলি। পাড়ার ঘোষেদের বাড়ীতে সে তখন লুকোচুরি খেলা করছিল, তাকে তখন 'বে হবে' বলে ডেকে আনা হোল। 'বে' কাকে বলে সে তা তখনও জানে না। মা তাই বলছে :

"ব্রাহ্মণী—বে কাকে বলে তাও জানিসনে বাছা! প্রধান সংস্কার!

কিশোরী—ও মা! তা কি আমি খাব?

ব্রাহ্মণী—বাছা বে কি খেতে হয়? রাঙা বর আসবে তোদের বে কর্বে, কতো ঘটাঘটী হবে, সে কি বাছা, কিছুই জানিসনে?

কিশোরী—হাঁ হাঁ, সেই 'বে' তা আমি জানি, তা কার হবে মা!

ব্রাহ্মণী—তোমার হবে, তোমার আর তিন বোনের হবে।

কিশোরী—ও মা! তবে তোর হবে না?'..."

রসিকা বিধবা নাপতিনীর সঙ্গে পূজক ব্রাহ্মণ দেবলের রহস্যালাপ শালীনতাদোষে দুষ্ট হলেও মূল নাটকের সঙ্গে খাপছাড়া বলে মনে হয়না। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র প্রভাব এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার। এমনি আর একটি চরিত্র সুশিক্ষিতা কুলীন কন্যা মাধবীর।

নাটকখানি ছয় ভাগে বা অঙ্কে বিভক্ত। প্রথমে, কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহার-সূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব। তৃতীয়ে, কুলকামিনীগণের আচার-ব্যবহার। চতুর্থে, শুক্র-বিক্রয়ির দোষোদ্‌ঘোষণ। পঞ্চমে, নানা রহস্য ও বিরহী পঞ্চাননের বিয়োগ পরিবেদন। ষষ্ঠে, বিবাহ নির্বাহ ও গ্রন্থসমাপ্তি। এই রীতিক্রমে এ-নাটক রচিত।

রামনারায়ণ তর্করত্ন ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রের পণ্ডিত। সুতরাং সংস্কৃত-নাটকের চিরাচরিত রীতি অনুসারে নান্দী, সূত্রধার ও প্রস্তাবনার পর তাঁর নাটকের যে সুরু হবে, তাতে অবাক হবার কি আছে? তা ছাড়া, রামনারায়ণের নাটকের চরিত্রগুলির নাম-করণও বিশেষ কৌতুকপূর্ণ। যেমন বিবাহ-বণিক, উদরপরায়ণ, বিবাহ-বাতুল, বিরহিপঞ্চানন, অধর্মরুচি ইত্যাদি। নাট্যকার কেবল শ্লেষ ও হাস্যাত্মক দৃশ্যাবলীর একত্র সমাবেশ করেই ক্ষান্ত হননি, নাট্যোল্লেখিত ব্যক্তিদের নামেও কুলীন কুলসর্ব্বস্বদের ব্যঙ্গোক্তি করতে কসুর করেননি।

লঘু গ্রাম্য ছড়া আর প্রবাদের পাশাপাশি উপমা-অনুপ্রাস বহুল বাংলা এ নাটকখানি যে সেকালের জনসাধারণের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তা বলা বাহুল্য। সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসারে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অনেক স্থলে রামনারায়ণ তাঁর রচিত এমন অনেক সংস্কৃত শ্লোকও ব্যবহার করেছেন, যা কবি মাঘ লিখলেও অগৌরব হ'তো না বলে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর 'পুরাতন প্রসঙ্গে' উল্লেখ

করেছেন। সামাজিক সমস্যা নিয়ে সার্থক নাটক রচনার জন্য রামনারায়ণ তর্করত্ন 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামে ছিলেন প্রসিদ্ধ। তা ছাড়া তিনি 'কাব্যোপাধ্যায়' উপাধি ও 'হরকুমার ঠাকুর কনক-কেয়ুর'ও লাভ করেছিলেন।

১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবু) বাড়ীতে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকে'র প্রথম অভিনয় হয়।

নতুন বাজারে চড়কডাঙ্গা রোডে (বর্তমান ট্যাগোর ক্যাসল ষ্ট্রীট) রামজয় বসাকের বাড়ীতে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয় কিন্তু বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে একটা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এতদিন কলকাতায় যে সব নাটকের অভিনয় হোত, সেগুলি ছিল প্রায় পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে। কোনটির প্রধান উপজীব্য ছিল বিদ্যাসুন্দরের গান, কোনটির বা অভিজ্ঞান শকুন্তলার অনুবাদ। 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব'কে অনেকে বাংলার আদি নাটক বলে থাকেন। কিন্তু 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকে'র পূর্বে রচিত যোগেশচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তি-বিলাস', তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' আর হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' প্রভৃতি নাটকের কথা স্মরণ রেখে তা মেনে না নিলেও এ কথা বলা যেতে পারে যে, সামাজিক সমস্যা নিয়ে রামনারায়ণই প্রথম খাঁটি বাংলা নাটকের নাট্যরূপ দিয়ে গেছেন। এ ক্ষেত্রে দাবী তাঁর সর্ব্বজন স্বীকৃত। 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকে'র অপর ঐতিহাসিক মূল্য : 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক'ই বুঝি মধুসূদনের সুপ্ত নাট্যপ্রতিভাকে ঘা মেরে দিয়েছিল জাগিয়ে। তখনকার বাংলা নাটকের দূরবস্থা দেখেই তিনি যেন নতুন করে বাংলা নাট্য-সাহিত্য গড়ে তোলার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। কাজেই দেখা যায়, 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক'কে কেন্দ্র করেই ১৯ শতকের মধ্যভাগে আধুনিক বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ভিত্তি-স্থাপন ঘটে॥

রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক' যে প্রচলিত কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে জোরদার প্রচারে সমর্থ হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে তখনকার "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকার এক সংবাদে। চুঁচুড়াতে এক বেনে বাড়িতে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকে'র অভিনয় দেখে স্থানীয় কুলীন ব্রাহ্মণরা নাকি এমনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন যে তাঁরা এর প্রতিশোধ নেবেন বলে শাসাতে থাকেন। (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস)।

খাদ্য রেশনের দৌলতে এবং রেশন সপের কাঁকরমণিযুক্ত চাল-আটা খেয়ে খেয়ে ভোজন-পটু বাঙালীরা ফলারের কথা আজকাল একরূপ ভুলেই গেছে। তাই 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক' থেকে উত্তম, মধ্যম আর অধম ফলারের খানিকটা বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করা গেল ঃ

উত্তম ফলার ঃ

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দুচারি আদার কুচি,
কচুরি তাহাতে খান দুই।
ছকা আর শাকভাজা, মতিচুর বঁদে খাজা,
ফলারের যোগাড় বড়ই॥
নিখুতি জিলাপি গজা, ছানাবড়া বড় মজা,
শুনে সক্‌সক্ করে নোলা।
হরেক রকম মণ্ডা, যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা
যত খাই তত হয় তোলা॥
খুরী পুরী ক্ষীর তায়, চাহিলে অধিক পায়,
কাজরি কাটিয়ে সুখো দই।
অনন্তর বাম হাতে, দক্ষিণা পানের সাতে,
উত্তম ফলার তাকে কই॥

মধ্যম ফলার ঃ

সরু চিড়ে সুখো দই, মত্তমান ফাকা খই,
খাসা মণ্ডা পাত পোরা হয় ।
মধ্যম ফলার তবে, বৈদিক ব্রাহ্মণে কবে,
দক্ষিণাটা ইহাতেও রয় ॥

অধম ফলার

গুমো চিড়ে জলো দই, তিতগুড় ধেনো খই,
পেটভরা যদি নাই হয় ।
রৌদ্দুরেতে মাথা ফাটে, হাত দিয়ে পাত চাটে,
অধম ফলার তাকে কয় ॥···

'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকে'র জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বেঙ্গলী থিয়েটার' প্রবন্ধে লিখে গেছেন ঃ

'Kulin Kulasarvasva' found ready acceptance at the hands of the Bengalees, who had the satisfaction to feel that they were doing immense benefit to society by playing a drama the sole purpose of which was to point out the glaring evils of polygamy and of that exceptional social customs known as 'Kaulinya.'

আজীবন সংস্কৃত শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পরিবেশে বর্ধিত হয়েও রামনারায়ণ তর্করত্ন যে বংশগত সব কুসংস্কারের বাইরে গিয়ে তাঁর নাটকে অমন প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিতে পেরেছেন সেকালে, তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। যশস্বী নাট্যকার 'নাটুকে রামনারায়ণে'র এখানেই প্রকৃত পরিচয় ।

প্রবোধচন্দ্রিকা

রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র মহারাজ শ্রীবৈজপাল একদিন রাজ-সিংহাসনে বসে ভাবলেন ঃ এ সংসার অসার। 'অক্ষরনিবদ্ধা' কীর্তি—লেখাপড়া ছাড়া সংসারে সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর।

রাজকুমার শ্রীধরাধর অদূরে খেলা করছিল আপন মনে। মহারাজ তাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন ঃ "ওরে বাছা, বিদ্যাভাস কর, বিদ্যাতে রিপুরা পরাজিত হয়, বিদ্যাতে কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান হয়, বিদ্যাতে যশোলাভ হয়।..."

এভাবে বিদ্যাভ্যাসের নানান গুণকীর্তন করে তিনি রাজকুমারের মনে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তুললেন। আর আচার্য প্রভাকরের হাতে রাজকুমারকে সঁপে দিলেন তার পড়াশুনার সব ভার সমর্পণ করে। অধ্যাপক প্রভাকর শর্মা তখন রাজপুত্রের বিদ্যা-শিক্ষার জন্য বর্ণমালা থেকে আরম্ভ করে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার প্রভৃতি নানান শাস্ত্রীয় বিষয়ের অবতারণা করেন। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ, স্মৃতি, ন্যায়, সাংখ্য, পুরাণ, জ্যোতিষশাস্ত্র, চাণক্যের রাজনীতি, সমাজ-তত্ত্ব—কোনটাই বাদ দিলেন না। রাজকুমারকে সর্বশাস্ত্রজ্ঞ করে তুলতে গল্পচ্ছলে তিনি হিতোপদেশমূলক বহু লৌকিক শাস্ত্রবিধানেরও পাঠ রচনা করলেন। এমন কি যে 'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং দেবা ন জানন্তি', সে সম্পর্কেও আপন ছাত্রকে ওয়াকিবহাল করে তুললেন বিস্তর সরস কাহিনীর অবতারণা করে।

এ হোল পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের (খ্রীঃ ১৭৬২—১৮১৯) শ্রেষ্ঠ রচনা 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র মূল বিষয়বস্তু। অবতরণিকাও। এর আখ্যা-পত্রটি হোল ঃ

প্রবোধচন্দ্রিকা। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার কর্ত্তৃক/ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রেরদের নিমিত্ত রচিত/শ্রীরামপুর মুদ্রাযন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল/সন ১৮৩৩।

কথায় বলে, যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে। এ আপ্ত বাক্যটা 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ক্ষেত্রেও খাটে। "অভিনব যুবক সাহেব জাতের শিক্ষার্থে" ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেডপণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার বিদেশী ছাত্রদের শিক্ষণীয় এমন কোন বিষয় নেই 'প্রবোধচন্দ্রিকায়' যা লিপিবদ্ধ করেন নি উত্তম গৌড়ীয় ভাষাতে। বিদেশী সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষার বিভিন্ন রীতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য তিনি বাংলা, বিশুদ্ধ সংস্কৃত, সাধু ও কথ্য বা চলতি ভাষা নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। 'প্রবোধচন্দ্রিকা' "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রেরদের নিমিত্ত"ই রচিত হয়েছিল। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর ১৪ বৎসর পর বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। জর্জ মার্শম্যান এর এক মুখবন্ধ লেখেন। বইটির বিশুদ্ধ ভাষার অকুণ্ঠ প্রশংসাও করেন। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র রচনাকাল আরও বহু বছর আগে বলে অনেকে মনে করেন। 'প্রবোধচন্দ্রিকা' কেবল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সিনিয়র ডিভিসন ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক ছিল না। বইটি অনেক কাল হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপেও নির্বাচিত ছিল। ১৮৬২ সালে কলিকাতা ইউনিভার্সিটির অনুমত্যানুসারে এটি পুনর্মুদ্রিত হয় ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে।

তখনকার দিনের পরিপ্রেক্ষিতে 'প্রবোধচন্দ্রিকা'কে নেহাত ক্ষুদ্র বই বলা চলে না। চারটি স্তবকে এর চারটি বিভাগ। আবার প্রতিটি স্তবকে 'কুসুম' নামে একাধিক অধ্যায়। বইয়ের মুখবন্ধেই ভাষার প্রশংসা করা হয়েছে। তারপর ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, পুরাণ থেকে সুরু করে রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি কোন আলোচনাই তিনি বাদ

দেন নি "যুবক সাহেব জাতের" শিক্ষার্থে। শেষ অধ্যায়ে তিনি জাতি ও তার উৎপত্তির সমাজতাত্ত্বিক বিবরণও লিপিবদ্ধ করেছেন।

পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত। একদা তাঁর পাদপীঠে বসে কেরী প্রমুখ খৃস্টান মিশনারী পাদ্রীরা প্রত্যহ দু-তিন ঘণ্টা করে বাংলা ভাষায় পাঠ করিতেন। বাইবেল অনুবাদে সাহায্য গ্রহণ করিতেন। সুতরাং পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় যে তাঁর রচিত বইয়ের মূল সংস্কৃত গ্রন্থের রচনা পদ্ধতির অনুসরণ করবেন তাতে অবাক হবার কি আছে? বইখানির বেশীর ভাগ সংস্কৃত শব্দবহুল সাধু ভাষায় লিখিত। কিন্তু সাহিত্য-শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় বড় বড় সমাসবদ্ধ সাধু ভাষার ফাঁকতালে চলতি বা কথ্য ভাষা ও রীতির ভেল্‌কিও বেশ চমৎকার দেখিয়েছেন বইটিতে।

স্বর্গত প্রমথ চৌধুরী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের চলতি ভাষার নমুনা হিসাবে নীচের এ অংশটি উদ্ধৃত করেছেন। এক কৃষক-পত্নী খেদোক্তি করে বলছে :

"মোরা চাস্ করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো ছেলেপিলাগুণি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মুড়ি ও মটর মসুর শাক পাত শামুক গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি। খড়কুটা শুকনা পাতা কঞ্চী তুঁষ ও বিলঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কাপাস তুলি তূলা করি ফুড়ী পিঁজী পাঁইজ করি চরকাতে সূতা কাটি, কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাটেঘাটে বেড়াইয়া ফলফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাতায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পোণেক দশ গণ্ডা যা পাই। ও মিনসা পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস খাটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পায় তাহাতে তাঁতির বানী দি ও তেল লুণ করি, কাটনা কাটি

ভাড়া ভানি ধান কুড়াই ও সিজাই শুকই ভানি খুদ কুঁড়া ফেন আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া যে দিন খাই সেদিন তো জন্মতিথি। কাপড় বিনা কেয়ো পাচা ঠুকরিয়া খায় তেল বিহনে মাতায় খড়ি উড়ে। শীতের দিনে কাঁথা খানী ছালিয়া গুলিকের গায় দি আপনারা দুই প্রাণী বিচালি বিছাইয়া পোয়ালের বিঁড়ায় মাতা দিয়া মেলের মাদুর গায় দিয়া শুই। বাসন গহনা কখন চক্ষেও দেখিতে পাই না যদি কখন পাথরায় খাইতে পাই ও রাঙ্গা তালের পাতা কাণে পরিতে ও পুঁতির মালা গলায় পরিতে ও রাঙ্গ সীসা পিতলের বালা তাড়মল খাড়ু গায় পরিতে পাই তবেতো রাজরানী হই। এ দুঃখেও দুরন্ত রাজা হাজা শুকো হইলেও আপন রাজস্বের কড়া গণ্ডা ক্রান্তি বট ধূল ছাড়ে না এক আদদিন আগে পাছে সহে না। যদ্যপিস্যাৎ কখন হয় তবে তার সুদ দাম ২ বুঝিয়া লয় কড়া কপর্দ্দকও ছাড়ে না। যদি দিবার যোত্র না হয় তবে সানা মোড়ল পাটোয়ারি ইজারদার তালুকদার জমীদারেরা পাইক পেয়াদা পাঠাইয়া হাল যোয়াল ফাল হালিয়া বলদ দামড়া গরু বাছুর বকনা কাঁথা পাতরা চুপড়ী কুলা ধূচনী পর্য্যন্ত বেচিয়া গোবাড়িয়া করিয়া পিটিয়া সর্ব্বস্ব লয়। মহাজনের দশগুণ সুদ দিয়াও মূল আদায় করিতে পারি না কতো বা সাধ্য সাধনা করি হাতে ধরি পায় পড়ি হাত জুড়ি দাঁতে কুটা করি। হে ঈশ্বর দুঃখির উপরেই দুঃখ। ওরে পোড়া বিধাতা আমাদের কপালে এত দুঃখ লেখিস্। তোর কি ভাতের পাতে আমরাই ছাই দিয়াছি”…(প্রবোধচন্দ্রিকা—৩য় স্তবক, ৩য় কুসুম।)

এ তো গেল গ্রামের নিম্নশ্রেণীর কথ্যভাষার নমুনা। সাধু ভাষার উদাহরণ :

“দণ্ডকারণ্যে প্রাচী নদীতীরে বহুকালাবধি এক তপস্বী তপস্যা

করেন বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য তপঃ করিয়াও তপঃসিদ্ধিভাগী হন না। দৈবাৎ ঐ তপোধনের তপোবনেতে এক দিবস নারদ মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।…" 'বিশ্ববঞ্চক' উপাখ্যানে মৃত্যুঞ্জয়ের পরিহাস-প্রবণতার পরিচয়ও মেলে।

দার্শনিক বা আলংকারিক তথ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র অনেক জায়গায় দীর্ঘ সমাসবদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করতে হয়েছে। এর জন্য রাজনারায়ণ বসু, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রমুখ সাহিত্য-সমালোচকরা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে ছাড়েননি। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে হবে, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আদিযুগে বাংলা গদ্য সবে মাত্র যখন দানা বাঁধতে সুরু করছে সে যুগে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার আরবী-পারসী শব্দের প্রভাবমুক্ত 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় বিভিন্ন নানা গদ্যরীতির এক্সপেরিমেণ্টের মধ্যে আধুনিক বাংলা গদ্য-সাহিত্যের এক সুষ্ঠু রূপ পরিকল্পনা করে গেছেন যার সার্থক উত্তর-সারথী হলেন বিদ্যাসাগর আর অক্ষয়কুমার দত্ত। প্রমথ চৌধুরীর কথায়ঃ "প্রবোধচন্দ্রিকার ভাষায় যিনি দাঁত বসাতে পারবেন, তিনিই রসাস্বাদ করতে পারবেন। আমাদের নব্যলেখকেরা যদি মনোযোগ দিয়ে প্রবোধচন্দ্রিকা পাঠ করেন, তা হ'লে রচনা সম্বন্ধে অনেক সদুপদেশ লাভ করতে পারবেন।" (প্রবন্ধ সংগ্রহ—১ম খণ্ড ঃ প্রমথ চৌধুরী।)

মৃত্যুঞ্জয় তাঁর বিরূপ সমালোচকদের উদ্দেশ করেই বোধ হয় 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেনঃ "এই উপস্থিত গ্রন্থ যে ব্যক্তি বুঝিতে পারেন এবং ইহার লিপি-নৈপুণ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তাঁহাকে বাঙ্গলাভাষায় সম্যক ব্যুৎপন্ন বলা যাইতে পারে।"

রাজাবলি

বাংলার খাঁটি ইতিহাস নেই বলে একদা বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করেছিলেন। মিনহাজ উদ্দীন বা ষ্টুয়ার্ট সাহেব প্রভৃতি বিদেশীদের লেখা যে সব ইতিহাস আছে এবং যা ছুঁড়ে মারলে আস্ত একটা জোয়ান মদ্দ পর্যন্ত খুন হয়ে যেতে পারে, তাতে আর যাই থাক, প্রকৃত ইতিহাস নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের এই খেদোক্তি বুঝি 'রাজাবলি'র * বেলায়ও প্রযোজ্য। 'রাজাবলি' কলির প্রারম্ভ হতে ইংরেজ অধিকার পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা-বাদশার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 'রাজাবলি' "ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত ভারতবর্ষের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস" বলেও দাবী জানায়। পৌরাণিক কাহিনী ও কিংবদন্তির উপর নির্ভর করে রাজা যুধিষ্ঠিরের আমল থেকে এ রাজাবলির যাত্রা পথ সুরু। দিল্লীর সিংহাসনে হিন্দু রাজাদের বিবরণের পর মুসলমান বিজয়, পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্রের কাহিনী, বাংলার আদিসুর, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন-এর বিবরণ, পাঠান বিজয়, দিল্লীর মুঘল শাসন, ইংরেজদের আগমন ও সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধ ও সুবা বাংলা অধিকার ইত্যাদি ভারতবর্ষের ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাসের সন-তারিখ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এ বইতে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁর গ্রন্থ শেষ করেছেন: "এরূপ নন্দবংশজাত বিশারদ অবধি শাহআলম পর্য্যন্ত ও মুনইম খাঁ নবাব অবধি কাশমলী খাঁ পর্য্যন্ত কোন কোন সম্রাট রাজারদের ও নবাবেরদের ও তাহারদের চাকর লোকেরদের স্বামিদ্রোহাদি নানাবিধ পাপেতে এই হিন্দুস্থানের

---

* রাজাবলি। /সংগ্রহ ভাষাতে।—মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মনা ক্রিয়তে।— /শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—/১৮০৮।/-

বিনাশোন্মুখ হওয়াতে পরমেশ্বরের ইচ্ছামতে ঐ হিন্দুস্থানের রক্ষার্থ আরোপিত কম্পানি বাহাদুরের অধিকাররূপ বৃক্ষের পুষ্পিতত্ব ও ফলিতত্বের সমবধায়ক যে বড় সাহেব তৎকর্ত্তৃক ঐ কম্পানি বাহাদুরের অধিকাররূপ বৃক্ষের আলবালত্বে নিরূপিত পাঠশালার পণ্ডিত শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মাকর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত রাজ-তরঙ্গ নামে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।”—

মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষায় ‘রাজাবলির’ রাজা-রাজড়াদের দীর্ঘ বংশ তালিকার কিছু নমুনা দেওয়া গেল ঃ

…পরমেশ্বর এই পৃথিবীর পালন নিমিত্ত ইক্ষ্বাকু নামে অশ্বত্থ-বৃক্ষ রূপ রাজাকে সত্য যুগে প্রথমত আরোপিত করিয়াছিলেন ঐ রাজার স্কন্ধ শাখাদ্বয়রূপ সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ এই দুই বংশের ধারাবাহিক সন্তান পরম্পরাতে চারি যুগে এই পৃথিবী মণ্ডল অধিকৃত ছিলেন। এই উভয় বংশীয় রাজারদের মধ্যে মহত্তম ধর্ম্মতপো বল প্রভাবে কেহ ২ সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর শাসন করিয়াছেন কেহ ২ মহত্তম ধর্ম্ম তপস্যা বল ও প্রতাপে জম্বুদ্বীপ মাত্রের অধিকার করিয়াছেন। কেহ ২ মহাধর্ম্ম তপোবল বশতো ভারতবর্ষ মাত্রের অধিকার করিয়াছেন কেহ বা কুমারিকা খণ্ডমাত্রের রাজা ছিলেন এই দুই বংশের রাজারদের মধ্যে একতর সম্রাট্ হইলে অন্যতর মণ্ডলেশ্বর হইতেন। ইহাঁরদের বিবরণ পুরাণেতিহাসাদি শাস্ত্রে বিস্তারিত আছে।

এই উভয় বংশীয় রাজারদের অধিকারে ১৭২৮০০০ সতের লক্ষ আটাইশ হাজার বৎসর সত্য যুগের ও ১২৯৬০০০ বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বৎসর ত্রেতাযুগের ও ৮৬৪০০০ আট লক্ষ চৌষটি হাজার বৎসর দ্বাপর যুগের অবসান হইলে পর বর্ত্তমান কলি যুগের আরম্ভ অবধি গত ৪৯০৫ চারি হাজার নয় শত পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত যে ২ রাজা ও বাদশাহ ও নবাব হইয়াছেন তাঁহারদের বিবরণ ১৮০০ আঠার শত য়িশবীয় সনে গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত হইল।

এই বর্ত্তমান কলি যুগে ৬ ছয় শক প্রবর্ত্তক রাজা কলির প্রথমাবধি ৩০৪৪ তিন হাজার চৌয়াল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির রাজার শক গত হইয়াছে। তাহারপরে উজ্জয়নীতে বিক্রমাদিত্য রাজার ১৩৫ শক গত। বর্ত্তমান নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে শালিবাহন নামে রাজার শক যাইতেছে এ শক বিক্রমাদিত্য রাজার শকের পর ১৮০০০ আঠার হাজার বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবে। তাহার পর বিজয়াভিনন্দন নামে রাজা চিত্রকূট পর্ব্বত প্রদেশে হইবেন তাহার শক শালিবাহন রাজার শকের পর ১০০০০ দশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত হইবে।

তাহার পর পরিনাগার্জ্জুন নামে এক রাজা হইবেন তাঁহার শক এই কলির ৮২১ আট শত একইশ বৎসর শেষ থাকা পর্য্যন্ত থাকিবে। তাহার পর সম্ভল দেশে গৌড় ব্রাহ্মণের ঘরে কল্কিদেবের অবতার হইবে। এই মতে ৬ ছয় শককর্ত্তা রাজারদের মধ্যে ২ দুই গত ১ এক বর্ত্তমান ত তিন ভাবী।

এই ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর চারিদিক অগ্নি নৈঋত বায়ু ঈশান চারি কোণ আর মধ্য এইরূপে নয় ভাগ এই নয় ভাগের মধ্য ভাগে যে ২ দেশ সকল তাহারদের নাম। সারস্বত মৎস্য শুরসেন মথুরা পঞ্চাল শাম্ব মাণ্ডব্য কুরুক্ষেত্র হস্তিনা নৈমিষ বিন্ধ্যাদ্রি পাণ্ড্য ঘোষ যামুন কাশী অযোধ্যা প্রয়াগ গয়া মিথিলা ইত্যাদি। পূর্ব্ব ভাগে মগধ শোণ বরেন্দ্র গৌড় রাঢ় বর্দ্ধমান তমোলিপ্ত প্রাগ্জ্যোতিষ উদয়াদ্রি ইত্যাদি দেশ। অগ্নি কোণে অঙ্গ বঙ্গ উপবঙ্গ ত্রৈপুর কোশল কলিঙ্গ উৎকল আন্ধ্র বিদর্ভ শবর ইত্যাদি দেশ। দক্ষিণে অবন্তী হেমাদ্রি মলয় ঋষ্যমূক চিত্রকূট মহারণ্য কাঞ্চী সিংহল কোঙ্কন কাবেরী তাম্রপর্ণী লঙ্কা ত্রিকূট ইত্যাদি দেশ। নৈঋ‍ৎ কোণে দ্রবিড় আনর্ত্ত মহারাষ্ট্র রৈবত যবন পহ্লব সিন্ধু পারসিক ইত্যাদি দেশ। পশ্চিমে হৈহয় অস্তাদ্রি ম্লেচ্ছ বাস শক

ইত্যাদি দেশ। বায়ু কোণে গুজ্জরাট নাট জালন্ধর ইত্যাদি দেশ। উত্তরে চীন নেপাল হূন কেকয় মন্দর গান্ধার হিমালয় ক্রৌঞ্চ গন্ধমাদন মালব কৈলাস মদ্র কাশ্মীর ম্লেচ্ছদেশ খস ইত্যাদি দেশ। ঈশান কোণে স্বর্ণভৌম গঙ্গাদ্বার টঙ্কন বাহ্লীক ব্রহ্মপুর কিরাত দরদ ইত্যাদি দেশ এই সকল দেশের মধ্যে মধ্যদেশস্থিত সম্রাট্ রাজারা নরপতি উত্তর দেশীয় সম্রাট রাজারা অশ্বপতি দক্ষিণ দেশীয় সম্রাট্ রাজারা গজপতি এই তিন প্রকার সম্রাট্ রাজারদের মধ্যে নরপতি রাজারদের বিবরণ সামান্যতো লিখি।

এই কলির আরম্ভ অবধি ৪২৬৭ চারি হাজার দুই শ সাতষট্টি বৎসর পর্য্যন্ত ১১৯ এক শ উনিশ জন নানা জাতীয় হিন্দু দ্বিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট হন। ইহার বিবরণ রাজা যুধিষ্ঠির অবধি ক্ষেমক পর্য্যন্ত ২৮ আটাইশ জন ক্ষত্রিয় জাতি পুরুষেতে ১৮১২ আঠার শ বার বৎসর। এই পর্য্যন্ত কলিতে বাস্তব ক্ষত্রিয় জাতির বিরাম হইল। তাহার পর মহানন্দি নামে ক্ষত্রিয়ের ঔরসেতে শূদ্রা গর্ভজাত নন্দের বংশজাত বিশারদ অবধি বোধমল্ল পর্য্যন্ত ১৪ চৌদ্দ জনেতে ৫০০ পাঁচ শ' বৎসর এই নন্দ অবধি রাজপুত জাতির সৃষ্টি হয়। তাহার পর গৌতম বংশজাত বীরবাহু অবধি আদিত্য পর্য্যন্ত নাস্তিক মতাবলম্বি ১৫ পনের জনেতে ৪০০ চারি শত বৎসর। এই সময়ে নাস্তিক মতের অত্যন্ত প্রচার হওয়াতে বৈদিক ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন প্রায় হইয়াছিল। তাহার পর ময়ূরবংশীয় ধুরন্ধর অবধি রাজপাল পর্য্যন্ত ৯ নয় জনেতে ৩১৮ তিন শত আঠার বৎসর। তাহার পর শকাদিত্য নামে পর্ব্বতীয় রাজা এক জনেতে ১৪ চৌদ্দ বৎসর। এইরূপে কলির প্রথম অবধি ৩০৪৪ তিন হাজার চৌয়াল্লিশ বৎসর গত হইল এবং মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির দেবের শকেরও নিবৃত্তি হইল। তাহার পর বিক্রমাদিত্যের সম্বতের আরম্ভ হইল এই সম্বতের আরম্ভ অবধি

বিক্রমাদিত্যেরা পিতাপুত্রে দুই জনেতে ৯৩ তিরানব্বই বৎসর। তার পর সমুদ্রপাল অবধি বিক্রমপাল পর্য্যন্ত ১৬ ষোলজন যোগিতে ৬৪১।৩ ছ শ একচল্লিশ বৎসর তিন মাস। তাহার পর তিলকচন্দ্র অবধি গোবিন্দচন্দ্রের স্ত্রী প্রেমদেবী পর্য্যন্ত ১০ দশ জনেতে ১৪০।৪ এক শ চল্লিশ বৎসর চারি মাস। তাহার পর হরিপ্রেম বৈরাগী অবধি মহাপ্রেম পর্য্যন্ত ৪ চারিজন বৈরাগীতে ৪৫।৭ পয়তাল্লিশ বৎসর সাত মাস। তাহার পর ধীসেন অবধি দামোদর সেন পর্য্যন্ত বঙ্গ দেশীয় বৈদ্যজাতি ১৩ তের জনেতে ১৩৭।১ এক শ সাঁইত্রিশ বৎসর এক মাস। তাহার পর দ্বীপসিংহ অবধি জীবন সিংহ পর্য্যন্ত চোহান রাজপুত জাতি ৬ ছয় জনেতে ১৫১ এক শ একান্ন বৎসর। তাহার পর পৃথোরায় এক জনেতে ১৪।৭ চৌদ্দ বৎসর সাত মাস। এইরূপে বিক্রমাদিত্যের সম্বতের আরম্ভ অবধি ১২২৩ বার শ তেইশ বৎসর গত হইল। এবং কলির প্রথম অবধি ৪২৬৭ চারি হাজার দুইশত সাতষট্টি বৎসর গত হইল। এই পর্য্যন্ত হিন্দু রাজারদের সাম্রাজ্য ছিল। [পৃষ্ঠা ১-৭ ; ৪র্থ সংস্করণ।]

হিন্দু রাজাদের কুলজি বর্ণনেই 'রাজাবলি'র বিবরণ শেষ নয়। হিন্দুদের পর এল মুসলমান সাম্রাজ্য। দিল্লীর মশনদে ইংরেজদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত মুসলনান সম্রাটদের উপাখ্যান 'প্রসিদ্ধ পুস্তকাদি ও প্রামাণিক লোক-প্রমুখাৎ যা পাওয়া গেছে সে সব উপাখ্যান ও আর আর অবান্তর সম্রাট রাজারদের প্রত্যেক বিবরণ' অতঃপর লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার লিপিবদ্ধ করে গেছেন 'রাজাবলি'তে। 'রাজাবলি' থেকে বাংলার ইতিহাসের একটা অধ্যায়ও উৎকলন করা গেল। বাংলায় কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তনের বিশদ বিবরণ :

"এই সময়ে বাঙ্গাল ধীসেন নামে রাজা দ্বিল্লীর সিংহাসন শূন্য শুনিতে পাইয়া সসৈন্যে দ্বিল্লীতে চড়াউ করিলেন দ্বিল্লীর রাজার

মন্ত্রিবর্গেরা ধীসেনকে রাজা হওয়ার উপযুক্ত পাত্র জানিয়া এবং সিংহাসন শূন্য দেখিয়া তাঁহার সহিত কেহ যুদ্ধ করিলেন না তাঁহাকেই সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে স্ব স্ব কর্ম্ম করিতে লাগিল। ধীসেন জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এই রূপে ধীসেন ১৮।৫ আঠার বৎসর পাঁচ মাস সাম্রাজ্য করেন তৎপরে তাঁর পুত্র বল্লাল সেন রাজা হন। এই রাজা রাঢ় দেশের পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরদের কৌলীন্যাদি বিভাগ করেন। তাহার বিবরণ লিখি।

পূর্ব্বে আদিশূর নামে বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন তিনি অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত শস্য না হওয়াতে প্রজা লোকেদের অত্যন্ত পীড়া দেখিয়া বৃষ্টির নিমিত্তে যজ্ঞ করাইতে কান্যকুব্জ দেশের রাজা বীরসিংহদেবের সহিত প্রীতি করিয়া তদ্দেশীয় বেদঙ্গ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন। সে পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম এই ভট্টনারায়ণ দক্ষ বেদগর্ব্ভ ছান্দড় শ্রীহর্ষ এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্য নামে মুনির বংশজাত ইহার বংশের আদিপুরুষ শাণ্ডিল্য মুনি অতএব ঐ ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্য গোত্র ছিলেন। এ গৌড়দেশে শাণ্ডিল্য গোত্র ব্রাহ্মণ যত সে সকল ব্রাহ্মণ ঐ ভট্টনারায়ণের সন্তান। মকরন্দ ঘোষ নামে এক কায়স্থ জাতি ভৃত্য ইহার সঙ্গে আসিয়াছিল এখন যত ঘোষ কায়স্থ এ দেশে তাহারা সকল এই মকরন্দ ঘোষের সন্তান। দ্বিতীয় দক্ষ তাঁহার আদিপুরুষ কশ্যপ নামে মুনি অতএব ইনি কাশ্যপ গোত্র ছিলেন। এতদ্দেশীয় কাশ্যপ পোত্র যত ব্রাহ্মণ তাঁহারা সকলেই ইহাঁর সন্তান। ইহাঁর সঙ্গে দশরথ বসু নামে কায়স্থ ভৃত্য আসিয়াছিল এতদ্দেশে যত বসু কায়স্থ সে সকল ঐ দশরথ বসুর সন্তান। তৃতীয় বেদগর্ব্ভ ইনি সাবর্ণি গোত্র এতদ্দেশীয় যত সাবর্ণি গোত্র ব্রাহ্মণ তাঁহারা সকলেই ইহাঁর সন্তান। দশরথ গুহ নামে কায়স্থ ইহাঁর সঙ্গে ভৃত্য আসিয়াছিল ইহার সন্তানেরা বঙ্গদেশে কুলীন কায়স্থ। চতুর্থ ছান্দড় ইনি বাৎস্য

গোত্র এতদ্দেশীয় যত বাৎস্য গোত্র ব্রাহ্মণ সকলি ইহার সন্তান। ইহার সঙ্গে ভৃত্য পুরুষোত্তম দত্ত নামে কায়স্থ আসিয়াছিল এতদ্দেশীয় যত দত্ত কায়স্থ তাহারা সকল ঐ পুরুষোত্তম দত্তের সন্তান। পঞ্চম শ্রীহর্ষ ইনি ভরদ্বাজ গোত্র এতদ্দেশীয় ভরদ্বাজ গোত্র ব্রাহ্মণ যত সকলি ইহাঁর সন্তান। ইহাঁর সঙ্গে কালিদাস মিত্র নামে কায়স্থ ভৃত্য আসিয়াছিল এতদ্দেশে যত মিত্র কায়স্থ তাহারা সকল ইহার সন্তান। এইরূপে আদিশূর রাজা কর্তৃক আনিত যে পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাঁহারদের ৫৬ ছাপ্পান্ন জন সন্তান ছিলেন ইহারদিগকে ঐ বল্লালসেন রাজা ৫৬ ছাপ্পান্ন গ্রাম ব্রহ্মোত্তর দিয়া সন্মান করিয়া সংস্থাপন করিলেন ইহাতে ৫৬ ছাপ্পান্ন গাঁই হইল। ঐ ছাপ্পান্ন ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যাচারাদি ধর্ম্ম তারতম্য বিবেচনা করিয়া ৮ আট জনকে মুখ্য ও ১৪ চৌদ্দ জনকে গৌণ ও ২২ বাইশ জনকে কুলীন ও ৩৪ চৌত্রিশ জনকে শ্রোত্রিয় ঐ বল্লালসেন রাজা করিলেন। পশ্চাৎ কন্যা দানাদানাদি দোষে শ্রোত্রিয় ভিন্ন ত্রিবিধ ব্রাহ্মণের সন্তানেরা কেহ ২ কুলচ্যুত হইয়া বংশজ হইলেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের দেশে আসিবার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় যে ব্রাহ্মণেরা ছিলেন তাঁহারদের সহিত এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানেরদের বিবাহাদি কোন ২ ব্যবহার না হয় এই নিমিত্তে ঐ ব্রাহ্মণেরদিগকে ৭০০ সাত শত ঘর গণনা করিয়া স্বতন্ত্র এক থাক করিয়া দিলেন অতএব সেই সকল ব্রাহ্মণকে সপ্তশতী করিয়া লোকে কহে এখন এই সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা কেহ ২ ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানেরদের সহিত মিলিয়াছে। এই রূপে রাজা বল্লালসেন পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানেরদের ও এতদ্দেশীয় সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরদের বিভাগ করিলেন।” [রাজাবলি : ৪র্থ সং। পৃঃ ৩৪-৩৫]

'রাজাবলি'র নীচের এই অংশে নীচ জাতীয়া এক ডোম কন্যাকে কেন্দ্র করে রাজা বল্লাল সেন আর পুত্র লক্ষ্মণ সেনের মধ্যে সংস্কৃত

ভাষায় যে পত্রালাপ হয়েছিল বাংলার কৌতূহলী পাঠকদের জন্য তা উদ্ধৃত করা গেল :

'বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষণ সেন নামে গৌড় দেশমাত্রের রাজা হইয়াছিলেন। বল্লাল সেন দ্বিল্লীর রাজা ছিলেন তৎকালে তিনি ডোমের এক পদ্মিনী কন্যাকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন এ কথা সর্ব্বত্র রটাতে রাজা বল্লাল সেনের বড় অপ্রতিষ্ঠা হইল। গৌড়ের রাজা লক্ষণ সেন এ কথা শুনিতে পাইয়া পিতাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন সে পত্রের পাঠ এই—হে জল শৈত্যরূপ যে গুণ সে তোমারই সহজ আর নির্ম্মলতা তোমার স্বাভাবিক আর তোমার পবিত্রতা আমরা কি বলিব কেন না যে তোমার স্পর্শেতে অপর লোকেরা পবিত্র হয় আর কিবা তোমার এ সংসারে স্তুতির পদ আছে যেহেতুক তুমি সকল জীবেব জীবন ধারণের উপায় হইয়াছ এমন তুমি যদি নীচগামী হও তবে তোমার নিরোধ করিতে কে সমর্থ হয় রাজা বল্লাল সেন পুত্রেব এই পত্র পাঠ করিয়া পুত্রকে পত্র দ্বারা উত্তব লিখিলেন তাহার এই পাঠ তাপও অপগত হয় নাই তৃষ্ণাত্ত কৃশ হয় নাই শরীরের ধূলিও ধৌতা হয় নাই এবং স্বচ্ছন্দমতে কন্দের গ্রাসও হয় নাই ইহাতে ক্রীড়াব বা কথা কি কিন্তু দূরহইতে উৎক্ষিপ্তকর করি কর্ত্তৃক হায় এ বড় দুঃখ পদ্মিনী অর্থাৎ পদ্মলতা স্পৃষ্ট হইয়াছে কি না ভ্রমরাকর্ত্তৃক অর্থাৎ ভ্রান্তকর্ত্তৃক অকস্মাৎ ঝঙ্কার কোলাহল আরব্ধ হইয়াছে। লক্ষণ সেন পিতার এই পত্র পাইয়া পুনর্ব্বার পিতাকে লিখিলেন তাহার এই পাঠ। অপবাদ সত্যই হউক কিম্বা মিথ্যাই বা হউক সাধু লোকেরদের মহিমাকে অবশ্য নষ্ট করে ইহার দৃষ্টান্ত এই প্রকাশমাত্রে অশেষ প্রকার অন্ধকার নষ্ট করেন যে সূর্য্য তিনি আশ্বিন মাসে কন্যারাশিস্থ হইলে লোকেরা বলে সূর্য্য কন্যাগত হইলেন এই মতে সূর্য্যের বাক্‌ছল-মাত্র মিথ্যাপবাদের কথা হওয়াতে অপবাদের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিতে

সূর্য্য তারপর তুলাতে যান অর্থাৎ যদ্যপি তুলা পরীক্ষাতে যান তথাপি তারপর অগ্রহায়ণাদি কএক মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যের তেমন তেজ থাকে না। রাজা বল্লাল সেন পুত্রের এই পত্র পাইয়া আর বার তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন তাহার এই পাঠ। অমৃতের আকর স্থান হইয়াছেন যে চন্দ্র তাহার না জানি কি মতে কলঙ্কের কণা যে একটুকু হইল সে কেবল লোকেরদের ভাল মন্দ কর্ত্তা যে ঈশ্বর তাঁহার ইচ্ছাপ্রযুক্ত কিন্তু তাহাতে নানা গুণের নিধি যে চন্দ্র তাঁহার কিছুই হানি নাই কেন না সে কলঙ্ক হওয়াতে কি সে চন্দ্র অত্রি মুনির পুত্র নহেন কিম্বা শিব কি তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করেন না কিম্বা তিনি কি গাঢ়ান্ধকার নষ্ট করিতে পারেন না কিম্বা মনুষ্য লোকের উপরে তিনি কি বাস করিতে পারেন না। এইরূপে পিতাপুত্রেতে পরস্পর সংস্কৃত শ্লোকে উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়াছিল। এইরূপে বল্লাল সেন ১২।৪ বার বৎসর চারি মাস সাম্রাজ্য করিয়া স্বর্গারূঢ় হইলেন। [রাজাবলি—পৃষ্ঠা : ৩৬-৩৭ ; ৪র্থ সং। ১৮৩৮।]

'রাজাবলি' নাম দিয়ে বই সুরু করলেও মৃত্যুঞ্জয় কিন্তু তাঁর বই শেষ করছেন দেখা যায় "রাজতরঙ্গ" নামে। 'রাজাবলি' যে মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক রচনা নয় তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত 'রাজাবলী' নামের একখানা সংস্কৃত পুঁথি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এ সম্পর্কে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার' এক সংখ্যায় বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি'র সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাজাবলীর' অনেক মিল রয়েছে। কোন্ পুরানো বই অবলম্বন করে মৃত্যুঞ্জয় শর্মা রাজতরঙ্গ বা 'রাজাবলি' লিখেছেন, কিছুই অবশ্য বলেন নি তিনি সে সম্বন্ধে। তা ছাড়া, 'রাজাবলি'তে প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের যে বিবরণ পাই তার কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলে মনে হয় না। গল্প বা জন-শ্রুতিসম্বল 'রাজাবলি'তে দেশের প্রাচীন রাজাদের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা প্রকৃত ইতিহাস নয় ;—'ঐতিহাসিক সত্যের অজ্ঞ ও বিকৃত রূপ মাত্র।'

নববাবু বিলাস

ইয়ং বেঙ্গলের প্রথম যুগের কথা।

ইংরেজী হাল-চাল শিক্ষা-দীক্ষা বাঙালী সমাজে সবে আমদানী হতে সুরু করেছে। ইস্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর দৌলতে ভূঁইফোড় যে সব 'বাবু' ধনী-সম্প্রদায় কলকাতা মহানগরীর বুকে দেখা দিয়াছিল তাদের অনেকেই "স্বর্ণকার, বর্ণকার, কর্মকার, চর্মকার, চটকার, পটকার কিম্বা রাজের, সাজের, কাঠের, খাটের, ঘাটের, ইটের সর্দারি, চৌকিদারী, জুয়াচুরী, পোদ্দারি" ইত্যাদি করে সহসা বিস্তর ধনশালী হয়ে ওঠে। হঠাৎ-বড়-মানুষ এ-সব বাবুদের ছেলে-পিলে নব্য বাবুরা আচার-ব্যবহারে আর চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতায় আপন পিতৃ-পুরুষদের যে ছাড়িয়ে যাবে আশ্চর্য্য কি? বিদ্যের দৌড় এঁদের গোটা কতক ইংরেজী অক্ষর লিখতে শেখা আর শ' দুই বুলি কপচান। ইংরেজী নোটকে বলেন এঁরা লোট, বডিগার্ডকে বেনি-গারদ। লৌরি সাহেবকে বলেন নৌরি সাহেব। আর মুখে তো সব সময় লেগে আছেঃ গাডামী, রাসকেল, বেরিগুড, হুট, নানসেন্স, গোটে হেল ইত্যাদি বাক্য। বাংলা ভাষা এঁরা প্রায় বলেন না এবং বাংলা পত্রও লেখেন না। ইংরেজী চিঠিই লেখেন যার অর্থ কেবল তাঁরাই বোঝেন।

উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতায় অর্ধশিক্ষিত ধনাঢ্য 'বাবু' ও 'নব-বাবু'দের এমনি ধারা বহু বাস্তব সামাজিক চিত্র তখনকার সাময়িক পত্রেও দেখা যায়। (দ্রষ্টব্য: 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'—১ম খণ্ড—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮)—ওরফে 'প্রমথনাথ শর্মা' ওরফে 'ভোলানাথ বন্দ্যো-

পাধ্যায়'-এর লেখা 'নববাবুবিলাস' ও 'নববিবিবিলাস' ইংরেজী শিক্ষা ভাল করে প্রচলিত হবার আগেকার কলকাতার হঠাৎ বড় মানুষ বনে-ওঠা অর্ধশিক্ষিত এসব নব্যবাবুদের আচার-ব্যবহার ও নৈতিক জীবনযাত্রার প্রতি সেটায়ার বা ব্যঙ্গ-চিত্র। ভবানীচরণের ওরফে প্রমথনাথ শর্মার 'নববাবুবিলাসে'র নায়ক কলকাতার এমনি এক ধনাঢ্যের অশিক্ষিত নব্যবাবু। নাম জগদ্দুর্লভ বাবু; পিতার নাম রামগঙ্গা নাগ। (রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' 'নববাবু-বিলাসে'র নায়ককে তোতারাম দত্তের পুত্র বাবু কেশবচন্দ্র বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 'কর্ত্তার নিকটে বাবুদিগের বিদ্যার পরিচয়' অধ্যায়ে এবং পরবর্তী 'কুসুম খণ্ডে' শ্রীজগদ্দুর্লভ লেখা রয়েছে।) 'সৎপ্রজা-পালক' ইংরাজ কোম্পানী বাহাদুরের কৃপায় নাগ মশাইয়ের হরেক রকম সওদাগরি কারবার। বেলেঘাটায় রয়েছে চুনের গোলা, জক্‌সেনের ঘাটে থলের দোকান, খাতাবাটীতে মুটের সর্দারীতে প্রায় লাখ দুই টাকার মালিক। অমনি ধনী বড় মানুষের সন্তান শ্রীজগদ্দুর্লভ-বাবু আর তার দুই ভাইয়ের লেখা-পড়া শিখবার প্রয়োজনই বা কি? তবু যথাকালে বাবুদের জন্য গুরুমশাই নিযুক্ত হলেন। কিন্তু বাবুদের পড়া-শুনায় মন নেই। গুরুমশাই যদি শাস্তিবিধান করেন, কর্তাবাবু রুষ্ট হয়ে গুরুমশাইকে শুনিয়ে দেন:

'শুন সরকার তুমি বাবুদিগের শরীরে কদাচ বেত্রাঘাতাদি করিবা না আর ভয়জনক উচ্চভাষাও কহিবা না যেরূপ ক্ষুদ্র লোকের সন্তানদিগকে মারিয়া থাক সদা অনুনয় বিনয় বাক্যেতে তুষ্ট রাখিয়া লেখাপড়া শিক্ষাইবা তুমি রাঢ়দেশী ব্রাহ্মণ কিছুই নীতিজ্ঞান নাই ভাগ্যবান্ লোকের সন্তানদিগকে বাবু বলিতে হয় সর্ব্বদা স্নেহবাক্যে তুষিতে হয় তবে তাহারা সুমেজাজে লেখাপড়া অভ্যাস করে।'

শিক্ষক মাথা নেড়ে সায় দিলেন 'যে আজ্ঞা' বলে। আর বাবুরা তাই শুনে মহানন্দে ঘুড়ি, বুলবুল আর মনিয়া নিয়ে মেতে গেলেন।

এমনি ধারা কিছুকাল বাংলা আর পার্শী ভাষা অনুশীলনের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর বাবুরা ইংরেজী পড়বার জন্য নিজেরাই 'চেষ্টক' হলেন এবং আরাতুন্ পিৎরুস, ডিকরুস, কালস প্রভৃতি সাহেবদের স্কুলে যাওয়া-আসা সুরু করেন। কিন্তু সেখানেও বাবুদের কেউ ভাল মতে বুঝাতে পারে না দেখে কর্তাবাবু একজন সাহেবলোককে বাটীতে চাকর রেখে দিলেন। নব্যবাবুদের বয়স তখন ১৩।১৪ বছর। সাহেবলোকের কাছে বাবুরা বেরিগুড, হুট, ছোট, নান-সেন্স, গোটে হেল প্রভৃতি কতকগুলি বিদেশী বচন শিখলেন আর বাবুরা ইংরেজীতে যে সব পত্রাদি লেখেন তা নিজেরা ছাড়া আর কারো সাধ্যি নেই যে পাঠোদ্ধার করেন। তা দেখেই কিন্তু খোসামুদের দল কর্তাবাবুর নিকট গিয়ে বললেনঃ বাবুদের লেখা বিজ্ঞ বিজ্ঞ ইংরাজেও বুঝতে পারে না এমনি আপনার পুণ্যের ফল। কর্তা খোসামুদের কথায় খুসী হয়ে বাবুদের লেখা-পড়া ছাড়িয়া এবার বিষয়-কর্মে নিয়োগ করলেন। নববাবু যেন হাতে স্বর্গ পেলেন।

মানিয়া বুলবুল আখড়াই গান,
খোষ পোষাকী যশমী দান,
আড়িঘুড়ি কানন ভোজন,
এই নবধা বাবুর লক্ষণ।

এই নবধা লক্ষণ লাভ করে আমাদের নব্যবাবু এবার সত্যি সত্যি ফুলবাবু হয়ে উঠলেন। আপন মর্জিমাফিক যানবাহন, পরিচ্ছদ তৈয়ারী করে যেখানে সেখানে যাওয়া-আসা করতে লাগলেন। খোসামুদে আর তোষামুদে ইয়ার বন্ধু পরিবৃত হয়ে বিলাস-সাগরে ডুব দিলেন,

ইয়ারদের মধ্যে খলিপা হোল নববাবুর পরম পেয়ারের। খলিপার সঙ্গে নববাবু কখন বাগানে, কখন নিজ ভবনে নানা জাতীয় বিলাসিনীদের নিয়ে এসে মজা লুটতে লাগলেন।

এমনি ধারা ক'দিন বা আর চলে? বাবুর পুঁজিতে টান পড়ল। খলিপার পরামর্শে নববাবু তখন হ্যাণ্ডনোট লিখে মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করতে লাগলেন। অবশেষে গিন্নীর (বিয়েব পর আপন পরিণীতার সঙ্গে বাবুর এই প্রথম সাক্ষাৎ) কাছে গিয়ে ধর্ণা দিলেন অলঙ্কারের আশায়। আপন স্ত্রীর গায়ের সেই গয়না দিয়ে বাবু দিন কয়েক বাইরে মজা লুটে বেড়ালেন। তাও যখন ফুরিয়ে গেল, পাওনাদাররা তখন নববাবুকে পাকড়াও করে কয়েদ করে পাঠাল শ্রীঘরে। এখানেই নববাবুবিলাস উপাখ্যানের শেষ। কিন্তু নীতিবাগীশ ভবানীচরণ এখানে থামেন নি। নববাবুর শেষ পরিণতিটুকুও দেখিয়েছেন নববাবুর খেদোক্তি আর জ্ঞান উপদেশের মারফত।

এ হোল নববাবুবিলাস গ্রন্থের মূল আখ্যায়িকা। প্রথমে পয়ার ছন্দে গণপতি ও সরস্বতী বন্দনার পর গ্রন্থের সুরু। পুরো বইখানি চার খণ্ডে—অঙ্কুর, পল্লব, কুসুম ও ফল—এ চার খণ্ডে—বিভক্ত। অঙ্কুর খণ্ডে গুরুমহাশয়ের বৃত্তান্ত, গুরুমহাশয়ের নিকটে বাবুদিগের বিদ্যাভ্যাস রীতি, কর্তার নিকটে বাবুদিগের বিদ্যার পরিচয়, খোসামুদের বৃত্তান্ত, মুন্সী বৃত্তান্ত, স্কুল-মেষ্টরের বৃত্তান্ত প্রভৃতি অধ্যায় রয়েছে।

'নববাবুবিলাসের' লেখক শ্রীপ্রমথনাথ শর্মা ভবানীচরণেরই ছদ্মনাম, যেমন 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর লেখক টেকচাঁদ ঠাকুর প্যারীচাঁদ মিত্রেরই ছদ্মনাম। এর প্রকাশ কাল লঙ সাহেবের তালিকা মত ১৮২৩ খৃস্টাব্দ। অর্থাৎ, 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর প্রকাশের

পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে। লঙ্‌ সাহেব তাঁর পুস্তক তালিকায় 'নববাবু-বিলাসকে '৩০ বছর আগেকার কলিকাতার বাবু সম্পর্কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার্থক ব্যঙ্গ রচনা' বলে লিপিবদ্ধ করেছেন।

বিলেতী আদর্শে নভেল বা উপন্যাস বলতে যা বোঝায় বাংলা সাহিত্যে তার সূত্রপাত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' থেকে ধরা হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গীণ উপন্যাসের সর্বপ্রথম রচয়িতার গৌরব প্যারীচাঁদের প্রাপ্য হলেও ভবানীচরণ হলেন তাঁর পথ-প্রদর্শক। তিনি বাংলা বিদ্রূপাত্মক উপন্যাসের প্রবর্তক। 'আলালের ঘরের দুলালে'র আদর্শ যে 'নববাবু বিলাস'—দুটি বইয়ের আখ্যানবস্তু আলোচনা করলেই সেটা দেখা যায়। হঠাৎ বড়লোক জমিদার বাবুরামবাবুর আস্কারা পাওয়া জ্যেষ্ঠপুত্র মতিলাল বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারে এবং চরিত্রহীনতার দিক থেকে যে নববাবু জগদ্দুর্লভের সগোত্রীয় অনুজ তা 'আলালের ঘরের দুলাল' পাঠে জানা যাবে। দু'খানি বইতেই বড়লোকের ছেলেরা বাল্যকালে পিতামাতার অনুচিত প্রশ্রয় পেয়ে এবং সৎ শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়ে কিরূপ বিগড়ে যায়, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কুক্রিয়া কিরূপ বৃদ্ধি পেতে থাকে, বড়লোকের ছেলের সঙ্গে বদ্‌লোক জুটে তাকে অধঃপতনের দিকে কি ভাবে এগিয়ে দেয়—এ দু'বইতেই তা সুন্দরভাবে চিত্রিত করা হয়েছে।

[ভবানীচরণের গদ্যের নমুনা হিসাবে এই বই থেকে কিছু অংশ দেওয়া গেল।]

সেকালে গুরুমহাশয়ের নিকট বাবুদিগের বিদ্যাভ্যাস রীতির নিদর্শন :

"প্রথমতঃ তালপত্রস্থিত কণ্টকবিনির্ম্মিত চতুস্ত্রিংশদক্ষরে মাস-চতুষ্টয়ে মাসপঞ্চকে বা লেখন দ্বারা কাঁচাদি নির্ম্মিত বিচিত্র বিচিত্র

পাত্রস্থিত মসি প্রদানাধীন বাবুদিগের হস্ত বশ হইয়া থাকে তৎপরে মাসদ্বয় মাসত্রয়স্থা ঐ বালক বাবুসকল রীতিবৈপরীত্যেন অক্ষর লিখিয়া থাকেন তদনন্তরে রীত্যনুসারে অক্ষর লিখিলে বানান আঙ্ক আস্ক ইত্যাদি শিক্ষা কারণ বাবুগণে বহু দিনে গুরুমহাশয়ের অনেক যত্নে শিক্ষা করেন পরে কৃষ্ণ রাম গোবিন্দ নারায়ণ বাসুদেব ইত্যাদি নাম লেখাইয়া থাকেন নামাভ্যাস হইলে যথাক্রমে অঙ্কাক্ষর প্রথমে কড়াকে গণ্ডাকে বুড়িকে চৌউকে নামতা পর্য্যন্ত তৎপরে কদলীপত্রে তেরিজ জমাখরচ জমাবন্দি প্রভৃতি এবং কড়ি যথা ত্রিবেণীতে তিরোধারা গঙ্গাভাগীরথীতে। পাটনি পাতিল খেয়া পার হইয়া যাইতে। ঋষি মুনি প্রতি বট দিলো জনে ২। পার হইয়া গেল তারা স্বর্গ আরোহণে॥ পাটনি পাইল তঙ্কা দিয়ে গেল ঋষি। তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার নয় শত আশি। ইত্যাদি ফকিকা অর্থাৎ ফাঁকি ও আ তে ভবতুসুপ্রীতা ইত্যাদি শ্লোক শিক্ষা করান কিন্তু বাবু সকল আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শিক্ষা করেন ইহাতে শিক্ষাকার যদ্যপি বাবুদিগের শরীরে স্বল্প বেত্রাঘাতাদি করেন কিম্বা ভয়জনক বাক্য কহেন তবে কর্ত্তা মহাশয় রুষ্ট হইয়া কহেন শুন সরকার তুমি বাবুদিগের শরীরে কদাচ বেত্রাঘাতাদি করিবা না আর ভয়জনক উচ্চভাষাও কহিবা না যেরূপ ক্ষুদ্র লোকের সন্তানদিগকে মারিয়া থাক সদা অনুনয় বিনয় বাক্যেতে তুষ্ট রাখিয়া লেখাপড়া শিক্ষাইবা তুমি রাঢ়দেশী ব্রাহ্মণ কিছুই নীতিজ্ঞান নাই ভাগ্যবান্ লোকের সন্তানদিগকে বাবু বলিতে হয় সর্ব্বদা স্নেহবাক্যে তুষিতে হয় তবে তাহারা সুমেজাজে লেখাপড়া অভ্যাস করে নতুবা মারপীট করিলে মেজাজ খারাপ হয় শিক্ষককে কর্ত্তা এইরূপ আজ্ঞা দিলেন শিক্ষাকার কহিলেন যে আজ্ঞা মহাশয় এক্ষণে তাহাই করিব বাবুগণে এইকথা শ্রবণে মহা আনন্দ মনে প্রায় ঘুড়ি বুল ২ মনিয়া খেলাইতে রতি যদি

কদাচিৎ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পাঠশালায় আসিয়া বৈসেন ইহাতে যেরূপ বাঙ্গালা বিদ্যোপার্জন হইয়াছে তাহা লেখাতে কেবল লিপি বাহুল্য মাত্র হয়।..."

এবার—কর্ত্তার নিকটে নববাবুদিগের বিদ্যার পরিচয়ঃ

"বিদ্যাভ্যাসানন্তরে শিক্ষাকার বাবুদিগের নিজ সমিভ্যারে লইয়া কর্ত্তা মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন আর কহিলেন মহাশয় আপন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক নাম অঙ্কাদি জিজ্ঞাসা [করিয়া] বাবুদিগের বিদ্যার পরিচয় লউন কর্ত্তা কহিলেন আপন ২ নাম লেখ প্রথম বড়বাবু আপন নাম লিখিতেছেন উচ্চৈঃস্বরে শ্রী লেখ জ লেখ গ লেখ ত লেখ দ লেখ ল লেখ র লেখ ইহাই লিখিয়া পাঠ করিলেন শ্রীজগদ্দুল্লভ তৎপরে মধ্যম বাবু ঐ প্রকার শ্রী রাদা বলদ অর্থাৎ শ্রী রাধা বল্লভ নাম হইল পরে ছোটবাবুকে কহিলেন তুমি আমার সহিত অন্তঃপুরে চল সেই স্থানে যাইয়া গৃহিণীকে কহিলেন বাবুদিগের কি প্রকার বিদ্যা হইয়াছে তাহা শুন তিনি কহিলেন আমি গবাক্ষর দ্বারা অর্থাৎ জানালা দিয়া সকল দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি ছোট পুত্রকে কহিলেন লেখ দেখি আমি যে নাম কহিলাম ছোটবাবু কহিলেন গুরুমহাশয় আমাকে এ নাম লেখান নাই গৃহিণী কহিলেন তুমি কেন শিক্ষাইয়া দেও না সেই বাক্যানুরোধে শিক্ষাইতেছেন শ্রী লেখ ক লেখ এক দাঁড়ি ফেল খ লেখ গ তে সাবঘোড় ওকার দেও আর ম তে হ্রস্বউকার একটু নীচে টানিয়া দেও ইহা লেখাইয়া পাঠ করাইলেন শ্রী রত্নেশ্বরী কর্ত্তা মহাশয় লিখিত নাম দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া অঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন একুইশ কড়ার কড়া নামে হাতে হইলো কত পাঁচ গণ্ডা ইত্যাদি পরিচয়ানন্তর শ্লোক যথা অবতু বো গিরিসুতা শশিভৃতঃ প্রিয়তমা॥ বসতু মে হৃদি সদা ভগবতঃ পদযুগং অস্যার্থঃ। শশিভৃৎ মহাদেবের

উত্তমাঙ্গস্থিতা। তোমারদিগের রক্ষা করুন হিমালয়সুতা। মম হৃদি বাস করুণ ভগবান্ আসি। প্রার্থনা আমার মনে এই ভালবাসি। এই শ্লোক গুরুমহাশয় কিরূপ শিক্ষা করিয়াছেন তাহা প্রায় সকলেই জ্ঞাত আছেন তথাপি লিখি যথা অবু তবু গিরিসুত মায় বলে পড় পুত পড়িলে শুনিলে হুদিভাতি না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি শ্লোক শুনিবা মাত্র কর্ত্তা আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইলেন।"

অথ খোসামুদে অমাত্য বৃত্তান্ত

"ইতোমধ্যে অমাত্যবর্গেরা কহিলেন বাবুরদিগের যেরূপ বুদ্ধি ও মেধা এরূপ প্রায় দৃষ্টচর নহে আমরা পাঠশালায় দেখিয়াছি অঙ্কের সঙ্কেত দেখাইবা মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং শ্রবন মাত্রই শ্লোক অভ্যাস করেন ইহারা মহাশয়ের নাম সম্ভ্রম ও কুলোজ্জ্বল করিবেন আর কহিলেন বাঙ্গলা লেখাপড়া একপ্রকার হইয়াছে আর যদি কিছু অপেক্ষা থাকে তাহাও হইয়া উঠিবেক আপনারদিগের জাতি বিদ্যা আর এমনি এ বংশের গুণ আছে না পড়িলেও বিদ্যা হয় সংপ্রতি এই অবধি পারসা পড়ালে ভাল হয় কর্ত্তা কহিলেন আমিও মনে মনে স্থির করিয়াছি যে এক বেলা বাঙ্গলা এক বেলা পারসী পড়াইলে ভাল হয় অমাত্যেরা কহিলেন উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন ইত্যাদি অনেক খোসামোদের কথা কহিতে লাগিলেন এই নিমিত্ত তাহারদিগেরও কিছু গুণবর্ণন করি যথা কিবা দিবা কিবা নিশি, কর্ত্তার নিকটে বসি, অভাগা আছেন ছায়াপ্রায়। অপূর্ব্ব বসন পরি, নাম-মালা হাতে করি, গালগল্পে কেবল কাল যায়॥ রক্তযুত তন্তু গুচ্ছ, রঞ্জিত মালার পুচ্ছ, নামের সম্পর্ক নাই তাতে। কেবল কর্ত্তার হিত, করে থাকেন যথোচিত, তুষ্ট করেন মিষ্ট বচনেতে॥ মধুপান সদা করেন, কৌতুকে কাল হরেন, ধর্ম্মের নাহিক কিছু লেশ।

লোকে করি আশা দান, কেবল লোকের অপমান, করি করেন অধর্ম্মের শেষ॥ যদি কোন বিজ্ঞতম, লোকের হয় সমাগম, আলাপন নাহি তার সাথে। যদি কোন কথা কয়, সে কথা না মেনে লয়, মগ্ন কেবল কত বচনেতে॥ কেবল কর্ত্তামনোনীত, হিতাহিত যথোচিত, বচনেতে কর্ত্তাকে ভুলায়। কর্ত্তা বলেন কাকে বক, হাঁ মহাশয় এই হক, এইরূপ তাবৎ কথায়॥ কর্ত্তা যদি কোন মতে, লোকে কিছু বলেন দিতে, অমাত্য বলেন ভাল হবে। দিতে হয় দেওয়া যাবে, লোকে বলেন তুমি পাবে, তিন দিন বিলম্বে আসিবে॥ এইরূপ প্রবঞ্চনা, ধর্ম্মা ধর্ম্ম বিবেচনা, মনে ২ কিছুই করে না। পাপ পুণ্য সম ভাব, করি কিছু করে লাভ, পরকাল নাহিক ভাবনা॥ এরূপ গুণ ধাম অমাত্য সহিত পরামর্শ করিয়া কহিলেন ওহে ধরের পো, একজন মোছলমান মুনসী তত্ব করিয়া আনহ যে আজ্ঞা বলিয়া ধরের পো গমন করিলেন॥”

অথ মুনসী বৃত্তান্ত

“বহু অন্বেষণ করিয়া যশোহরনিবাসী এক মুনসী সমিভ্যারে লইয়া আগমন করিলেন কর্ত্তা কহেন শুন মুনসী আমার সন্তানদিগকে পারসী পড়াইবা এবং বহির্দ্বারে থাকিবা যে দিবস বাবুরা কোন স্থানে নিমন্ত্রণে যানারূঢ় হইয়া গমন করিবেন সঙ্গে যাইবা মায় খোরাকি তিন তঙ্কা পাইবা ইহা শুনিয়া যশোহর নিবাসী মুনসী প্রস্থান কবিলেন তৎপরে নাটুর ফরিদপুর, ঢাকা, ছিলহট্ট, কুমিল্লা, বড়ন, বরিশাল ইত্যাদি দেশী মুনসী প্রায় মাসেক তুই মাস গমনাগমন করিলেক কর্ত্তা তাহারদিগের জবাব দিলেন কহিলেন তোমারদিগের জবান দোরস্ত নহে অর্থাৎ বাক পরিষ্কার নহে কর্ত্তাটীর কাছে কি কেহ পারসী কথা বা হিন্দী কথা কহিয়া খোসনাম পাইতে পারেন তিনি অনর্গল

অনর্গল অনন্তর চট্টগ্রাম নিবাসী অপূর্ব্ব মিষ্টভাষী এক উপযুক্ত মুনসী তিনি বোট আপিসের মাঝি ছিলেন, এক সার্টিফিকিট দেখাইলেন কর্ত্তার যেরূপ বিদ্যা তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি তাহাতেই সুবিদিত আছেন, কর্ত্তা মহাশয় ঐ ইংরাজী লিখিত সার্টিফিকিট পাঠ করিয়া বলিলেন যে অনেক দিবসাবধি এ ব্যক্তি মুনসীগিরি কর্ম্ম করিয়াছে তাহাতে লেখা আছে, যে এ ব্যক্তি মাঝি বড় ভাল মনুষ্য এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছে এ প্রযুক্ত আমার কর্ম্ম হইতে ছাড়াইল, কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কতকাল এ সাহেবের নিকট চাকর ছিলে, মুনসী কহেন উহাতে লেখা আছে আপনি দেখিবার চান তো দেখুন; কর্ত্তা কহিলেন হাঁ ২ আছে বটে, কোন্ সাহেবের কর্ম্ম করিতে, আজ্ঞা কর্ত্তা, বালবর কোম্পানি, কোম্পানির মুনসী শুনিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন পরে মাঝি পূর্ব্বলিখিত বেতনে সেই সকল কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। পর দিবস বাবুদিগের পাঠ আরম্ভ হইল। অতি সুক্ষ্ম বুদ্ধিপ্রযুক্ত দুই বৎসর মধ্যেই প্রায় করিমা সমাপ্তি করিলেন, গোলেস্তাঁ বোস্তাঁ আরম্ভ করিয়া ইংরাজী পড়িবার নিমিত্ত বাবুরা স্বয়ং চেষ্টক হইলেন বয়ঃক্রম প্রায় তের চৌদ্দ বৎসর হইয়াছে, ইংরাজী কাহার নিকট পড়িবেন ইহার চেষ্টায় কখন আরাতুন, পিৎরুস, ডিকরুস, কালস ইত্যাদি সাহেবের ইস্কুলে গমনাগমন করেন, কিন্তু বাবুদিগের কেহ ভালমতে বুঝাইতে পারেন না, ইহা শুনিয়া কর্ত্তা কহিলেন তবে একজন সাহেবলোক বাটীতে চাকর রাখিতে হইল, পরে ধরের পো অন্বেষণে চলিলেন॥"

অথ স্কুল মেষ্টরের বৃত্তান্ত

"কোন হিন্দুস্থানী বেশ্যা অথবা মেথরানী গর্ভজাত একজন সাহেব আনিয়া বাবুদিগের পাঠ করণ নিযুক্ত করিলেন। সাহেবের মেজের

সজ্জা এবং খানা ও টিফিন খাওয়া দেখিয়া বাবুদিগেরো প্রায় তদনুরূপ ব্যবহার হইল আর সাহেবের সহিত সর্ব্বদা কথোপকথন দ্বারা গাডামী, রাসকেল, বেরিগুড, হুট, ছোট, নানসেন্স, গোটে হেল এইরূপ কথকগুলিন কথা অভ্যাস করিয়া বাঙ্গালা কথায় মিশাইয়া কহিতে লাগিলেন এবং দুই একখান ইংরাজী চিঠি পাঠ করিতে পারেন এবং ইংরাজী ভাষাতে কোন লোক কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ঐ সাহেবের মত শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক উত্তর করেন, যথা, তোমার পিতার নাম কি, টোটারাম ডট্ট অর্থাৎ তোতারাম দত্ত, আর বাবু সকল যেরূপ ইংরাজী পত্রাদি লিখিয়া থাকেন তাহা অন্য কাহারও সাধ্য নাই যে পাঠ করেন, বাবু বুঝিতে পারেন, এই প্রকার বিদ্যা প্রচার হওয়াতে খোসামুদেরা কর্ত্তার নিকট কহেন বাবুদিগের লেখা বিজ্ঞ ২ ইংবাজেও বুঝিতে পারেন না। এ সকল আপন পুণ্য প্রকাশ, যেরূপ বিদ্যা হইয়া উঠিল অনুসন্ধান করিলে প্রায় এরূপ বিদ্যা ও বুদ্ধি পাওয়া ভার, আশীর্ব্বাদ করি চিরজীবী হইয়া থাকুন, প্রাতবাক্য লেখক কহে এমত বিদ্বান সন্তান বাঁচা ভার। অমাত্যের বাক্যে কর্ত্তার হৃদপদ্ম প্রফুল্ল হইল পরে লেখাপড়া পরিত্যাগ হইল বিষয়কর্ম্ম করিবার বয়েস হইয়াছে এক্ষণে সেই ধূমে পড়িলেন তাহার উদ্যোগ ইহার বিশেষ পল্লব খণ্ডে প্রদান হইবেক ॥"

এখানে 'নববাবুবিলাসের অঙ্কুরখণ্ডঃ সমাপ্ত হয়। অতঃপর দ্বিতীয় খণ্ডের সুরু।—অর্থাৎ বাবুরূপ বৃক্ষের পল্লব ভবানীচরণ তাঁর সাবলীল ভঙ্গিতে এ পল্লবখণ্ডের বিবরণ দিচ্ছেন :

"বাবুসকল আপন ২ পছন্দমত যান বাহন পরিচ্ছদ অর্থাৎ পোষাক প্রস্তুত করিতেছেন যথা পালকী পেয়াদা ছাতা পিনীস পানসী গাড়ি জামা-যোড়া চাপকান পাজামা, পাপেষ পাগড়ী আমামা, লাডুদার, মোড়াসা, চাকা বাকা ইত্যাদি বিবিধ প্রকার উত্তম ২ পোষাক প্রস্তুত

হইল আপন আপন স্বেচ্ছামত পোষাক পরিধান পূর্ব্বক দরবার অর্থাৎ কুঠি যাইবেন কেহ গাড়িতে কেহ পাল্কীতে আরোহণ করিয়া গমন করিলেন প্রথমে টালা কোম্পানি টেলর কোম্পানি ইত্যাদি দুই তিন নীলাম ঘরে যাতায়াত করিয়া বড় আদালতে উপস্থিত হইলেন ছোট আদালতে যাইবার যো নাই কারণ জুতার ভয় পল্লিগ্রামস্থ বাবুগণের পানসীতে আরোহণ করিয়া বাকবাজারের ঘাটে পানসী রাখিয়া আর দক্ষিণ অঞ্চলের বাবুরা অপূর্ব্ব ২ ছকড়া-সকলে আরোহণ পূর্ব্বক সদরদেয়ানী কোর্ট আপিল প্রভৃতি আদালতে গমন করিয়া আদালতের রীতিজ্ঞ অর্থাৎ আইন খবরদার হয়েন বেলা দুই প্রহর দুই ঘণ্টান্তর তিন ঘণ্টা হইলেই বাটী যাইবার উদ্যোগ করেন যাইবার কালে চীনাবাজার বেড়াইয়া চলিলেন ঘরে গিয়া পোষাক পরিত্যাগ মিষ্টান্ন জলপান করিয়া বৈঠকখানায় চমৎকৃত হস্তপরিমিত উচ্চ গদির উপর বসিলেন কাহার দুই কাহার চারি পাশবালিশ আছে, পিতলবান্ধা কেহ বা রূপাবান্ধা, কেহ সোনাবান্ধা হুঁকাতে, কেহ গুড়গুড়িতে, কেহ বা আলবোলাতে তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন, পানের বাটা থাকেন, মধ্যে মধ্যে বামহস্তে দুই একটা মসলা বদনে [দেন], নানাবিধ খোসামুদে তোষামুদে বরামুদে বহুবলে রমণীমেলক গাওক বাদক নর্ত্তক নর্ত্তকী ভণ্ডপ্রতারক এয়ার উমেদওয়ার দালাল মহাজন নবীন বাবুদিগের নাম শুনিয়া যাতায়াত করিতে লাগিলেন বাবুসকল দ্বিতীয় ইন্দ্রতুল্য হইয়া বসিয়াছেন কেহ কেহ বাবু কিবা ধীর কি গভীর কেহ বলে বাবুর কিবা পাণ্ডিত্য কি বক্তৃতার তাৎপর্য্য জ্ঞান হয় সাক্ষাতে সরস্বতী কেহ কেহ কিবা সুধারা কি রসিকতা এমত প্রায় সম্ভব হয় না কেহ যদি আদালতের কথা জিজ্ঞাসা করেন তাহাকে পরামর্শ দানে তুষ্ট করেন আর অনেককে তাহারদিগের চাকরি করিয়া দিব

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিচার শ্রবণে কখন ২ আমোদিত হয়েন শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন, ইহাতে পণ্ডিত মহাশয়েরা কহেন বাবু প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। ঐ সকল লোকের মধ্যে দুই একজন বাবুর অতি প্রত্যাশাপন্ন হয়েন, তাহারা পুরাতন বিলক্ষণ জুয়াচোর হরেক রকম কথার ধারা ও ব্যবহার জ্ঞাত আছেন বিদ্যাভিন্ন যে কোন বিষয়ে বাবু তুষ্ট থাকেন এমত চেষ্টা সর্ব্বদাই করেন, যদি বাবুর মনস্থ বুঝিতে পারেন, তবে ছায়াপ্রায় সর্ব্বদা খোসামদি করিয়া মিষ্টবাক্যে বাবুকে তুষ্ট রাখেন, দেখিলেন বাবু আমার কথাব্যতিরেক কিছুই না করেন শেষে ক্রমে ২ বাবুগিরির লক্ষণ বিলক্ষণ রূপে উপদেশ করেন শুন বাবু টাকা থাকিলেই বাবু হয় না ইহার সকল ধারা আছে আমি অনেক বাবুগিরি করিয়াছি এবং অনেক বাবুগিরি জারিজুরি করিয়াছি এবং অনেক বাবুর সহিত ফিরিয়াছি রাজা গুরুদাস রাজা ইন্দুনাথ রাজা লোকনাথ তনু বাবু রামহরি বাবু বেণীমাধব বাবু প্রভৃতি ইহাদিগের মজলিষ শিক্ষাইয়াছি এবং যেরূপে বাবুগিরি করিতে হয় তাহাও জানাইয়াছি এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত, তথাপি দিবারাত্রি বাহিরেই থাকি বাটীর কোন এলাকা রাখি না, সে যাহা হউক, সম্প্রতি শ্রীশ্রীপ্রসাদে তোমার পবিত্র চরিত্র দেখিয়া বাঞ্ছা হয় যে তোমার নিকট থাকি আর তুমি যেরূপে উত্তম বাবু হও এমত শিক্ষা করাইলে আমার মনস্থ বটে, আপন সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া বাবুগিরি শিক্ষা করেন।…"

এবার ফল খণ্ডের অর্থাৎ নবধা বাবুরূপে বৃক্ষের ফল বর্ণনা ঃ

"ফলের কিঞ্চিৎ বর্ণন করি, বিচক্ষণ বাস্তবিক বাবু মহাশয়েরা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করিবেন। প্রথমে এক ফল এক মহাজন টাকার নিমিত্তে লোক পাঠাইলেক, বাবু কহিলেন লোট বদল করিয়া দিব। লোট বারম্বার ফেরাফেরি হইয়াছে অনেক টাকা

পাওনা হইল, তাহারা সে কথা শুনিয়া ওয়ারিণ করিলেক। খলিপা কহিলেন, একি হয় পেয়াদা লইয়া যায়। তিনি কহেন চিন্তা কি, যাও না কেন। তাহারা বাবুকে জেহেলখানায় লইয়া গমন করিল মোসাহেব লোক কে কোথায় পালাইল, সুর বাবু বাটী প্রস্থান করিলেন, পরে সন্ধ্যাকালে একজন লোক আসিয়া বাবুর পিতা কৰ্ত্তা মহাশয়কে সংবাদ করিলেক মহাশয় আপনকার পুত্র বাবু জেহেলে কয়েদ হইয়াছেন সে স্থানে নিরাসন বসিয়াছেন অতএব বিছানা ও বালিশ পাঠাইলে ভাল হয়। কৰ্ত্তা ঐ লোকের প্রমুখাৎ তাবদ্বিষয় অবগত হইলেন, পরে বাবুর সতী এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কিরূপ মনে২ খেদ করিতেছেন তাহা শ্রবণ করুন ॥…"

'নববিবিবিলাস'ও ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। এর মুদ্রণকাল অনুমানিক ১৮৩০ সাল। 'নববিবি-বিলাস' বাবু বিলাসেরই পরিপূরক। এর আখ্যাপত্র নিম্নরূপ:

নববিবিবিলাস

অর্থাৎ

কুলটাবর্গে কুলকামিনীর দুঃখ প্রকাশ যথা অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী মধ্যে ভবতি কুটিনী সর্ব্বশেষে সর্ব্বনাশে সারং ভবতি টুক্‌কনী।

এতদ্‌বৃত্তান্ত বিস্তৃত গ্রন্থ ॥

অঙ্কুর ও পল্লব ও কুসুম ও ফল এই খণ্ড চতুষ্টয়ে কুলটাগঞ্জন ছলে কুলটার সন্দেহভঞ্জন ও মনোরঞ্জন ও জ্ঞানাঞ্জন নিমিত্তে শ্রীযুত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। 'নববাবুবিলাসে'র মত প্রারম্ভে গণেশ, গুরু ও সরস্বতী বন্দনা করে লেখক ভূমিকায় জানাচ্ছেন:

'যদ্যপি নববাবু বিলাসে নববাবুদিগের স্বভাব সুপ্রকাশ আছে, কিন্তু সে গ্রন্থের ফল খণ্ডে লিখিত ফলের প্রধান মূল বাবুদিগের বিবি, সেই বিবিরূপ প্রধান মূলের অঙ্কুরাবধি শেষ ফল তাহাতে সবিশেষ ব্যক্ত হয় নাই এ নিমিত্তে তৎপ্রকাশে প্রয়াস পূর্ব্বক নব-বিবিবিলাস নামক এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।'

'নববিবিবিলাসে' গোঁড়া সনাতনপন্থী ভবানীচরণ তখনকার সামাজিক পঙ্কিলতার স্বরূপ প্রকাশে হালের সুর-রিয়ালিষ্ট লেখকদেরও হার মানিয়েছেন। তাঁর 'নববিবি'র বিলাপ 'নববাবু'র শেষ পরিণতির খেদোক্তিকে পর্যন্ত ছাপিয়ে যায়।—

"আমার দুঃখের কথা করি নিবেদন।
শুনিয়া সতর্ক হও কুলনারীগণ ॥
অন্য ঘরে চুরি দেখে গৃহস্থ যেমন।
সাবধানে রক্ষা করে আপনার ধন ॥
তেমতি আমার এই অধর্ম্মের ফল।
দেখিয়া তোমরা শিক্ষা করহ সকল ॥
ধর্ম্ম রক্ষা কর সবে হইও না অসতী।
অসতী হইলে পাবে অশেষ দুর্গতি।..."

ভবানীচরণ ওরফে ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে আর সার্থক রস-শিল্পী নন, নীতি-বাগীশ গোঁড়া সমাজ-সংস্কারক সাংবাদিকের ভূমিকায় যেন অবতীর্ণ!

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা

গল্প হলেও সত্যি !

তখনকার আমলে ধনাঢ্য জমিদার বাড়ী। একবার কি একটা ক্রিয়া উপলক্ষে এক ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে দান করা হয়েছিল একটি গাভী। গো-বৎসটিব জন্য যথারীতি একটা মাসোহারাও ব্যবস্থা ছিল। তবু আজ খোল নেই, কাল ভূষি নেই, পরশু ঘাস নেই বলে ব্রাহ্মণঠাকুর রোজই জমিদারবাড়ী এসে অতিরিক্ত টাকাকড়ি চেয়ে-চিন্তে নিতেন।

এমনি যায় কিছুদিন। একদিন হয়েছে কি, জমিদারবাবু দেখলেন দানের গাভীটি দড়িছিঁড়ে ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকছে তাঁদের গোয়াল-ঘরে আর তার পেছনে আসছে সাক্ষাৎ যমদূতের মত মূর্তিমান এক কশাই। জমিদারবাবু তো অবাক্। কশাইয়ের মুখে তিনি ব্যাপারটা সব শুনে নিলেন। গরুটি নাকি তারই। এক বামুনঠাকুর তার কাছে বেচে দিয়েছে। দড়ি ছিঁড়ে দুষ্টু গাইটি এখন হুজুরের গোয়ালে ঢুকে পড়েছে।

উপায় কি, চড়া দাম চুকিয়ে দিয়েই বিদায় করতে হোল কশাইকে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয় গল্পের। পরদিন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এসে হাজির হলেন বরাদ্দ মাসোহারার জন্য। জমিদারবাবু তখন করলেন কি, ধারাল একখানা কাঁচি দিয়ে কেটে নিলেন ঘ্যাঁচ করে বামুন-ঠাকুরের দোলায়মান শিখাগুচ্ছটি। তখন থেকে জমিদারবাবুটির নাম রটে যায় 'টিকি-কাটা জমিদার' বলে। তাঁর আলমারিতে নাকি তিনি এমনিতরো বহু বিদ্যাবাগীশ আর বিদ্যারত্ন-শিরোমণি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 'কর্তিত শিখাগুচ্ছের' দিব্য এক প্রদর্শনীরও আয়োজন করেছিলেন।

আমাদের এই ডাকসাইটে টিকি-কাটা জমিদারটি হলেন স্বয়ং কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০ খৃঃ)। কালীপ্রসন্ন ছিলেন ভণ্ডের যম। সব-রকমের নীচাশয়তার পরম শত্রু। দুর্নীতিদুষ্টসমাজের প্রতি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে ও বিদ্রূপে তিনি ছিলেন মুখর। কি সমাজে কি সাহিত্যে গলদ দেখলেই আর নিস্তার নেই। তিনি তার মুখোস দিতেন খুলে শাণিত নির্মম কশাঘাতে। একশ' বছর আগেকার কলকাতা ও তার আশেপাশের সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার নিঁখুৎ কি চিত্রটিই না ফুটে উঠেছে তাঁর ধারাল লেখনীর মুখে। আর তা এখনকার পারিপার্শ্বিকে কি-ই- না বাস্তববাদী! কালীপ্রসন্ন সিঙ্গীমশাই সত্যি একশ' বছর আগে জন্মেও এক শ' বছর পরবর্তী যুগের পরি-প্রেক্ষিতে গেছেন সাহিত্য রচনা করে।

মূল সংস্কৃত থেকে মহর্ষি বেদব্যাসের অষ্টাদশপর্ব মহাভারত প্রাঞ্জল গদ্যে অনুবাদ করে তা ছাপিয়ে বিনামূল্যে ও বিনা মাশুলে বিতরণ করা কালীপ্রসন্ন সিংহের মস্ত একটা কীর্তি। কিন্তু বাংলা গদ্য সাহিত্যে এর চাইতেও বড় অবদান হোল অনবদ্য তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা।' 'হুতোম প্যাঁচার নক্শার' যে কপিটি (২য় সং) বেলভেডিয়ার 'জাতীয় পাঠাগারে' আছে তার আখ্যাপত্র হোল ঃ

হুতোম প্যাঁচার নক্শা। /(প্রবন্ধ কল্পনা।)/প্রথম ভাগ।/শ্রীতালা হুল্ ব্ল্যার্ক-ইয়ার কর্তৃক/প্রচারিত ।/আশমান/১৭৮৪ শকাব্দ/

আর তার উৎসর্গ পত্রটি হোল ঃ

সহৃদয় কুলচূড় শ্রীল শ্রীযুক্ত মুলুকচাঁদ শর্ম্মার/বাঙালী সাহিত্য ও সমাজের প্রিয়-চিকীর্ষা নিবন্ধন/ বিনয়াবনত/দাস/শ্রীহুতোম প্যাঁচা কর্তৃক/(তাহার এই প্রথম রচনাকুসুম)/শ্রীচরণে অঞ্জলি প্রদত্ত হইল।/

বইখানি সচিত্র। দুখানা লাইন-ব্লকও আছে। একটি হোল: 'হুতোম প্যাঁচা আশমানে বসে নক্‌শা উড়াচ্চেন' আর অপরটি—'ঠনঠনের হঠাৎ অবতার!'

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' খণ্ড খণ্ড আকারে প্রথম প্রকাশিত হতে থাকে (১৮৬১-৬২ সালে)। এর প্রথম খণ্ড 'চড়ক' মাত্র ১৬ পাতার চটি বই। প্রকাশ কাল (১৮৬১?)। আখ্যাপত্রে ভবভূতির উদ্ধৃতি আছে। 'আশমানস্থ' রাম-প্রেসে মুদ্রিত নং ৮৪ হুঁকো রাম বসু ইষ্ট্রীট। দাম বেজায় সস্তা—পয়সায় দু-দুখানা করে। 'বিজ্ঞাপনে' হুতোম প্যাঁচা গাল ফুলিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে:

"হুতোম প্যাঁচা এখন মধ্যে মধ্যে ঐরূপ নক্‌শা প্রস্তুত করবেন। এতে কি উপকার দর্শিবে, তা আপনারা এখন টের পাবেন না; কিন্তু কিছুদিন পরে বুঝতে পারবেন হুতোমের কি অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু হয়ত সে সময় হতভাগ্য হুতোমকে দিনের ব্যালা দেখতে পেয়ে কাক ও ফরমাসে হারামজাদা ছেলেরা ঠোঁট ও বাঁস দিয়ে, খোঁচাখুচি করে মেরে ফেলবে সুতরাং কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ হুতোম কিছুই শুনতে পাবেন না।..."

খণ্ড খণ্ড নক্‌শাগুলো পরে দুই-ভাগ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র ১ম ভাগ বের হয় ১৮৬২ সালের শেষের দিকে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৬। বিষয়-সূচী:

কলিকাতার চড়ক-পার্ব্বণ; বারোইয়ারী পূজা; হুজুক; ছেলেধরা প্রতাপচাঁদ; মহাপুরুষ; লালা-রাজাদের বাড়ী দাঙ্গা; কৃশ্চানি হুজুক; মিউটিনি; মরাফেরা; সাতপেয়ে গরু; দরিয়াই ঘোড়া; লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌শা; টেক্‌চাঁদের পিসী; বুজরুকি; মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতি ২৮টি প্রকরণ।

২য় ভাগে আছেঃ রথ, দুর্গোৎসব, রাম-লীলা ও রেলওয়ে—এ চারটি অধ্যায়।

'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র পরবর্তী সংস্করণে বিভিন্ন পাঠান্তর দেখা যায়। যেমনঃ 'চড়ক-পার্ব্বণে'র প্রথমেই টুনোয়ার টপ্পার যে কলিটি আছে, পূর্ববর্তী প্রথম সংস্করণে তার জায়গায় ছিল অমিত্রাক্ষব ছন্দের একটা কবিতা।

হুতোমের ভাষায় কলকাতার এ নক্শা-গুলো হোল সত্যি—'ইয়ে রাজবাড়ীকি নক্শা, বড় মজাদার হ্যায়, ইয়ে শোভাবাজারকি গাজন, বড় তামাশা হ্যায়, ইয়ে হাইকোর্টকা বিচার, আজব তাজ্জব হ্যায়।' এর ভাষায় ভঙ্গিতে, রচনার রঙ্গেতে মুগ্ধ হতে হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মত বলতে হয়ঃ 'আমাদের বাংলা ভাষায় যে বাজি খেলান যায়, তুবড়ি ফুটান চলে, কাটা যায় ফুল, ছোটান যায় ফোয়ারা—তাতে কোন সংশয়ই থাকে না।'

রুচি হিসাবে হুতোম ঈশ্বর গুপ্ত ও 'গুড় গুড়ে ভট্টাচার্যির' লেখাব চেয়ে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠতর তা দেখিয়ে গেছেন আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর 'পুরাতন প্রসঙ্গে'।

হুতোম প্যাঁচার জবানিতেঃ

"সত্য বটে অনেকে নক্শাখানিতে আপনারে আপনি দেখতে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা বলা বাহুল্য, তবে কেবল এই মাত্র বলতে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমন কি স্বয়ংও নক্শার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।

নক্শাখানিকে আমি একদিন আরসি বলে পেস কল্লেও কত্তে পাত্তেম, কারণ পূর্ব্বে জানা ছিল যে, দর্পণে আপনার মুখ কদর্য্য দ্যেখে কোন বুদ্ধিমানই আরসিখানি ভেঙ্গে ফেলেন না বরং যাতে

ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বির করে থাকেন, কিন্তু নীল দর্পণের হ্যাঙ্গাম দেখে শুনে—ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরসী ধত্তে আর সাহস হয় না, সুতরাং বুড়ো বয়সে সং সেজে রং কত্তে হলো—পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবী মাফ্ কর্ব্বেন।…"

হুতোম প্যাঁচা আপনার মুখ আপনি না দেখেও ছাড়েনি। কালীপ্রসন্ন তাঁর বাল্য-স্মৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে লিখছেন :

…সংস্কৃত শেখাবার জন্যে আমাদের একজন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদের লেখা পড়া শেখাবার জন্য বড় পরিশ্রম কত্তেন। ক্রমে আমবা চাব বছরে মুগ্ধবোধ পার হলেম, মাঘের দুই পাত ও রঘুব তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাঠামোর সূত্র হলো ; টিকী ফোঁটা ও রাঙা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচার্য্য দেখলেই তক্ক কর্ত্তে যাই, ছোঁড়া গোছের ঐ রকম বেয়াড়া বেশ দেখতে পেলেই তক্কে হারিয়ে টিকী কেটে নিই ; কাগজে প্রস্তাব লিখি—পয়ার লিখতে চেষ্টা করি ও অন্যের লেখা প্রস্তাব থেকে চুরী করে আপনার বলে অহঙ্কার করি—সংস্কৃত কলেজ থেকে দূরে থেকেও ক্রমে আমরাও ঠিক একজন সংস্কৃত কলেজের ছোকরা হয়ে পড়লেম ;…"

নিশাচারী হুতোম কলকাতা শহরের—বিশেষ করে তার ধনী-সমাজের গলদের বাস্তব নক্‌শাই কেবল এঁকেছেন ; কাহিনীর কোন রং ফলাতে যাননি। তাঁর লেখা অনেক ক্ষেত্রে আলোকচিত্রধর্মী। ফলে, সমাজের নগ্ন কালো রূপ নক্‌শাগুলোয় ফুটে উঠেছে বলে অনেক নিন্দাবাদ জুটেছিল হুতোমের কপালে। 'আপনার মুখ আপনি দেখ'য় (১৮৬৩) ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় পাল্টা জবাব দেন কালীপ্রসন্ন সিংহের। এমন কি বংকিমচন্দ্রও হুতোমকে ঠুকতে ছাড়েন নি রুচি-অরুচির বাদ-বিচারে। তবু প্রমথ চৌধুরীর কথায় বলতে হয় :

"হুতোম প্যাঁচার নক্শা' হচ্ছে তখনকার সমাজের আগাগোড়া বিদ্রূপ এবং অতি চমৎকার লেখা। এ বই সেকালের কলিকাতা সহরের চলতি ভাষায় লেখা। এ রকম চতুর গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় আর দ্বিতীয় নেই।…যাঁরা এ পুস্তক পড়েন নি, তাঁদের তা পড়তে অনুরোধ করি।…"

শিল্পীর পরিচয় তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। লেখকের পরিচয় তাঁর রচনায়। প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে সমুজ্জ্বল 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' থেকে কয়েকটি নক্শার নমুনা উদ্ধৃত করা গেল :

সেকেলে 'বাবু'দের জীবনযাত্রা হুতোমের দৃষ্টিকোণ থেকে :

…পূর্ব্বের বড়-মানুষরা এখনকার বড়-মানুষদের মত বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, এড্রেস, মিটিং ও ছাপাখানা নিয়ে বিব্রত ছিলেন না; প্রায় সকলেরই একটি একটি (—) ছিল, (এখনও অনেকের আছে)। বেলা দুপুরের পর উঠতেন, আহ্নিকের আড়ম্বরটাও বড় ছিল—দু-তিন ঘণ্টার কম আহ্নিক শেষ হোত না, তেল মাখতেও ঝাড়া চার-ঘণ্টা লাগতো—চাকরের তেল-মাখানির শব্দে ভূমিকম্প হতো—বাবু উলঙ্গ হয়ে তেল মাখতে বসতেন, সেই সময় বিষয়কর্ম্ম দেখা, কাগজপত্রে সহি ও মোহর চলতো, আঁচাবার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যদেব অস্ত যেতেন। এঁদের মধ্যে জমিদাররা রাত্তির দুটো পর্য্যন্ত কাছারি কত্তেন; কেউ অমনি গাওনা বাজ্না জুড়ে দিতেন; দলাদলির তর্ক কত্তেন ও মোসাহেবদের খোসামুদিতে ফুলে উঠ্তেন—গাইয়ে-বাজিয়ে হলেই বাবুর বড় প্রিয় হতো, বাপাস্ত কল্লেও বকসিস পেতো; কিন্তু ভদ্দরলোক বাড়ী ঢুকতে পেতো না; তার বেলা ল্যাঙ্গা তরওয়ালের পাহারা, আদব-কায়দা। কোন কোন বাবু সমস্ত দিন ঘুমুতেন—সন্ধ্যার পর উঠে কাজকর্ম্ম কত্তেন—দিন রাত ছিল ও রাত দিন হতো! রামমোহন রায়, গুপীমোহন দেব, গুপীমোহন ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও জয়কৃষ্ণ

সিংহের আমোল অবধি এই সকল প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান হতে আরম্ভ হলো, [বাঙালীর প্রথম খবরের কাগজ] সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশ হতে আরম্ভ হলো। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হোলো।…ক্রমে বাঙালীদের চোখ ফুটে উঠলো।

হুতোমে-এর চোখে কলকাতার চড়ক-পার্বণের দৃশ্যের খানিকটা ঃ

…গুপুস্ করে তোপ পড়ে গ্যালো! কাকগুলো 'কা-কা' করে বাসা ছেড়ে উড়বার উজ্জুক কল্লে। দোকানীরা দোকানের ঝাঁপতাড়া খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম করে দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে হুঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক খাবার উজ্জুক কচ্চে। ক্রমে ফরসা হয়ে এলো—মাচের ভারিরা দৌড়ে আসতে লেগেচে, মেচুনীরা ঝকড়া কর্ত্তে কর্ত্তে তাব পেচু পেচু দৌড়েচে। বদ্দিবাটীর আলু, হাসনানের বেগুন, বাজরা বাজরা আসচে।…

…দালালি কাজটা ভাল, "নেপো মারে দইয়ের মতন" এতে বিলক্ষণ গুড় আছে। অনেক ভদ্রলোকের ছেলেকে গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ে দালালি কত্তে দেখা যায়, অনেক "রেস্তহীন মুচ্ছুদ্দী" "চারবার ইন্সালভেন্ট" হয়ে এখন দালালি ধরেছেন। অনেক পদ্মলোচন দালালির দৌলতে "কলাগেছে থাম" ফেঁদে ফেল্লেন। এঁরা বর্ণচোরা আঁব, এঁদের চেনা ভার, না পারেন হেন কর্ম্ম নেই।…

…ক্রমে গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে সাতটা বেজে গ্যাল। সহরে কানপাতা ভার। রাস্তায় লোকারণ্য, চারদিকে ঢাকের বাদ্যি, ধুনোর-ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ। সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সুতোশান, সাপ, ছিপ ও বাঁশ ফুঁড়ে একেবারে মরিয়া হয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে কালীঘাট থেকে আসচে। বেশ্যালয়ের বারাণ্ডা ইয়ারগোচের ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ, সকেরদলের পাঁচালি ও হাপ্ আখড়ায়ের দোয়ার, গুলগার্ডেনের মেম্বরই অধিক,—এঁরা গাজোন দ্যাখবার জন্য ভোরেরব্যালা এসে জমেছেন।…

তখনকার পুলিশদের সম্পর্কে হুতোম প্যাঁচা ঃ

…পুলিশের সার্জন, দারোগা, জমাদার প্রভৃতি গরিবের যমেরা রোঁদ সেরে মস্‌-মস্‌ করে থানায় ফিরে যাচ্চেন ; সকলেরই সিকি, আধুলি, পয়সা ও টাকায় ট্যাঁক ও পকেট পরিপূর্ণ—হজুরদের কাছে চ্যলা কাঠখানা, তামাক ছিলিমটে ও পানের খিলিটে ফেরে না, অনেকের মনের-মত হয় না বলে সহরের উপর চটেছেন, রাগে গা গস্‌গস্‌ কচ্চে, মনে মনে নতুন ফিকির আঁটতে আঁটতে চলেছেন, কাল সকালেই একজন নিরীহ ভদ্রসন্তানের প্রতি কার্দানি ও ক্যারামত জাহির করবেন।…

কেবল পুলিশ নয়, হুতোমের দৃষ্টিকোণ থেকে সাক্ষাৎ ভগবানও রেহাই পান নি।

…যদি পরমেশ্বরের কিছুমাত্র বিষয় জ্ঞান থাকতো, তা হ'লে সাদ করে "ঘোড়ার-ডিম" ও "আকাশ কুসুমের" দলে গণ্য হ'তেন না। সুতরাং একদিন আমরা তাঁরে একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন পাড়াগেঁয়ে জমিদার বলে ডাকলেও ডাকতে পারি !…

মাত্র ত্রিশ বৎসরকাল বেঁচেছিলেন অসীম প্রতিভাশালী এই কথাশিল্পী। এক শ' বছর আগে জন্মেও প্রতিভাদীপ্ত এই লেখক যেন এক শ' বছর পরের প্রগতিশীল বাস্তবধর্মী মন নিয়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের কথার অনুরণন তুলে বলতে হয় ঃ 'হয়তো এমন দিন এলেও আসতে পারে, যখন লোক হুতোম প্যাঁচা পড়বে না, কিন্তু এমনদিন কখনই আসবে না, যখন হুতোম প্যাঁচা পড়ে লোকে আনন্দ ও উপকার লাভ না করবে।'

বিদ্যাকল্পদ্রুম

ধর্ম রাজ্যেও বৈষম্য!

শাদা আর কালা চামড়ায় তফাৎ। তফাৎ কিনা 'পরম পিতা' যীশুর সাম্যরাজ্যে—সাক্ষাৎ উপাসনা গৃহেও! এ জন্যই কি তিনি আপন স্নেহময়ী জননী, প্রাণপ্রিয় ভাই-বোন, সুমধুর গৃহকোণ পরিত্যাগ করে এসেছেন? ভোগ করেছেন অশেষ নিপীড়ন আর নির্যাতন? পরিত্যক্ত হয়েছেন আপনার সমাজ ও আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক? নিজের প্রাণ পর্যন্ত করেছেন বিপন্ন? বিজাতীয় ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে শিক্ষকতার চাকুরীস্থল থেকেও হয়েছিলেন হৃন্য কুকুরের মত বিতাড়িত? খৃষ্টধর্ম গ্রহণের এই কি প্রতিদান?

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (খ্রীঃ ১৮১৩-১৮৮৫) শুধালেন নিজেকে। প্রশ্ন করলেন বার বার। মন তিনি স্থির করলেন। না, 'ক্যানন'-পদ পরিত্যাগ করাই ভাল। তিনি পদত্যাগ করবেন জানিয়ে দিলেন।

অথচ সাধারণ এক ব্যাপার। ব্যাপারটা তুচ্ছ হলেও কালা আদমী 'নেটিভ'দের প্রতি সাগর-পারের বিদেশী মিশনারী সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় 'সেণ্ট পল ক্যাথিড্রেল' গীর্জা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। গীর্জার প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ বিশপ কৃষ্ণমোহনকে তার প্রথম 'ক্যানন' বা আচার্য পদে নিযুক্ত করেছিলেন। কিছুদিন পর প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ ইংলণ্ডে ফিরে যান এবং একজন ইউরোপিয়ানকে উক্ত আচার্যপদে মনোনীত করে পাঠালেন। বিশপ কৃষ্ণমোহন কালা আদমী বাঙালী। সুতরাং তিনি 'নেটিভ' খৃষ্টানদেরই পাদ্রী

হয়ে থাকবেন। তাঁর কাছে কি খাস বিলাতী সাহেব আর মেমদের উপাসনা করা চলে? বিলেত থেকে নতুন যিনি পাদ্রী হয়ে এসেছেন তিনিই শাসক গোষ্ঠী ইংরেজ সম্প্রদায়ের আচার্যের পদ অলংকৃত করবেন। হাজার হোক, রাজার জাত তো?

অপ্রাসঙ্গিক হলেও ঘটনাটার উল্লেখ করা হোল। কেন না, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন ছিলেন মনে-প্রাণে খাঁটি বাঙালী। সমসাময়িক যুগের আর একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিভা মাইকেল মধুসূদনের মত খৃষ্টধর্ম কিংবা সাহেবিয়ানার হালচালটাই তাঁর সব পরিচয় নয়। স্বদেশ ও মাতৃভাষার কথা একদিনও তিনি ভুলতে পারেন নি। ভুলতে যে পারেন নি তার প্রমাণ বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে তাঁর 'সর্বার্থ-সংগ্রহ' বা Encyclopædia Bengalensis. 'সর্বার্থবিদ্যাসংগ্রহ' বিদ্যাকল্পদ্রুম নামেই পরিচিত। ১৮৪৬ সালের জানুয়ারী থেকে 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' প্রথম প্রকাশিত হতে থাকে।

'বিদ্যাকল্পদ্রুম' দ্বিভাষিক। এর এক পৃষ্ঠায় ইংরেজী আর অপর পৃষ্ঠায় তার বাংলা অনুবাদ। ইংরেজী বিশ্বকোষ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র আদর্শে ও অনেকটা অনুকরণে 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' লিখিত হয়। অনেক স্থলে তার স্বাধীন অনুবাদও বলা চলে। বইখানি তেরোটি খণ্ড বা কাণ্ডে প্রকাশিত। ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, জীবন-চরিত, জ্যামিতি, ভূগোল, পুরাবৃত্ত—এ হেন বিষয় নেই যা রেভাঃ কৃষ্ণমোহনের সংকলিত ও অনূদিত 'বিদ্যাকল্প-দ্রুমে' স্থান পায় নি। শুধু ইংরেজী থেকে নয়, মূল সংস্কৃত থেকেও সাহিত্য-বিষয়ক এর কোন কোন প্রস্তাব অনূদিত হয়েছে। কয়েকটি মৌলিক নিবন্ধও আছে। ১৮৪৬ সালেই এর প্রথম খণ্ড বের হয়। পরবর্তী তিন বছরে আরও ছয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয় গড়ে বছরে তুটি করে। বারো ও তেরো খণ্ড আত্মপ্রকাশ করতে

লাগে আরো তু'বছর। 'বিদ্যাকল্পদ্রুম'-এর কোন কোন খণ্ড সস্তা পাঠ্য বই-এর আকারেও প্রকাশিত হয়েছিল বিদ্যার্থীদের সুবিধার জন্য। বইয়ের শেষে ছাত্রদের জন্য প্রশ্নপত্রও ছিল সংযোজিত!

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত। গ্রীক, ল্যাটিন, হীব্রু, সংস্কৃত, ইংরাজী, আরবী, পার্শী, উর্দু, তামিল, গুজরাটী, উড়িয়া প্রভৃতি দশ-বারোটি ভাষায় ছিলেন তিনি সমান পটু। সাহিত্য, দর্শন, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি সর্ব বিদ্যায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ছাপ মেলে 'বিদ্যাকল্পদ্রুমে'।

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক জীবন সুরু করেন ইংরেজী এক পঞ্চাঙ্ক নাটকের মারফত। নাটকটির নাম The Persecuted (১৮৩১)। হিন্দু সমাজের উঁচুতলার ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, পণ্ডিত প্রভৃতি তথাকথিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তুর্নীতি, ব্যভিচার প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই নাটকে। এ ছাড়া, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায়ও তাঁর অনেক বই আছে। কিন্তু বিদ্যাকল্পদ্রুমই তাঁর সেরা বই—অমূল্য একটি সম্পদও বলা যায় তখনকার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের।

'বিদ্যাকল্পদ্রুম'-এর প্রতি কাণ্ড বা খণ্ডের বিষয়বস্তু নীচে দেওয়া গেল:

১ম কাণ্ড: রোম রাজ্যের পুরাবৃত্ত—১ম খণ্ড—(গিবন, আর্ণল্ড, হুক্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের বৃত্তান্ত অবলম্বনে)।

২য় কাণ্ড: ক্ষেত্রতত্ত্ব—১ম খণ্ড।

৩য় কাণ্ড: বিবিধ বিষয়ক পাঠ—পৃথিবীর বিষয়; পুরাবৃত্ত ও ইতিহাসের কথা বিষয়ক পুরাতনী পর্যালোচনা। এ অধ্যায়ে রামায়ণ ও মহাভারত, এবং প্লুটার্ক, রোলিন প্রভৃতির লেখা থেকে পৌরাণিক গল্প পরিবেশন করা হয়েছে।

৪র্থ কাণ্ড : রোম রাজ্যের পুরাবৃত্ত—২য় খণ্ড।

৫ম কাণ্ড : জীবন বৃত্তান্ত—এ পর্যায়ে আছে যুধিষ্ঠির, কংফুছে (কনফুসিয়াস), প্ল্যাটো, বিক্রমাদিত্য, আলফ্রেড, সুলতান মামুদ প্রভৃতি মনীষীদের জীবনচরিতমালা।

৬ষ্ঠ কাণ্ড : ইজিপ্ত দেশের পুরাবৃত্ত। রলিন্স-এর এ্যান্সেণ্ট হিসট্রি ও এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে নেওয়া।

৭ম কাণ্ড : বিবিধ বিষয়ক পাঠ—২য় খণ্ড। নীতিকথা, জাতকের গল্প, হানিবলের যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি বিবিধ কাহিনী।

৮ম কাণ্ড : ভূগোল বৃত্তান্ত। মারি, ক্রণ প্রভৃতি লেখকদের লেখা। জিওগ্রাফি পুস্তক থেকে সংকলিত।

৯ম কাণ্ড : ক্ষেত্রতত্ত্ব—২য় খণ্ড।

১০ম কাণ্ড : নীতিবোধক ইতিহাস—'রাজদূত' ও 'সরলতার পুরস্কার' গল্প।

প্রথমটি আডমস্-এর 'King's Messengers' আর দ্বিতীয়টি মেরী এজওয়ার্থ-এর Reward of Honesty গল্পের অনুবাদ।

১১শ কাণ্ড : চিত্তোৎকর্ষ বিধান—১ম খণ্ড।

১২শ কাণ্ড : চিত্তোৎকর্ষ বিধান—১ম খণ্ড। এ কাণ্ড দুটি Isaac Watts-এর Improvement of the Mind-এর অনুবাদ। এতে আছে বিদ্যাবুদ্ধির সাধারণ নিয়ম, দর্শন অধ্যয়ন, উপদেশ গ্রহণ; গ্রন্থ ও গ্রন্থ নির্বাচন বিষয়ক নানান আলোচনা, ডিবেট বা বাদানু-বাদের বিষয়, সক্রেতীয়, ফোরেন্সিক, একাদেমিক বা পাঠশালাস্থ বাদানুবাদের বিষয় ইত্যাদি নানা পরিচ্ছেদ।

১৩শ কাণ্ড : জীবনবৃত্তান্ত—২য় খণ্ড। 'লাইব্রেরী অব্ ইউস্ফুল নলেজ' নামক গ্রন্থাবলী থেকে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে গ্যালিলিওর চরিত্র।

'বিদ্যাকল্পদ্রুম'-এর প্রধান লেখক-সম্পাদক রেভাঃ কৃষ্ণমোহন নিজে হলেও তিনি অপরের সাহায্য যে গ্রহণ করেন নি, এমন নয়। ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের কোন কোন পণ্ডিতের সাহায্যও তিনি নেন দ্বিভাষিক এ দুরূহ কর্তব্য সাধনে। তা ছাড়া বিদ্যাকল্পদ্রুম-এ যে সব ভৌগোলিক ও জ্যামিতিক শব্দের পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল, আজিকার দিনেও তাদের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি।

এ হোল 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' বা 'সর্বার্থ সংগ্রহে'র আলোচিত বিষয়বস্তু। তখনকার বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর সাহায্য ও আনুকূল্যে পরিপুষ্ট হয়ে 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' মহীরুহটি পল্লবিত ও শাখায়িত হতে পেরেছিল বলে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন লর্ড হার্ডিঞ্জকে উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর 'গ্রন্থ'কে। 'মঙ্গলাচরণে' তিনি প্রথমে বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করেন এবং বিদ্যাকল্পদ্রুমের উদ্দেশ্য আলোচনা প্রসঙ্গে লেখেন ঃ

"এতদ্দেশীয় লোকেরা বিবেচনা না করিয়া প্রাচীন কথাতে এমত অসঙ্গত শ্রদ্ধা করে যে কোন প্রসিদ্ধ ঋষির বাক্যানুযায়ি না হইলে নূতন মত কিম্বা বচন তৎক্ষণাৎ অগ্রাহ্য করে এবং পুরাবৃত্ত ও কল্পিত গল্প, সত্য ও অসত্য বর্ণনা সকলি এক পদার্থ জ্ঞান করে ; ইহা দেখিয়া স্পষ্ট অনুমান হইল যে যাহাতে সাধারণ লোকের মতিভ্রম নষ্ট হইতে পারে—যাহাতে ন্যায় ও অন্যায় এবং সত্য ও মিথ্যা জ্ঞানের পরস্পর প্রভেদ তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে—যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে যে যাহা পদার্থ বিদ্যানুসারে বাস্তবিক মিথ্যা তাহা কোন ভাবে সত্য হইতে পারে না সে সমস্ত উপায়ে অবশ্য দেশের পরম মঙ্গল হইবে কেন না ক্রমে ২ অবিদ্যা ও ভ্রান্তি জঞ্জাল এই প্রকারে দূর হইলে আরও উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বতোভাবে পবিত্র তত্ত্বের পথ পরিষ্কার হইবে।...

বঙ্গভূমির মধ্যে সাধারণের মতিভ্রম নিবারণার্থে গৌড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত ও পদার্থ বিদ্যার অনুবাদ এক উত্তম উপায় বোধ হইতেছে কেননা অবিদ্যা ও ভ্রান্তির যে দুষ্টু শক্তি দেশ ব্যাপিয়া প্রবল আছে তাহা হইতে সাধারণের মন এ উপায়ে মুক্তি পাইতে পারে, কিন্তু এই প্রকারে গৌড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় বিদ্যার অনুবাদ যত বাঞ্ছনীয় তত সহজ নহে অতএব অসাধ্য জ্ঞান করিয়া আমি অনেকদিন পর্য্যন্ত এ চেষ্টাতে বিরত ছিলাম কিন্তু সম্প্রতি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সমীহে উৎসাহ পাইয়া উক্ত অনুবাদের প্রতিজ্ঞাতে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইয়া পরমেশ্বরের প্রসাদে নির্ভর রাখিয়া ইউরোপীয় পুবাবৃত্ত পদার্থবিদ্যা ক্ষেত্র পরিমাণ জ্যোতিষাদি সকল শাস্ত্র স্বদেশীয় ভাষাতে বিস্তারপূর্ব্বক পশ্চিম খণ্ডের জ্ঞান পূর্ব্ব খণ্ডে স্থাপন করিতে চেষ্টিত হইয়াছি।

যে ২ গ্রন্থ আমি রচনা করিতে প্রবৃত্ত আছি তাহা উক্ত বিষয়ক কোন বিশেষ পুস্তক হইতে অনুবাদ না করিয়া বরং নানা মূল হইতে সংগ্রহ করিতে কল্পনা করিতেছি। এইরূপ সংগ্রহ করিলে দুই প্রকারে উপকার হইতে পারে। ইহাতে প্রথমতঃ ব্যাখ্যাকারক যথার্থ অনুবাদের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া পাঠকের অসাধু শব্দ প্রয়োগের ভয় হইতে উদ্ধার পাইবেন, এই উদ্ধারকে ব্যতিরেক ভাবে হিতকারি কহিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ এইরূপ সংগ্রহের বিধানে গৌড়ীয় পাঠকের বিশেষ ব্যবহারার্থে স্বদেশীয় ধারাতে কতিপয় গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে পারে।…"মঙ্গলাচরণ"।''

যৌবনে একদা নব্যদলের সঙ্গে ভিড়ে পাদ্রীদের ভুল বাংলা গসপেল অনুবাদ ও প্রচারের জন্য কৃষ্ণমোহন যে উপহাস করতেন, পরবর্তীকালে নিজে পাদ্রী হয়ে সে অনুবাদ-সাহিত্যেরই উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' অনেকক্ষেত্রে অনুবাদের

আঁসটে জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তবু ডাক্তার সুকুমার সেনের মত একথা স্বীকার করতেই হয় যে, "বিদ্যাকল্পদ্রুমের রচনাভঙ্গি সমসাময়িক পাঠ্য-পুস্তকের রচনা-রীতি অপেক্ষা সমধিক উন্নত ছিল। ছেদ-চিহ্নের স্বল্প ব্যবহার সত্ত্বেও কৃষ্ণমোহনের লেখা জড়তাহীন, সরল এবং স্থানে স্থানে মধুর।"…স্বধর্ম ও স্বজাতি পরিত্যাগ করে পরধর্ম গ্রহণ করেছিলেন আর প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধতা করতেন বলে দেশবাসী তাঁর প্রতি ছিল বিমুখ। নইলে হাজার বাধা-বিঘ্নকে তুচ্ছ করে এক-জীবনে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য যে পরিমাণ যত্ন, পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা করে গেছেন তার তুলনা হয় না। তিনি খৃষ্টান পাদ্রী ছিলেন বলে হয়ত আমরা তাঁর কদর তখন বুঝতে শিখিনি।

রেভারেণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' থেকে খানিকটা নমুনা উৎকলন করা গেল:

হিন্দুস্থান।

এই আশ্চর্য্য দেশ সম্প্রতি যে ২ নামে বিখ্যাত আছে তাহা পুরাণ গ্রন্থাদির মধ্যে পাওয়া যায় না, গ্রীকেরা ইহাকে ইণ্ডিয়া এবং মোসলমানেরা হিন্দুস্থান কহিত* কিন্তু পুরাণে ঐ দুই আখ্যার একটীও নাই। পুরাণে আর্য্যাবর্ত্ত ভারতবর্ষ প্রভৃতি অন্য প্রকার নাম আছে ইদানীন্তন লোকে প্রায় তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন।

---

* হামিল্‌টন সাহেব কহেন হিন্দুস্থান শব্দ সমাস-ঘটিত এবং দুই পারস্য শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে যথা "হিন্দু" অর্থাৎ কাল, "স্থান" অর্থাৎ স্থান। অন্যান্য অনেক গ্রন্থকারেরাও স্বয়ং বিবেচনা না করিয়া ঐ মত প্রচার করিয়াছেন কিন্তু আমরা ভারতবর্ষীয় লোক, আপনাদের দেশকে হাপ্‌সি স্থান কহিতে সঙ্কুচিত হই সুতরাং সূক্ষ্ম বিবেচনা না করিয়া ঐ মত গ্রাহ্য করিব না। মোসলমান পণ্ডিতেরা উক্ত প্রকার ব্যুৎপত্তির বিষয় প্রায় কিছুই

ভারতবর্ষই অখিল হিন্দুস্থানের নাম আর্য্যাবর্ত্ত কেবল প্রকৃত হিন্দুস্থানের নাম, বিষ্ণু পুরাণোক্ত নিম্ন লিখিত বচনে বোধ হইবে হিন্দুরা আপনারদের দেশের কেমন গৌরব করিত "জম্বুদ্বীপ মধ্যে ভারতবর্ষ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্থান যে হেতু ইহাই কর্ম্মভূমি এতদ্ভিন্ন সকলি ভোগ ভূমি। সহস্র ২ জন্মে বহুবিধ পুণ্য সঞ্চয় দ্বারা এস্থানে মনুষ্য জন্ম কদাচিৎ লভ্য হয় অতএব দেবতারা এই গীত সর্ব্বদা গান করিয়া থাকেন 'যে ২ পুরুষ দেবত্ব ত্যাগ করিয়াও ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়েন তাহারা ধন্য, কেন না ভারতবর্ষ স্বর্গ ও মোক্ষের আস্পদ এবং তৎ প্রাপণের দ্বারা স্বরূপ, তাঁহারা কর্ম্মসহী ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিষ্কামনায় কর্ম্মানুষ্ঠান করেন এবং পরাত্মস্বরূপ অনন্ত বিষ্ণুতে তাহা সমর্পণ করিয়া নির্ম্মলান্তঃকরণ প্রযুক্ত তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন।

জানেন না, ইহাতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে উক্ত ব্যুৎপত্তি অলীক। হিন্দুস্থান শব্দ যদি পারস্য ভাষা হয় তবে কেবল দুই শেষাক্ষর অর্থাৎ "স্থান" ঐ ভাষায় উৎপন্ন হইয়া থাকিবে কিন্তু তাহাও সংস্কৃত স্থান হইতে বহু প্রাচীন। এস্তের নামক প্রাচীন বাইবেল শাস্ত্রে ভারতবর্ষ হোদ্দু নামে ব্যক্ত আছে যথা "মেহোদ্দু ও-আদ-কুশ" অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে কুশদেশ পর্য্যন্ত। অতি মান্য ২ টীকাকারেরা কহেন যে "হোদ্দু" শব্দে ন্দ স্থানে দ্দ আদেশ হইয়াছে সুতরাং প্রকৃত শব্দ হোন্দু, সুরিয়ানি ভাষায় ঐ শব্দ "হেন্দু" আরবি ভাষায় "হিন্দ" এবং তার্গুমেতে "হিন্দিয়া" বলিয়া অনুবাদিত হইয়াছে। অপর কাল্‌দি ভাষার হিন্দিয়া শব্দ হইতে গ্রীক ভাষায় "ইন্দিয়া" সহজেই হইতে পারে যেমত হানিবল হইতে আনিবল। অতএব হিন্দুস্থান এবং ইন্দিয়া উভয় শব্দের এক মূল আর তাহা আধুনিক পারস্য ভাষা হইতে বহু প্রাচীন; হিন্দিয়া অথবা হিন্দিয়া শব্দের যে অর্থ হউক তাহাতে হাপ্‌সি স্থান বুঝাইতে পারে না পারস্য লোকেরা ঐ শব্দ গ্রহণ কালে "হিন্দুরদের ভূমি" এই অর্থ করিত আর হিন্দু শব্দ গ্রীক সুরিয়ানি প্রভৃতি ভাষানুসারে ব্যবহার করিত এই প্রকার শব্দ ব্যুৎপত্তি আরও স্পষ্ট বোধ হয় কেন না জেন্দ ভাষাতে সংস্কৃত

আমরা সৎকর্ম্ম ফলে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে অবস্থিতি করিতেছি স্বর্গ জনক কর্ম্মক্ষয়ে কোন্ স্থানে দেহ সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইব জানি না যাহা হউক ভারত ভূভাগে যাহারা ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট হইয়া জন্মায় তাহারাই ধন্য"।

সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা স্পষ্টরূপে ভারতবর্ষের সীমা নির্ণয় করেন নাই কিন্তু তাহার প্রচলিত সীমা শৈল সাগরাদি স্বাভাবিক পদার্থ দ্বারা অঙ্কিত হওয়াতে যথার্থ রূপে অনুমান করা যাইতে পারে যে উক্ত দেশে সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র এবং হিমালয় ও মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তি বলিয়া সর্ব্বদা পরিচিত হইত। উক্ত সীমার মধ্যবর্ত্তি অখিল ভূমি কখন একচ্ছত্রা হইয়াছিল কি না এবং তথাকার লোকেরা কখন এক রাজার প্রজা হইয়াছিল কি না তাহা নিশ্চয় করা যায় না। পুরাণের মধ্যে অনেক স্থলে এক কালীন নানা দেশীয় রাজার বর্ণনা আছে তাহাতে অনুমান করা যায় যে ভারতবর্ষের মধ্যে স্বতন্ত্র ২ দেশ এবং নৃপতি ছিল। ঐ স্বতন্ত্র ২ রাজারা যদি কখন ২ পরস্পরের রাজ্যে উপদ্রব করিয়া থাকে এবং রাজ্য লোভে অথবা অন্যান্য

সকারের স্থানে হকার আদেশ হইত সুতরাং সে ভাষাতে সিন্ধু নদীর নাম অবশ্য হিন্দ হইতে পারে ফলতঃ জেন্দ এবং পহ্লবি ভাষায় ঐ শব্দ "হিএন্দ" বলিয়া লিখিত হয়, বোধ হয় এই মূল হইতে ভারতবর্ষের নাম গ্রীক হিব্রি কাল্দি এবং সুরিয়ানি ভাষায় উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। অতএব হিন্দুস্থানের অর্থ এই যথা "হিন্দু (অর্থাৎ সিন্ধু) নদীর পারস্থিত লোকদিগের ভূমি।" অপিচ আধুনিক পারস্য ভাষার কোন অভিধান লিখিত নাই যে হিন্দু শব্দের অর্থ কাল, এ শব্দের ঐ অর্থে স্পষ্ট প্রয়োগও দেখা যায় না কেবল হাফেজ রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকে বোধ হয় কাল অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে যথা "বখালে হিন্দুয়শ বক্শম সামার্কন্দ ও বখারারা" কিন্তু এস্থলেও বাহার আজমের মতে খালে হিন্দুর অর্থ "খালে অম্বরী" অর্থাৎ অম্বর ফলের সদৃশ তিল।

অপকৃষ্ট বাসনায় পরস্পরের মিত্রতায় ব্যাঘাত করিয়া থাকে আর কেহ প্রবল পরাক্রম এবং রণকুশল হইলে যদি সার্ব্বভৌম এবং সর্ব্বাধিপতি হইতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে তাহাতে চমৎকারের বিষয় কি? অতএব যে ২ রাজা সসাগরা ধরণী পতি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে বোধ হয় তাহারা রাজ্যলোভ প্রযুক্ত কেবল আপন ২ দেশে আধিপত্য করিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই কিন্তু নিকটস্থ নৃপতিবর্গের সহিত রণ করিতে বাসনা করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল তাহাতে তাহারদের দ্বারা পরাজিত রাজারা আপনারদিগকে কিঙ্কর বলিয়া স্বীকার করত বর্ষে ২ কর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়া থাকিবে কিন্তু জয়কারি বীর স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পরাজিত ভূপালেরা কর প্রদান অথবা তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকারে অবশ্য নিরস্ত হইত সুতরাং রাজ্যও পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকিত অতএব ভারতবর্ষের প্রজারদের এক রাজার শাসনে চির মিলন থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না কেবল তাহারা সকলে এক জাতীয় এবং এক ধর্ম্মাশ্রিত হওয়াতে এবং তাহারদের ভাষা ও রীতি নীতিতে সাদৃশ্য থাকাতেই তাহারদের মধ্যে চির ঐক্যের সম্ভাবনা ছিল ফলতঃ মোগল রাজাদিগের প্রাচুর্ভাবের পূর্ব্বে বোধ হয় ভারতবর্ষের মধ্যে কখন এক রাজা সর্ব্বত্র প্রবল হয় নাই পরন্তু সম্প্রতি এই বিস্তীর্ণ ভূমির প্রায় সর্ব্বাংশ বাস্তবিক ইংরাজদিগের শাসনাধীন হইয়াছে।

১। হিন্দুস্থান পর্ব্বত এবং নদী দ্বারা স্বভাবতঃ কএক অংশে বিভক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে হিমালয়স্থ পর্ব্বতীয় দেশ সমূহ যাহা কাশ্মীর হইতে আসাম পর্য্যন্ত শৈল শ্রেণীর সমানান্তরাল ভাবে ব্যাপ্ত, তাহাকে উত্তর হিন্দুস্থান কহা যায়। কাশ্মীর এবং আসাম ব্যতীত এই অংশে নিম্নলিখিত দেশ আছে যথা ভূতান্ত, সিকিম কিরাতভূমি, নেপাল, চৌব্বিশ এবং বাইস রাজারদের দেশ, কুমেওন,

গরওয়াল, সির্ম্মর। এই সকল দেশে শাস্ত্র প্রসিদ্ধ কএক সুবিখ্যাত তরঙ্গিণী আছে যথা গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সরযূ গণ্ডকী শ্বেতগঙ্গা কৌশিকী। গরওয়ালের অর্থাৎ শ্রীনগরেব মধ্যে হিন্দুরদের মান্য অনেক পুণ্য স্থান আছে যথা সদা যাত্রিতে পরিপূর্ণ বদরীনাথ নামক মহাতীর্থ স্থান, ভূরি ২ মঠ-মন্দির পুরোহিত সম্বলিত গঙ্গোত্তর দেশ, এবং মহা বেগবতী গঙ্গার সুশোভন পতন, যাহা দেখিলে বিস্ময় জন্মে এবং চিন্তা করিলে রোমাঞ্চ হয় আর তীর্থ যাত্রি এবং কাব্যকরেরা যাহার বর্ণনা করিতে সদা উৎসুক হয়।

অপর নেপাল দেশে এক প্রবল প্রতাপ গোবক্ষ নামে জাতি রাজপুত্রজাতীয় তিন ভূপালের রাজ্য বিনষ্ট করিয়া আপনারদের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল পরে ভূতান্তের সীমা অবধি পাঞ্জাব পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তর হিন্দুস্থান ব্যাপিয়া আপনারদের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল কিন্তু ১৮১৪ সালে ইংরাজদিগের সহিত সংগ্রাম হওয়াতে তাহারা পরাজিত হইয়া দেশেব অধিকাংশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।......
['ভূগোল বৃত্তান্ত'। ১ম ভাগ। অষ্টম কাণ্ড। এই কাণ্ড কলিকাতা সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে শ্রীযুত এ লরেন্স সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল। ইং ১৮৪৮। শক ১৭৬৯।]

পৃথিবীর আকার।

ভূতল নভস্তল উভয়ের মধ্যস্থ অনেকানেক প্রত্যক্ষ লক্ষণ দেখিয়া আমাদের নিশ্চয় অনুমান হয় যে পৃথিবী গোলাকার। ১ কেহ যদি নির্ব্বত সময়ে সমুদ্রতীরে দণ্ডায়মান হইয়া অবলোকন করে তবে জলের উপরিভাগ সম্পূর্ণ সমান বোধ হইবে না বরঞ্চ গোলাকৃতি প্রকাশ পাইবে। এবং উপসাগরের এক পার্শ্বে থাকিয়া জলের নিকট চক্ষু স্থির করিয়া অপর তীর নিরীক্ষণ করিলে জলই উচ্চভাবে দৃষ্টির

ব্যবধান হওয়াতে পর পারের নিম্ন ভূম্যাদি দৃষ্টিগোচর হয় না। ২ ধরাতলে অধিক দূর হইতে কোন বস্তু দর্শন করিতে গেলে আদৌ সেই দ্রব্যের তলস্থ কিয়দংশ প্রচ্ছন্নপ্রায় থাকে, পরে গমন দ্বারা নিকটতর হইলে অদৃশ্যাংশে ক্রমে ২ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, অবশেষে অতি নিকটস্থ হইলে সর্ব্বাবয়ব নয়নগোচর হয়, এইরূপে সমীপস্থ প্রকাণ্ড দ্রব্যও গমনাদি দ্বারা দূরস্থ হইলে একেবারে অন্তর্হিত হয়। দূরস্থ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে পর্ব্বত স্তম্ভ ও জাহাজ প্রভৃতি যেরূপে প্রকাশ ও অপ্রকাশ হয়, তদ্বিষয়ে যাঁহারা কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এই ২ কথা অবশ্য অতি সহজ হইবে। ৩ মেগেলন দ্রেক এবং এনসন প্রভৃতি নাবিকেরা পূর্ব্ব অথবা পশ্চিমাস্য হইয়া ভ্রমণ করত যেখান হইতে প্রথমতঃ যাত্রা করিয়াছিলেন সেখানেই পুনশ্চ উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারা যে রেখাক্রমে জাহাজ চালাইতে আরম্ভ করেন জাহাজের মুখ না ফিরাইয়া একবার ভ্রমণেই সেই রেখায় পুনশ্চ আইসেন ইহাতেও স্বচ্ছরূপে সপ্রমাণ হয় যে পৃথিবী সম্পূর্ণ কিংবা প্রায় গোলাকার। কাপ্তেন কুক সাহেব পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর দিকে জাহাজ লইয়া ভ্রমণ করিতে ২ দেখিয়াছিলেন যে ভূগোলের মধ্যে অর্থাৎ বিষুব রেখা হইতে ক্রমশঃ মেরুর যত নিকটস্থ হওয়া যায় পৃথিবীর পরিধি ততই অল্প হয়, ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সমূহ দৃঢ়তর হইতেছে। ৪ উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে কিম্বা অবাচি দিশা ত্যাগ করিয়া উত্তরাঞ্চলে অধিক দূর ভ্রমণ করিলে যে ২ স্থানে উপস্থিত হওয়া যায় তথাকার নভোভাগে ক্রমে নূতন ২ নক্ষত্র প্রকাশমান হয় এবং যেখান হইতে প্রস্থান করা গিয়াছে তথাকার তারা ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়। পৃথিবী দর্পণের ন্যায় সম ধরাতল হইলে এবম্প্রকার ঘটনা উপপন্ন হয় না। ৫ চন্দ্রগ্রহণের বিষয় বিবেচনা করিলে পৃথিবীর গোলত্ব আরও নিশ্চয় হইতে পারে, যৎকালে পৃথিবী দিবাকর

নিশাকরের মধ্য স্থলে আসিয়া সমসূত্রভাবে থাকেন তখন ভূমণ্ডলের ছায়া চন্দ্রমণ্ডলের উপর পতিত হওয়াতে চন্দ্রগ্রহণ জন্মে, সে ছায়া সর্ব্বদাই গোলাকার প্রতীত হয়, অতএব জল স্থলাত্মক এই ভূমণ্ডল যে গোলাকার এই সকল প্রমাণে তাহার দৃঢ়তা হইতেছে।...

['বিবিধবিষয়ক পাঠ'। ১ম খণ্ড। ৩য় কাণ্ড। (কলিকাতা লাল দীঘির নিকট রোজারিও সাহেবের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল)। ইং ১৮৪৬।]

'বিদ্যাকল্পদ্রুমের' ৩য় কাণ্ডের শেষের দিকে 'বিচিত্র বচন', বক্তৃতা, ইত্যাদি পাঠের একটা অধ্যায় আছে। পাঠকদের কৌতূহল উদ্রেকের জন্য তা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা গেল :

থেলিস।

থেলিস কহিতেন জীবন ও মরণের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, তাহাতে একজন প্রশ্ন করিল "তবে তুমি কেন প্রাণ ত্যাগ কর না ?"

তিনি কহিলেন "প্রভেদ নাই এই কারণেই প্রাণ ত্যাগ করি না।"

কোন ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করে, "পরমেশ্বরের অগোচরে কেহ অন্যায় আচরণ করিতে পারে কি না ?" তাহাতে তিনি কহেন "না, তাহার কল্পনাও করিতে পারে না।"

সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ ব্যাপার কি ? এই প্রশ্নে তিনি কহিয়াছিলেন, "আত্মজ্ঞান"। সর্ব্বাপেক্ষা সহজ কি ? "উপদেশ দেওন"। সর্ব্বাপেক্ষা সুখদ কি ? "কার্য্যসিদ্ধ।"

কি হইলে মনুষ্য অতি সহজে দুরবস্থা সহিষ্ণুতা করিতে পারে ? এই প্রশ্নের তিনি উত্তর দেন, "শত্রুকে অধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিলে।"

আমরা কিরূপে সুশীলতা ও ন্যায়াচরণ করিতে পারি ? এ প্রশ্নে তিনি উত্তর করেন, "অন্যের ব্যবহারে যাহা ২ দূষ্যজ্ঞান করি তাহা যদি আপনাদের ব্যবহারে পরিহার করি।"

সুখী কে? এ প্রশ্নে তিনি উত্তর দেন, "যাহার শরীর সুস্থ ও চিত্ত সুশিক্ষিত।"

তিনি কহিতেন, তুমি আপনি পিতার প্রতি যাদৃশ আচরণ কর আপনার সন্তান হইতেও তাদৃশ প্রতীক্ষা করিও।

পিরিয়ান্দর।

ইনি কহিতেন যাহারা নিরুদ্বেগে রাজ্য শাসন করিতে চাহে তাহারা অস্ত্রাপেক্ষা অনুরাগকে আত্মরক্ষক করুক।

তাঁহাকে প্রশ্ন করা গিয়াছিল, তুমি কেন রাজত্ব করিতে ক্ষান্ত না হও? তিনি কহিলেন "কেন না বল দ্বারা রাজ্যে বঞ্চিত হওয়াতে যদ্রূপ শঙ্কা আছে, স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ত্যাগ করিতেও তদ্রূপ ভয় জানিও।"

দিমস্থিনিস।

কোন ব্যক্তি এক ভোজনোৎসবে অনেক কথা কহিতেছিল, তাহাতে দিমস্থিনিস্ কহিলেন "তুমি যদি এত অধিক বিষয় বুঝিতা তবে এত অধিক কথা কহিতা না।"

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছিল, আমাদের এক জিহ্বা দুই কর্ণ ইহার কারণ কি? তিনি কহিলেন "ইহার তাৎপর্য্য এই যে কথা কহিবার অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণে আমাদের শ্রবণ করা উচিত"।

ঈশ্বরের সদৃশ মনুষ্যের কি আছে? এই প্রশ্নে তিনি উত্তর দেন "দয়া এবং সত্য।"……

নয়শো রূপেয়া

রামধন মজুমদার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। শ্রোত্রিয় শ্রেণীর বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে পাত্রী বড় আক্রা। বিয়ের বাজারে তাদের বড় চাহিদা। পাত্রী যত সুন্দরী হয় কন্যাপক্ষ তত হাঁক দেয় দাঁও বুঝে। ফলে টাকার অভাবে বহু দরিদ্র সৎ ব্রাহ্মণের বিয়ে হোত না। এমনি ছিল সামাজিক ব্যবস্থা। নাটকে রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্বে'র অনুরূপ এক সামাজিক চিত্রের প্রতিলিপি অঙ্কিত হয়েছে আলোচ্য "নয়শো রূপেয়া"* নাটকখানিতে।

রামধন মজুমদার মশাইয়ের ঘরে ডাগর মেয়ে আছে শুনে হলধর মুখুয্যে ঘটকালি করতে এসেছিলেন মজুমদার মশাইয়ের বাড়ি। 'নয়শো রূপেয়া'র সুরু এখানেই। মজুমদার মশাই তামাক খাচ্ছিলেন। এমন সময় ঘটক হলধর মুখুয্যে প্রবেশ করলেন। শুধোলেন:

"আপনার একটি সেয়ানা কন্যা আছে না?

রাম। আছে।

হলধর। সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে?

রাম। হচ্ছে যাচ্ছে ওর ঠিক কি। কিন্তু কাহারও সঙ্গে ঠিক হয় নাই।

হল। আমি একটি সম্বন্ধ নিয়ে এসেছি।

---

* নয়শো রূপেয়া। নাটক [নাট্যকারের নাম নেই]—কলিকাতা; বহুবাজার, নং ৫২, হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি। স্মিথ এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রে শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১২৭৭। (ইং ১৮৭০)। পৃষ্ঠা: ৯৭।

রাম। কত টাকা ?

হল। কত টাকা! আগে ঘর বর কেমন, তা শুনুন।

রাম। ঘর বর ভাল হয় তাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আপনি কত টাকা দিতে পারবেন ?

হল। আপনি চান কত ?

রাম। আমার মেয়ের বয়স এই ষোল বছর। দেখতে সুশ্রী, তা দেখে নেবেন। তা এই সকাল বেলা আপনাকে দর না বলে ঠিক কথা বলে দিচ্ছি, ১২ শ' বলি আর ১৫ শ' বলি, হাজার টাকার কমে আমি মেয়ে ছাড়ব না।

হল। হাজার টাকা!

রাম। হাঁ হাজার টাকা, চমকে গেলেন যে! প্রতাপকাটির মুখুয্যেরা ৭৩০৲ টাকা বলে গেছেন, আমি তাতে মেয়ে ছাড়িনি। এই গ্রামের বুড়ো মুখুয্যে ৮০০৲ টাকা দিতে চেয়েছেন, তাতেও মেয়ে দিইনি, হাজার টাকার নীচে যে ছাড়ব না, তাহা স্থিরই আছে।

হল। এর থেকে কিছু কমাবেন না ?

রাম। কিছু না।

হল। দুই একশো ?

রাম। কতবার বলব, আমি হাজার টাকার এক পয়সা কমে ছাড়ব না।...যেমন মাল তেমনি দাম। দাম দাও মাল নাও, আমার কাছে স্পষ্ট কথা, খাঁটি দাম বলেছি। হাজারের এক পয়সা কমে ছাড়ব না।

হল। কেমন ঘর তা শুনুন। শম্ভু মুখোপাধ্যায়ের—

রাম। আপনার অত কষ্ট নিতে হবে না, যেখানে আসল কথার সাব্যস্ত হল না, সেখানে আর ঘর শুনে কি হবে!

হল। পাত্রটির বয়স সবে এই কুড়ি বৎসর, দেখতে—

রাম। আমার তাতে কিছু আপত্তি নাই।

হল। দেখতে দিব্য সুশ্রী, গৌরবর্ণ—

রাম। আমার তাতে কিছু আপত্তি নাই।

হল। আবার লেখা পড়ায় বেশ তৎপর, ইংরেজী বাংলায়—

রাম। আমার তাতে কিছু মাত্র আপত্তি নাই। হাজার টাকা ত দিতে পারবে ?

হল। (স্বগত) বেটা বলে কি ! বলে আমার আপত্তি নাই··· (প্রকাশ্যে) হাজার টাকার কমে কি ছাড়বেন না ?

রাম। না না না।”······

পরে অবশ্য ছাড়তে হয়। ছাড়তে হয় নয়শো' রূপেয়ায়। রামধন মজুমদারের গাঁজাখোর ছোট ভাই সাতুলাল গাঁজার কলকিতে দম দিয়ে তাই নিলেমের সুরে হেঁকে ওঠে ঃ

‘নয়শো রূপেয়া, নয়শো রূপেয়া, বেরি গুড্ মাল—গুড্ আইজ্ গুড্ নোজ্, যাতাহে নয়শো রূপেয়া, নয়শো রূপেয়া এক—নয়শো রূপেয়া দো—বাড়হ বাড়হ—নয়শো রূপেয়া, বাড়হ বাড়হ, নয়শো রূপেয়া এক—ভাল মাল যাতাহে, নয়শো রূপেয়া—’।

সামাজিক গলদের নগ্ন-রূপ সাধারণের চোখে তুলে ধরতে গিয়ে নাট্যকার কেবল রামধন মজুমদার আর ঘটকের মধ্যে কনে-পণের দর কষাকষির ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হন নি। পরের অংকে আবার দেখতে পাই পণের পুরো টাকা বুঝে পায় নি বলে আর এক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ—গোপীমোহন ভট্টাচার্য—তার বিবাহিতা কন্যা, বামাকে, ঘর করতে দেবে না স্বামীর। বাঁড়ুয্যে বাড়ীর এক বিয়ে উপলক্ষ্যে জামাই যখন শ্বশুর বাড়ী এল শ্বশুর মশাই তখন এক কাণ্ড বাধিয়ে বসল। রাত দুপুরে জামাইকে জোর করে দেবে বার করে মেয়ের ঘর

থেকে। বামার মা যত বলেঃ 'ওগো, ক্ষমা দাও—এ রাতটা যাউক, লোকে—', গোপীমোহন যায় তত চটে। বলেঃ

'লোকে হাসবে, লোকে হাসতে কি আর বাকী আছে।··· ও মেয়ে নিয়ে শেষে আমি কি কোরব রে? আমি যদি মেয়েটা এতদিন রেখে দিতাম, তবে এখন মেয়ের যেরূপ বাজার অনায়াসে ৭।৮ শ' টাকা পেতাম। আমি ও মেয়ের ফিরে বে দেব।···'

রামধন মজুমদারের মেয়ে সরলার রোগ-শয্যাব পাশে ডাক্তার-কবিরাজ আর হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার নীলবাবুর মধ্যে আপন আপন চিকিৎসা-পটুতা নিয়ে যে লজ্জাকর লড়াই-পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা যেমন হাসির খোরাক জোগায়, তেমনি তখনকাব চিকিৎসা ব্যবস্থাব একটা দিকও প্রকটিত কবে নাটকখানি।

'নয়শো রূপেয়া'র একটি বিশিষ্ট নাট্য সৃষ্টি হোল সাতুলাল। দীনবন্ধু মিত্রের অপূর্ব চরিত্র 'নিমচাঁদে'ব সমগোত্রীয় অনেকটা। গাঁজা খায় সে। কিন্তু কথা বলে মন্দ না। নয়শো রূপেয়ায় কেনা পাত্রী সরলা আর তার মাসতুতো ভাই রঞ্জনের বিবাহ-বাসরে পুরোহিত বিদ্যাভূষণকে বলছে সেঃ

'হি হি হি! ভট্টাচার্য্য মশাই কিছু উগ্র হোয়েছেন। দেখ সংক্রান্তি বাবা, ধরতে গেলে তোমার আমার এক কথা। গাঁজাখুরিতে কম কে? দাদা আমার মেয়েগুলিকে দেখেন যেন গরু-ছাগল। কোনক্রমে সুবিধে মত বেচে কিছু হাত করতে পারলে হয়। এমন মাতাল আর কে কোথা আছে যে, পাত্রের সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে তাকে মেয়ে দেয়? যদি স্নেহ মমতাও না থাকে, তবু ত লোকে এটা মনে করে যে, এমন করে শুষে নিলে ত আবার আমাকেই চিরকাল মেয়েকে খেতে পোরতে দিতে হবে।···'

গাঁজাখোর এ সাতুলালের জীবনেও পরিবর্তন আসে দেখা যায় নাটকের শেষে। গাঁজার কল্‌কেটা সে ভেঙে ফেলে দেয় দূরে। বলে ঃ 'গাঁজা খাই সত্য, আর খাব না। ফুরিয়ে গেল। ছাতুলালবাবু আজ অবধি শিষ্ট ভদ্রলোক হলেন।' মেয়ে বেচে তার দাদা রামধন মজুমদার যে ন শ' টাকা পেয়েছিল তাও সে হাত করে নেয় কৌশলে। ফিরিয়ে দেয় ভাইঝির বিয়ের আশীর্বাদ হিসাবে।

সমাজের চোখে ঘৃণ্য গাঁজাখোর সাতুলাল মানুষ হয় আবার। কিন্তু সমাজের উচ্চ বর্ণের লোকগুলো মানুষ হোল কই? নাট্যকার বুঝি তারই ইঙ্গিত জানান। নাট্যকার শিশিরকুমারের মুন্সিয়ানার আর একটি পরিচয় নাটকীয় চমক বা সার্‌প্রাইজ প্রহসনখানির পরিসমাপ্তিতে। পাঠক আর মুগ্ধ দর্শকদের আগাগোড়া সাস্‌পেন্স-এর মধ্যে রেখে নাটকের শেষ অঙ্কে তিনি রমানাথ মজুমদারের আঁতুড় ঘর থেকে হারান ছেলে রঞ্জনের প্রকৃত পরিচয় দান করেন।

'নয়শো রূপেয়া' পঞ্চাঙ্ক নাটক। মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের রচিত এই প্রথম নাটক 'নয়শো রূপেয়া' সম্পর্কে সমসাময়িক সংবাদপত্রে নানা উল্লেখ রয়েছে। (ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস',—৩য় সং—এর বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।) এ নাটকে নাট্যকারের নাম থাকে অপ্রকাশিত। তার অবশ্য কারণ যে কিছু ছিল না, এমন নয়। 'নীল দর্পণের' অনুরূপ ঝামেলার আশংকাই বোধ হয় অন্যতম কারণ। শুধু 'নয়শো রূপেয়া' নয় শিশিরকুমারের রচিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম বিষয়ক তিনখানি নাটকের মধ্যে এক 'শ্রীনিমাই সন্ন্যাস' ছাড়া আর কোনটাতেই তিনি স্বনাম ব্যবহার করেন নি। শিশিরকুমারের রাজনৈতিক প্রহসন 'বাজারে লড়াই'-এরও নাম ছিল অপ্রকাশিত।

১৮৭৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে 'নয়শো রূপেয়া'র প্রথম অভিনয় হয় 'ন্যাশান্যাল থিয়েটারে'র

উদ্যোগে। ইতিপূর্বে বাংলা নাটকের অভিনয় কেবল বড়লোকের নাট-মন্দিরেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাতে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার বড় একটা ছিল না। উত্তর কলিকাতার অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল বসু, প্রমুখ জন কয়েক নাট্যোৎসাহী যুবক দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণে'র অভিনয় করেন আর উদ্বোধন করেন কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় 'ন্যাশান্যাল থিয়েটার'-এর (৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২) [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।]। নাট্যপ্রিয় শিশিরকুমার ছিলেন এই ন্যাশান্যাল থিয়েটারের একজন পরম উৎসাহী সমর্থক। নাট্যকার গিরিশ ঘোষের সঙ্গে তিনি এ থিয়েটারের একজন ডিরেক্টরও নিযুক্ত হন। এঁদের অনুরোধে এবং উৎসাহের আতিশয্যেই 'নয়শো রূপেয়া' ও 'বাজারে লড়াই' নামে যথাক্রমে একখানি করে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রহসন তিনি তাঁদের লিখে দেন। আর যথাসময়ে তাদের অভিনয়ও হয় সাফল্যের সঙ্গে। 'ছাতুলালে'র ভূমিকায় অভিনয় করেন নট-চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি। অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন তিনি তাঁর অপূর্ব অভিনয়ের দ্বারা।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদর্শনে' (২য় খণ্ড, বৈশাখ ১২৮০) "গুপ্ত গ্রন্থকারের" এই নাটকখানির বিশদ সমালোচনা করেন। 'নয়শো রূপেয়া'র গুণাবলি আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন:

১। গ্রন্থকার অতি সহজ ভাষায় লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু এরূপ চেষ্টারও সম্যক প্রশংসা করা উচিত।...

২। গ্রন্থকার যেমন শব্দাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়াছেন সেইরূপ অলঙ্কারাড়ম্বরও পরিত্যাগ করিয়াছেন। নায়িকাগণের কণ্ঠের অলঙ্কার, সীমান্তের অলঙ্কার, ভাল বলি বলিয়া তাঁহাদের মুখের রাশি রাশি

অলঙ্কার আমরা সহ্য করিতে পারি না। 'নলিনী লোচনে' 'বিধুবদনে' 'গিরিনিশ্রবণে' আমরা জ্বর জ্বর হইয়াছি; 'বচন রচন' আর সহ্য হয় না।

কিন্তু এ কথাও বলিতে হয় যে গ্রন্থকার অলঙ্কারাধিক্য দোষ এড়াইতে গিয়া অতি দূরে পলায়ন করিয়াছিলেন। নয়শো রূপেয়া গ্রন্থে বোধ হয় দুই তিনটি উপমা বা রূপক নাই। এদিকে আবার পাছে শক্ত প্রাণ রস-চাতুর্য্য ব্যবহার করিতে হয় এই ভয়ে গ্রন্থকার নাটকে একটি গান দেন নাই, এক ছত্র ছন্দোবদ্ধ কথা দেন নাই।···

৩। গ্রন্থের প্রধান গুণ নিঃস্বার্থ বিশুদ্ধ প্রণয় ভাবব্যক্তি। এমন সব গুণেই আমরা গ্রন্থকারগণের শত দোষ মার্জনা করিতে পারি। আমরা গ্রন্থ হইতে একটি দৃশ্য তুলিতে ইচ্ছা করি।

সরলা ও রঞ্জনে ছেলে বেলা হইতে প্রণয় হইয়াছিল। সরলা যে বাড়ির মেয়ে রঞ্জন সেই বাড়ির দৌহিত্র। রঞ্জন সরলার পিতা রামধন মজুমদারের জ্ঞাতি ভাগিনেয়। সরলা রঞ্জন দাদার কাছে পড়িত; তাহাতেই ক্রমেই উভয়ের অনুরাগ হয়। রামধন মজুমদার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ—অর্থপিচাশ—সরলাকে ব্যবসায়ের ভাল দ্রব্য বলিয়া বোধ করিত; যে অধিক মূল্য দিবে তাহাকেই বিক্রয় করিবে স্থির করিয়াছিল; রঞ্জন এই সকল জানিয়া আপনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পণ প্রদানে স্বীকৃত হইল। রামধন টাকা পাইতেছে, সম্পর্কবিরোধে কোন প্রতিবন্ধকতা বোধ করিতে পারিল না বরং গ্রামের বিদ্যাভূষণের মত কোন প্রকারে গ্রহণ করিল; বিবাহের সকলই স্থির। সরলা এই বিবাহ ঠিক ধর্ম্মসঙ্গত হইতেছে না বোধে মনে বড়ই কুণ্ঠিত হইল, প্রাণে ব্যথিত হইল; ব্যথার ব্যথী রঞ্জনকে এ ব্যথার কথা জানাইবার জন্য তাহাকে নির্জ্জন স্থানে আহ্বান করিল। সরলা আপনার কোমল হৃদয় যতদূর পারিল দৃঢ়বদ্ধ করিয়া আসিয়াছিল,

"যাকে ভালবাসি সে যাহা বলিবে তাহাই বুঝিয়া যাইব; আজ তা হতে দিব না," সরলা এইরূপ ভাবিয়া আসিয়াছিল। পাঠক দেখুন সরলা কি বলে। তাহার নিঃস্বার্থ প্রণয়ের,—বিশুদ্ধ প্রণয়ের—প্রগাঢ়তা উপলব্ধি করুন আর তাঁর সরল হৃদয়ের সেই ব্যথার একটু ব্যথী হউন।

"রঞ্জন। * * এই যে কে আসছে, সরলাই বটে।

(সরলার প্রবেশ)

সরলা, তুমি এখনও কাহিল আছ, আমার হাত ধোরে দাঁড়াও।

সরলা। না, তুমি একটু তফাত্‌ দাঁড়াও, আমার খুব নিকটে এস না।

রঞ্জন। বিষয়টা কি বল দেখি? আমার ত ভয় কোরছে। তুমি ভয়ে রাত্রে একা বেরতে পার না, পূর্ব্বে লজ্জায় আমার সঙ্গে দিনের বেলায় কথা বোলতে পার নাই, আজ এই রাত্রে—

সরলা। শোন, আমার অপরাধ নাই। বিপদে পড়লে লোকের ভয়ও থাকে না লজ্জাও থাকে না।

রঞ্জন। সে কি! বিপদ আবার কি! আমার শুনে যে ভয়ে গা কাঁপছে, সরলা চল একটু তফাত্‌ যাই। কাল বাড়ীতে ক্রিয়া বোলে এখনও কেউ কেউ ঘুমায় নাই, কে দেখবে।

সরলা। দেখে আর কি করবে? একটু ঠাট্টা কোরবে। তা আমি সহ্য করতে পারি। যার সঙ্গে কালকে এমনি সময় থাকলে দোষ না হয়, তার সঙ্গে নয় আজকে দুটো কথাই বোল্লেম।

রঞ্জন। বিপদটা কি?

সরলা। কালকে তোমার আমার একটা কাণ্ড হবে।

রঞ্জন। বে হবে তাই বোলছে?

সরলা। তাই বল্‌ছি। তা নাকি সম্পর্কে বাধে?

রঞ্জন। এই কথা, তবু ভাল। তুমি ক্ষেপেছ নাকি ?

সরলা। আমার তোমার কাছে একটি মিনতি, শুনবে ত ?

রঞ্জন। অবশ্য শুন্‌ব।

সরলা। আমার কথাগুলি মন দিয়ে শুনতে হবে, আর হেসে উড়িয়ে দিতে পার্‌বে না।

রঞ্জন। আচ্ছা বল শুন্‌ছি।

সরলা। সম্পর্কে নাকি বাধে।

রঞ্জন। আমি স্বরূপ বোল্‌ছি আমি ঠিক জানি না। কেউ বলে বাধে, কেউ বলে বাধে না। আমাদের এ প্রদেশের মধ্যে বিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ ঠাকুর ব্যবস্থা দিয়েছেন যে হতে পারে।

সরলা। তুমি না তাঁরে কিছু টাকা দিয়েছ ?

রঞ্জন। তা কি তুমি জান না, পণ্ডিতের কাছে ব্যবস্থা নিতে গেলেই টাকা দিতে হয়।

সরলা। তাঁকে যখন টাকা দিতে যাও, তার আগেও কি তাঁর এ মত ছিল ?

রঞ্জন। কথাটা হচ্ছে এই, আমাদের শাস্ত্রে—

সরলা। তোমার পায়ে পোড়ছি আমার কথার উত্তর দাও।

রঞ্জন। না, তখন আর এক রকম মত ছিল। তাই কি ?

সরলা। তা এই যে তোমার কাছ থেকে টাকা খেয়ে তোমার মনোমত ব্যবস্থা দিয়েছেন।

রঞ্জন। তা নয়। তোমার কাছ থেকে টাকা খেয়ে আমার মনোমত ব্যবস্থা তল্লাস কোরে দিয়েছেন।

সরলা। তুমি আমাকে বঞ্চনা কোরবে না আমার মাথা খাও।

রঞ্জন। না।

সরলা। তোমার নিজের মনের বিশ্বাস কি বল দেখি ?

রঞ্জন। একটু মনোযোগ দিয়ে শোন। আমার নিজের মনের বিশ্বাস যে, ঠিক শাস্ত্রসম্মত নয়, কিন্তু তাই বোলে যে বে তে কিছু দোষ হবে তা আমার বিশ্বাস হয় না। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের কতকগুলি লোক ছাড়া আর তাবৎ দেশের লোক আপন খুড়তুত, পিস্তুত, মামাত বুনকে বে করে। তাদের সুন্দর সরল সন্তান হয়। তাদের মধ্যে আমাদের মত কত শত বিদ্বান, ধার্ম্মিক লোক হোয়ে থাকে। যদি এ সমুদয় বিবাহ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত না হোত, তবে এরূপ কখনই হোত না। তুমি আমার দূর সম্পর্কের মামাত বুন, তোমার সঙ্গে বে হোলে দোষ হবে ?

সরলা। যদি তোমার মত আমার বিদ্যা থাক্‌তো তবে হয়ত আমার ও সন্দ হোতো না।

রঞ্জন। বিশেষতঃ তোমার মা বাপ, গুরু পুরোহিতে, কুটুম্ব গ্রামস্থ লোকে তোমায় আমায় বে দিচ্ছেন, দোষ হয় তাদের হবে, তোমার আমার কি ?

সরলা। মা বাপে টাকা নিয়েছেন, গুরু পুরোহিত টাকা নিয়েছেন, গ্রামস্থ লোকে ফলার খাবে। যাদের বে, ভোগ কেবল তাদের।

রঞ্জন। তবে তুমি এখন বল কি ? বে বন্ধ কোরবো ?

সরলা। সম্পর্কে যদি বাধে তবে তুমি আমায় নিয়ে করবে কি ?

রঞ্জন। তবে তোমার কি ইচ্ছা আমি বে তে ক্ষান্ত দেব !

সরলা। তা হোলে তোমার পক্ষে ভাল হয়।

রঞ্জন। তোমার পক্ষে ?

সরলা। তা শুনে তোমার দরকার কি ?

রঞ্জন। তা বটে। কিন্তু তা না শুন্‌লে আমি তোমার কথার উত্তর দিব কিরূপে ?

সরলা। আমার তা হলে জ্বালা যন্ত্রণা সব ঘুচে যায়।

রঞ্জন। তা হয় ত এখনি বন্ধ কর। আমি ত বোলছি সরলা, তুমি আমার দিকে তাকাইও না। তবে আমি জন্মের মত বিদায় হই? কিন্তু বিদায় হবার আগে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার আজ এরূপ ভাব দেখ্‌ছি কেন?

সরলা। কিরূপ ভাব?

রঞ্জন। তুমি আমার উপর রাগ কোরলে কেন?

সরলা। আমি তোমার উপর রাগ করিনি।

রঞ্জন। রাগ না কর, আমার উপর যদি কিছু স্নেহ মমতা ছিল তা গেল কেন?

সরলা। কিসে বুঝলে?

রঞ্জন। এই যে বোল্লে আমার সঙ্গে তোমার বে না হলে তোমার জ্বালা যন্ত্রণা সব ঘুচে যাবে।

সরলা। হাঁ তা যায়।

রঞ্জন। সরলা তুমি আমাকে নিয়ে খেলা কোরো না। আমার ধন, প্রাণ, মান, মন যথাসর্ব্বস্ব তোমায় সঁপেছি। তুমি প্রকারান্তরে বোলছ আমার উপর স্নেহ মমতা কিছু কমে নাই, আজ যদি আমি বে তে ক্ষান্ত দেই, কাল তোমাকে একজন বে করে নে যাবে। তখন বল দেখি আত্মহত্যা ব্যতীত আমার আর কি উপায় থাক্‌বে?

সরলা। তোমার খুব কষ্ট হবে। তা না হলে আর গোল কি?

রঞ্জন। তোমার কষ্ট হবে না।

সরলা। হবার আগে ঔষধ খাব।

রঞ্জন। তবে আমায় কেন সে ঔষধ একটু দেও না?

সরলা। তুমি অমন কথা মুখের আগায় এন না। তুমি আমার চেয়ে সহস্র গুণে ভাল, আর একটি বে কোরে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। আমার পৃথিবীতে থেকে ফল কি?

রঞ্জন। তবে তুমি প্রাণত্যাগ কোরবে ?

সরলা। আর আমার পথ কি আছে ? তুমি ক্ষান্ত দিলে, কাল বাবা আমারে আর একজনের গলায় গেঁথে দেবেন।

রঞ্জন। তবু আমাকে বে কোরবে না ?

সরলা। আমি কোরতে চাইলে কি হয়, তুমি আমাকে নিয়ে কি কোরবে ?

রঞ্জন। কেন বুঝতে পাল্লেম না।

সরলা। আত্মহত্যা না কি বড় পাপ।

রঞ্জন। সর্ব্বনাশ অমন কথা মুখে আন্‌তে নাই, অমন পাপ পৃথিবীতে আর নেই।

সরলা। তাইত। তুমি যদি এক কাজ কর তবে এ পাপের দায় হোতে এড়াই। তুমি যদি আমারে—।

রঞ্জন। কি বোল্‌ছিলে বল।

সরলা। তুমি যদি আমারে বে কর।

রঞ্জন। তুমি আবল তাবল বক্‌ছো কেন ?

সরলা। শোন কিন্তু দুই জনে—।

রঞ্জন। আবার চুপ কোরলে কেন ?

সরলা। দুই জনে—।

রঞ্জন। আবার চুপ করলে কেন ?

সরলা। (অধোবদন) দুইজনে ভাই বোনের মত থাকবো। তুমি আর একটা বে কোরো। আমি তোমার কাছে থাক্‌ব। আমি তার চেয়ে আর সুখ চাইনে।"

'নয়শো রূপেয়া'র দৃশ্য বিশেষের খানিকটা তুলে দিয়েই ক্ষান্ত হননি বঙ্কিমচন্দ্র। নিজ মন্তব্যে আরও লিখেছেন :

"এই দৃশ্যে কিঞ্চিৎ গুণ আছে বলিয়াই আমরা উদ্ধৃত করিলাম, গুণের পরিমাণ পাঠকের রুচি ও বিবেচনার অধীন।

৪। নাটকখানিতে অল্প সৃষ্টি চাতুর্য্যও আছে। সাতুলাল একটি অপূর্ব্ব জীব; অপূর্ব্ব বটে কিন্তু অভাবনীয় নহে। সাতুলালের চরিত্রে এমন কিছু গৌরব নাই যে গ্রন্থকার স্পর্দ্ধা করিতে পারেন; সাতুলাল গাঁজার নিমচাঁদ, সুতরাং নিমচাঁদের ছোট ভাই; এ কথাও বলা যায় যে এখনকার নাটককারগণের পক্ষে এটি বড় অল্প কথাও নহে। যে দেশে রাম লক্ষ্মণ সীতা শকুন্তলার সৃষ্টি হইয়াছে সেই দেশে নিমচাঁদ এখন আধিপত্য করিতেছে; সাতুলাল সেই সাহসে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়াছেন; সাতুলালের শরীরের পূর্ণতা আছে; মুখের চেহারা দেখিলেই চেনা যায়; দূর হইতে স্বর শুনিলে বুঝিতে পারা যায়। নিকটে বসিয়া থাকিলে তাহার কথা শুনিয়া হাসিতে হয়, তাহার সেই আহ্লাদের প্রকৃতিতে আবার যখন ক্রন্দন দেখি তখন তাহার প্রতি একটী অপূর্ব্ব প্রীতি হয়, সাতুলালের এত গুণ আছে যে, সে নিমচাঁদের কাঁধে হাত দিয়া দাঁড়াইবে বড় আশ্চর্য্য নয়। আমরা সমালোচনা শেষ করিলাম। গুপ্ত গ্রন্থকারের এইখানি যদি প্রথম ফল হয় আমাদের ভরসা হইতেছে, তিনি ভাষা ও রসপরিচালনে আরো একটু শিক্ষিত হইলে তাঁহার গ্রন্থ আদরণীয় হইবে।"

সামাজিক কু-প্রথা—কনে-পণরূপ মেয়ে-বেচার বিরুদ্ধে ক্ষুরধার প্রচার-কার্য করাই ছিল সমাজ-কল্যাণব্রতী সাংবাদিক শিশিরকুমার ঘোষের (১৮৪০—১৯১১) মূল উদ্দেশ্য। সংবাদপত্রের স্তম্ভের চাইতে বাঙলার জাতীয় রঙ্গমঞ্চকেই তিনি তখন কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তা যাতে জনসাধারণের নিকট সহজে পৌঁছতে পারে, তার জন্য নাট্যকার শিশিরকুমার সহজ-সরল নাটকীয় সংলাপেরও

আশ্রয় নেন, তখনকার প্রচলিত সংস্কৃত রীতি-ঘেঁষা নাটক বা নাট্যমঞ্চে সাধারণতঃ যা দেখা যেত না। এ নাটকের পাত্র-পাত্রীদের কাটা-কাটা শাণিত সংলাপগুলি বিশেষ করে লক্ষ্য করবার। নিজে একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতের সমজদার হয়েও শিশিরকুমার 'নয়শো রূপেয়া'য় কোন গান সংযোজন করেন নি, যা তখনকার নাটক-প্রহসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ভারতের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র জগতের নির্ভীক পথ-প্রদর্শক হিসেবে মহাত্মা শিশিরকুমার চিরকাল স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন। কিন্তু সাংবাদিকতাই তাঁর সব পরিচয় নয়। সাহিত্য ক্ষেত্রেও অসীম প্রতিভা-দীপ্ত এ মনীষীর দান যে নগণ্য নয়, তার প্রমাণ শিশিরকুমারের প্রথম জীবনের রচিত এ তিনখানা নাটক। 'নয়শো রূপেয়া' শিশিরকুমারের স্বভাবজাত মৌলিক রচনা-রীতিরই সাক্ষ্য দেয়। বাঙলা নাটকের ইতিহাসে বিশিষ্ট এক স্থান তাই 'নয়শো রূপেয়া'র।

রামনিধি গুপ্ত-র (নিধু বাবুর)
গীতরত্ন গ্রন্থ

কোম্পানীর ইংরেজ শাসন তখনও পাকা-পোক্ত হয়ে ওঠেনি, তাই রক্ষে। নইলে নিস্তার ছিল না। রীতিমত সিডিশনের দায়ে বুঝি পড়তে হোত। কালেক্টর সাহেব 'মেং মোণ্টগুমারি' (?) তো চটে আগুন। কালেক্টরীর হিসেবের খাতায় কিনা কাব্য-চর্চা! আর কবিতাটি কি!

কামদ খাম্বাজ

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা॥
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর,
ধারা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষ্ণা॥ ১॥
ছাড়িলে ত ছাড়া না যায়।
ছাড়া হেন রব হলে প্রাণ বাহিরায়॥
অতএব এই বিধি, যাহা করিয়াছে বিধি,
ইহা কি অন্যথা হয় লোকের কথায়॥ ২॥

গান তো নয়, যেন একটি স্ফুলিঙ্গ। সুতরাং কেরানীবাবুর চাকরি গেল। হোলই বা ১৮ বছরের পুরনো চাকরি!

ছাপরার কালেক্টরীর চাকরি খুইয়েও কিন্তু দমলেন না কেরানীবাবু—রামনিধি গুপ্ত (জন্ম: ইং ১৭৪১ সাল; বাংলা ১১৪৮—মৃত্যু: ১২৪৫ সন)। ছাপরায় কাজ করবার সময় রামনিধি গুপ্ত ওরফে নিধুবাবু মুসলমান ওস্তাদের নিকট উচ্চাঙ্গের হিন্দী সঙ্গীত চর্চা

করতেন। কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। একদিন তো ওস্তাদজী মিঞা সাহেবের মুখের ওপরই বলে বসলেন :

'আমি আর এ গান কববো না; আপনিই বাঙলা ভাষায় হিন্দী গানের অনুবাদ করে রাগ-রাগিণী সহযোগে গান গাইবো।'

নিধুবাবু তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখলেন। দীর্ঘ দিনের সাধনার ফলে তিনি অচিরে হিন্দুস্থানের সুবিখ্যাত কবি ও সুগায়ক সরি মিঞার মত বাঙলার 'সরি মিঞা' হয়ে উঠলেন। কলকাতায় "বৈঠকী বা বৈটকী গাওনা"র জন্ম হোল।

নিধুবাবুর গান বাংলা সাহিত্যে 'টপ্পা' নামেই খ্যাত। 'চলন্তিকা'য় টপ্পাব অভিধানিক অর্থ হোল 'গান বিঃ' (প্রায় প্রণয় সঙ্গীত)। শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র রায় তাঁব বাংলা শব্দকোষে টপ্পার মৌলিক অর্থ 'লম্ফ' আর টপ্পা গানেব অর্থ 'সংক্ষিপ্ত লঘু প্রকৃতির গান' বলে উল্লেখ করেছেন। টপ্পা বলতে আদিরসাত্মক প্রেমের গান বলে অনেকে ভুল কবেন। হিন্দী খেয়াল আর টপ্পা গান ভাঙা ক্ষুদ্রায়তন প্রেমেব কবিতাই —রাধা-কৃষ্ণ বা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী—এ গানের উপজীব্য বিষয়বস্তু নয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে নিধুবাবু মামুলী গতানুগতিকতাব গণ্ডী এড়িয়ে নতুন ঢং-এর এক বাংলা গীতি-কাব্যের সূচনা করেন। ডাঃ সুশীলকুমার দে-র কথায় : "নিধুবাবু যখন টপ্পা গাইতে সুরু করেন, তখন একদিকে ভারতচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব; অন্যদিকে কবিগণের পূর্ণ গৌরব ও সমৃদ্ধি। ভারতচন্দ্রের যুগে জন্ম-গ্রহণ করে ভারতচন্দ্রের প্রভাব থেকে মুক্ত নতুন ধরণের গান রচনা করা কম সাহস ও প্রতিভার পরিচায়ক নয়।......এই হিসেবে বঙ্গ সাহিত্যে নিধুবাবুর স্থান নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়।' (Hist. of Beng. Litt : S. K. De ও বঃ সাঃ পঃ পত্রিকা—১৩২৪।)

নিধুবাবুর নতুন ঢং-এর এ গান বাংলার ঘরে ঘরে কদর লাভ করে। তখনকাব দিনের শোভাবাজারস্থ বটতলার পশ্চিমাংশে বড় একখানা আটচালা ঘরে বসত তাঁর গানের আসর। প্রতিদিন রাত্রে তিনি গান গেয়ে সবাইকে নাকি তৃপ্তি দিতেন। বালক-বৃদ্ধ সকলের কাছে তিনি ছিলেন 'বাবু'। তাদের কণ্ঠে তাঁর গানের ধোঁয়া।

শোনা যায়, একদিন নিধুবাবু নাকি তাঁর বাটিতে বসে গান করছিলেন গুন গুন করে। এমন সময় তাঁর মা এসে হাজির। বললেন:

"হ্যাঁরে রাম, তুই নাকি বড় গায়ক হয়েছিস? আমরা সেদিন রাজবাটীতে (শোভাবাজার) কথা শুনতে গিয়েছিলাম। কথকের গান শুনে আমরা বলাবলি করছিলাম, কথকটি বেশ গান গান। একটি সুন্দরী বউ, কাদের বউ জানিনে রে—যেন সাক্ষাৎ ভগবতী—আমার পানে চেয়ে মুচকি হেসে বলেন: 'আপনি কি আপনার ছেলের গান কখন শুনেননি।' আমি বললাম: 'কই না'। সে বউটি তখন বললে: 'তবে একবার শুনবেন।' তা বাছা তুই আজ একটি গান গা—আমি শুনব।"

ঠিক এ সময় নাকি পাড়ার ঠানদি এসেও উপস্থিত। তিনিও বায়না ধরে বসলেন নাত্‌বউয়ের পায়ে ধরার গানটি গাইতে। নিধুবাবু করেন কি? একটু হেসে দু-কূলই করেন রক্ষা। গাইলেন নীচের গানটি:

আমি সাধ করে কি ধরি
তারই পায়।
সে ধন সহজে কি পাওয়া যায়।
সে যে জগদ্‌গুরু কল্পতরু,
মন দিতে হয় যে তারই পায়,
সে যে সাধনের ধন অমূল্য রতন,
তারে সাধন বিনা কেবা পায়।

সে যে অধম-তারিণী, দুঃখ-নিস্তারিণী
তারে প্রেম বিনা বাঁধা দায়।

নিধুবাবুর গানগুলো তখনকার দিনে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের নিকট এত সমাদর লাভ করেছিল যে, লোকের মুখে-মুখে অনেক ভুল ও ভ্রান্তি প্রচার হতে থাকে এ সব গানে। অনেকে আবার নিধুবাবুর গান নিজেদের বলে চালু করতেও দ্বিধা করতেন না। এ সব কারণে গুপ্তমশাই শেষ বয়সে তাঁর গানের প্রামাণিক একখানি বই প্রকাশের বাসনা করেন। গীতরত্ন গ্রন্থ: * নিধুবাবুর এ সব টপ্পা গানের সংকলন পুস্তক। নিধুবাবুর মৃত্যুর বছরখানেক পূর্বে ১৮৩৭ সালে —বাংলা ১২৪৪ সনে প্রকাশিত হয় গীতরত্ন গ্রন্থ। এ বইয়ের ভূমিকায় রামনিধিবাবু গীতরত্ন গ্রন্থের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। ১৮৬৮ সালে গীতরত্নের ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় নিধুবাবুর পুত্র জয়গোপাল গুপ্তের সম্পাদনায়। নং ৬৫, আহিরীটোলার এন-এল শীলের যন্ত্রে এটি মুদ্রিত। মূল্য ছিল এক টাকা চার আনা মাত্র এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ১।০+১৪৮। ১ম সংস্করণের ভূমিকা ছাড়া 'সংবাদ প্রভাকরে' কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখিত কবিবর রামনিধি গুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্তটিও প্রযোজিত করা হয় কিছুটা অংশ বাদ দিয়ে। তা ছাড়া নতুন কয়েকটি গানও যোগ করা হয়। তাদের মধ্যে আছে ৭টি আখড়াই গান, ১টি ব্রাহ্ম সংগীত, ১টি শ্যামাবিষয়ক গীত ও বাণী বন্দনার একটি গান।

* গীতরত্ন গ্রন্থ :—শ্রীশ্রীরামঃ শরণং গীতরত্ন গ্রন্থ শ্রীরামনিধি গুপ্ত রচিত গৌড়িয় সাধু ভাষায় নানা প্রকার ছন্দে রাগরাগিণী সহিত শঙ্কোলিত হইয়া সন ১২৪৪ শালে কলিকাতা বিদ্যোন্মদ প্রেসে মুদ্রিত হইল॥ এই পুস্তক শোভাবাজার ৺নন্দরাম সেনের ইষ্টিটে নং ২০ বাটিতে অন্বেষণ করিলে পাইবেন।

নিধুবাবুর টপ্পার আদিরসাত্মক বিকৃত রূপ দিয়ে বটতলার ছাপাখানা থেকে 'গীতরত্নগ্রন্থ' যে গোপনে ছাপা হোত এবং বিক্রয় হোত তা জানা যায় ৩য় সংস্করণের ছোট এক বিজ্ঞাপন থেকে। 'রামনিধি গুপ্তানুজ' শ্রীজয়গোপাল গুপ্ত জানাচ্ছেন ঃ

"এই গ্রন্থ এবারে রিতিমত রেজেষ্টরী করাইয়াছি অতএব সতর্ক হও এ পুস্তক ভবিষ্যতে কেহ গোপনে ২ না ছাপান, ছাপাইলে দণ্ডিত হইতে হইবে।"

বটতলার রদ্দি ছাপাখানার দৌলতেই হোক বা কবির গানের জনপ্রিয়তার দরুণই হোক নিধুবাবুর বহু গান অনেকে নিজেদের বলে চালিয়ে দিতে কসুর করেননি। এমনি একটি গান ঃ

মনপুর হতে আমার হারায়েছে মনঃ।
কাহারে কহিব, কার দোষ দিব নিলে কোন জন্।
না বল্যে কেমনে রব, বল্যে বল কি করিব
তোমা বিনে আর সেখানে কাহার গমনাগমন ॥ ১ ॥
অন্যের অগমনীয়, জান সে স্থান নিশ্চয়,
ইথে অনুমান, এই হয় প্রাণ, তুমি সে কারণ ॥ ২ ॥
যদি তাহে থাকে ফল, লয়েছ করেছ ভাল,
নাহি চাহি আমি, যদি প্রাণ তুমি, করহ যতন ॥ ৩ ॥

* * *

প্রেমবাণ প্রাণ আমার প্রাণে হানিলে।
চিহ্ন নাহি তার, বেদনা অপার, বল কি করিলে ॥
বিস্ময় হইলেম নাথ, কথায় তা কব কত,
বিনে শরাসন, অপরূপ বাণ, নিক্ষেপ করিলে ॥ ১ ॥
একথা কাহারে কব, কেমনে তারে বুঝাব,
বিনে নিদর্শনে, কেহ নাহি মানে, কামিনী মজালে ॥

কেমনে হইব স্থির, উপায় না দেখি আর,
এই হয় মনে, সুখ দরশনে, দুঃখ না দেখিলে ॥ ২ ॥
ইত্যাদি

এ গান নিধুবাবু তাঁর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু উপলক্ষে রচনা করেন এবং 'গীতরত্নে'ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য, তা অপরের কাব্য-গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে। এরই ঠিক বিপরীতও ঘটতে দেখা গেছে। অর্থাৎ, নিধুবাবুর রচিত নয় এমন অনেক গান তাঁর নামে বেমালুম চালু হয়ে গেছে। তাতে প্রমাণ হয়, সে যুগে নিধুবাবু সাধারণের কাছে কতখানি জনপ্রিয় ছিলেন।

নিধুবাবু কেবল হিন্দী গীতিসাহিত্যে ওস্তাদ ছিলেন না, তিনি সংস্কৃত, পারসী ও ইংরেজীও নিশ্চয় কিছুটা জানতেন।

'গীতরত্ন' থেকে কয়েকটি টপ্পা উদ্ধৃত করা গেল :

পিরীতি অমিয় যদি জেনেছি অন্তরে।
বিষ কি করিল দোষ বল না মোরে ॥ ১ ॥
কেমনে সরলা অতি বলে অবলারে।
পাষাণ বরণ ভাল মম বিচারে ॥ ২ ॥

[পৃঃ—৭৫ ; ৩য় সংস্করণ]

অথবা

তারে আর সাধিব না সই সাধিলে আদর বাড়ে।
বটে অনাদরে নয়, অধিক আদর পেলে কে ছাড়ে ॥
এতেক যতন করি, মতে চলিতে না পারি।
অতি নিচু হলে পর, অতি দুঃখ দিবে মনেতে পড়ে ॥
পিরীতে মিলন সুখ বিচ্ছেদ তেমতি দুঃখ।
সুখ আশ করি, যখন যে মরি, তনু হল জর জর ॥ ১॥

* * *

তুমি যা বুঝিলে প্রাণ সেই ভাল ভাল।
আমার বচন, স্বরূপ কথন, বোধ নাহি হল হল ॥
এতেক করি যতন, তবু না পাইলেম মন,
আপনারি মন, দিয়াছি যখন, উপায় কি বল বল ॥ ১ ॥

[পৃঃ—১২৯ ; ৩য় সং]

দেশ ত্যাগিলে সুখ নাহি কাননে ॥
অন্য অন্য রাজা যত, সকলের এই মত,
পলাতকে নাহি দেয় দুঃখ কখনে ॥ ১ ॥
এ রাজার দূতগণ, একে এক শত জন.
মলয়া কোকিল ফুল বান্ধে তিন গুণে ॥ ২ ॥

[পৃঃ—১২৮ ; ৩য় সং]

*　　　*　　　*

এমন সুখের নিশি কেন পোহাইল।
কহিতে না পারি আমি কত খেদ উপজিল ॥
নিশির তিমির গুণ, তাহে মন সুখী ছিল।
তমোহন্তি দিবাকর হেরি মনঃ কালী হলো ॥ ১ ॥

[পৃঃ—১১ ;—ঐ]

*　　　*　　　*

যে দিকে চাই সেই দিকে পাই দেখিতে তোমারে।
কি জানি কি গুণে, ভুলালে নয়নে, তোমার বিহনে,
না দেখি কাহারে ॥
যখন থাকি শয়নে, তোমারে দেখি স্বপনে।
পুনঃ জাগরণে নয়নে, নয়নে থাকি সেই মনে,
কি হলো আমারে ॥ ১ ॥

*　　　*　　　*

শুন হে কহি এই আমি চাহি বোলেনা কাহারে।
আমার পরাণ, করিয়ে হরণ, রাখিয়াছ প্রাণ,
নয়ন ভিতরে ॥
যে যারে নয়নে রাখে, সে তারে সতত দেখে,
সন্দেহ ইহাতে, নাহি কদাচিতে,
বুঝনা মনেতে, কি কব তোমারে ॥ ১ ॥

* * *

বিচ্ছেদে যে ক্ষতি তাহা অধিক মিলনে।
আঁখির কি আশা পুরে ক্ষণে দরশনে ॥
প্রবল অনল দেখ কিঞ্চিত জীবনে।
নির্ব্বাণ হইতে কেহ দেখেছ কখনে ॥ ১ ॥

* * *

হেরিলে চমকে প্রাণ বিচ্ছেদ ভয়েতে।
না দেখিলে ঝুরে আঁখি মম বিরহেতে ॥
বিষম হইল মোরে, এ কথা কহিব কারে,
ইহার উপায় বিধি বুঝ বিধি মতে ॥ ১ ॥

* * *

নয়ন শীতল হয় দেখিলে যাহারে।
দেখ দেখি কত সাধ দেখিতে তাহারে ॥
চক্রবাক চক্রবাকী, দিবসে একত্র দেখি,
তাহার অধিক সুখী বুঝিল বিচারে ॥ ১ ॥
নলিনী হাসিয়ে কহিছে ভ্রমরে।
আমার যে ধন প্রাণ সঁপেছি তোমারে ॥
পলক যদি না দেখি, বিরহে ঝুরয়ে আঁখি,
দুঃখেতে উপজে মান, নহে সে অন্তরে ॥ ১ ॥

হে নাথ মনের কথা তুমি জান।
যে হয় উচিত, করিবে তেমত, তোমাতে বিদিত,
আছয়ে কারণ ॥
মন সুখে থাকে যাতে, রাখ তারে সেই মতে,
এই নিবেদন।
গুণাগুণ মোর, করিলে বিচার,
তবে তো তোমার, হব মতাধীন ॥ ১ ॥

নিধুবাবুর একটি আখড়াই-সংগীত—ভবানী-বিষয়ক ঃ

বাগেশ্বরী।

ত্বমেকা ভুবনেশ্বরি, সদাশিবে শুভঙ্করি,
নিরানন্দে আনন্দদায়িনী। (মা)
নিশ্চিত ত্বং নিরাকাবা, অজ্ঞান বোধ সাকারা,
তত্ত্বজ্ঞানে চৈতন্য রূপিনী ॥
প্রণতে প্রসন্নাভব, ভীমতর ভবার্ণব,
ভয়ে ভীত ভবামি ভবানি।
কৃপাবলোকন করি, তরিবারে ভববারি,
পদতরি দেহি গো তারিণি ॥ ১ ॥

খেউড়, বেহাগ।

মনের যে সাধ ছিল মনেতে রহিল। (দেওয়া ওরে)
তোমার সাধনা করি, সাধ না পুরিল ॥
সাধিয়ে আপন কায, এখন বাড়িল লাজ,
আমার গেল সে লাজ বিষাদ হইল ॥ ১ ॥

প্রভাতী, ললিত।

জামিনী কামিনী বশ হয় কি কখন। (দেওরা ওবে)
হলে কি ও বিধুমুখ হেরিহে মলিন॥
নলিনী হাসিবে কেন, কুমুদী বিরসানন,
এ সুখে অসুখ তবে করে কি অরুণ॥ ১॥
[পৃষ্ঠা—১৪১ ; ৩য় সং]

'গীতরত্নে'র আব একটি আখড়াই সংগীতেব পাঠ—এটিও ভবানী-বিষয়ক :

শৈলেন্দ্র তনয়া শিবে, সদাশিবে প্রদাভবে,
সুধাংশু শেখর সীমন্তিনি। (মা)
বিকল পতিত জনে, ত্রাহি তারা নিজ গুণে,
দয়াময়ী প্রণতপালিনি॥
আপন কর্ম্মানুসারে, ভবে ভ্রমি বারে বারে,
শ্রম ভরে কাতর তারিণি।
শিবদা অশিব হরা, ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা,
সদানন্দে সুখ প্রদায়িনী॥ ১॥

খেউড়, খাম্বাজ।

অনেক যতনে হয় ক্ষণেক মিলন। (দেওরা ওরে)
ইথে কি মনের সাধ পূরয়ে কখন॥
অতএব বলি আমি, হৃদয় নিবাসি তুমি,
নয়নে নয়নে থাক একান্ত মনন॥ ১॥

প্রভাতী, ললিত ভৈরব।

যামিনী যে যায় প্রাণ রাখিব কেমনে। (দেওরা ওরে)
হেরিয়ে অরুণ তব কমল নয়নে ॥
সে কামিনী কুমুদিনী, সুখে পোহাল রজনী।
আমি কমলিনী বুঝি করিলে না মনে ॥ ১ ॥

[পৃষ্ঠা—১৪৬ ; ৩য় সং]

কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' (১লা শ্রাবণ, ১২৬১) রামনিধি গুপ্তের জীবনচরিত আলোচনা প্রসঙ্গে নিধুবাবুর গান সম্পর্কে লিখেছেন: "নিধুবাবু যে প্রকার রাগ, সুর এবং ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিতেন, মিলের প্রতি সে প্রকার দৃষ্টি করিতেন না। এ কারণ তাঁহার কোন কোন গান সুর করিয়া গাহিলে মানুষের মনকে যে প্রকার আর্দ্র করে, মুখে পাঠ করিলে সে প্রকার চিত্তসুখকর হয় না।...নিধুবাবুর এক একখান গান সুর "খেয়ালে"র অপেক্ষাও কৌশল কলাপ পরিপূরিত ও অতি মধুর। ভাবের উদয় মাত্রেই মুখ হইতে সম্ভবতঃ যে সকল কথা নির্গত হইত ইনি তাহাই সুর ও রাগভুক্ত করিয়া গান করিতেন, সেই সময়ে যদিস্যাৎ মিলের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করিতেন তবে সোনার উপর সোহাগার অপেক্ষাও কতদূর পর্য্যন্ত উত্তম ও আশ্চর্য্য হইত তাহা কথনীয় নহে।"

ভারতচন্দ্র আর কবিওয়ালাদের সমসাময়িক কালে জন্মগ্রহণ করে তিনি যে সব সময় তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া এড়াতে পেরেছেন, এটা জোর করে বলা চলে না। ফলে তাঁর রচিত সহজ-সুকোমল আর রসঘন টপ্পাগুলির কোন কোনটাতে হয়ত যুগোপ-যোগী কুরুচির ছাপ থেকে গেছে। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ

শাস্ত্রীর মত অনেক পণ্ডিতই তাদের "নীচ শ্রেণীর কবিতার করতোপ" অথবা "ইহার (নিধুবাবুর) অধিকাংশ গীতই অশ্লীলতা দুষ্ট" বলে এক পেশে করে রেখে গেছেন। এ রাখা মানে নিধুবাবুর প্রতি শুধু অবিচার করা নয়, নিজেদের অনুদার সংকীর্ণতারই পরিচয় দেওয়া। তা লক্ষ্য রেখেই বুঝি আজ থেকে এক শ' বছর পূর্বে ঈশ্বর গুপ্ত মশাই লিখেছিলেনঃ "অনেকেই নিধু, নিধু, কহেন, কিন্তু নিধু শব্দটি কি, অর্থাৎ এই নিধু কি গীতের নাম, কি সুরের নাম, কি রাগের নাম, কি মানুষের নাম, কি, কি? তাহা জ্ঞাত ছিলেন না॥" নিধুবাবুর অথবা তাঁর টপ্পার নাম শুনে আজকাল আমরা অনেকে নাক সিঁটকে উঠি, কিন্তু তা যে কি বস্তু হয়ত আমাদের অনেকের জানাই নেই। ডাঃ সুশীল দে ঠিকই বলেছেনঃ 'গীত-রত্নের সমস্ত গান রত্ন না হইলেও আধুনিক সময়ে যেরূপ উপেক্ষিত ও অনাদৃত, তাহারা বোধ হয় সেরূপ উপেক্ষা ও অনাদরের যোগ্য নহে।"

সচিত্র অন্নদামঙ্গল

অন্নদামঙ্গল কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের সেরা কাব্য-গ্রন্থ। আকারে নেহাৎ ছোট নয়। ডবল কলমে ছাপা পৃষ্ঠা সংখ্যা তিন শ'র ওপর। তিনখণ্ডে এটি বিভক্ত। প্রথম খণ্ড হোল অন্নদামঙ্গল; দ্বিতীয় বিদ্যাসুন্দর কাহিনী আর তৃতীয় খণ্ডে আছে মানসিংহ ভবানন্দের উপাখ্যান।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে নানান দেব-দেবীর বন্দনা, সৃষ্টি প্রকরণ, সতীর দক্ষালয় গমন, শিব নিন্দায় সতীর দেহত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ নাশ, উমার বিবাহ প্রভৃতি কাব্যাংশ পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কোথাও কোথাও মুকুন্দরামের 'কবি-কংকণ চণ্ডী'র প্রভাবও দেখা যায়। যেমন—প্রথম খণ্ডের শেষের দিকে বসুন্ধরের মর্ত্যলোকে জন্ম, হরি হোড়ের বৃত্তান্ত, ভবানন্দ মজুমদারের জন্ম-বৃত্তান্ত ইত্যাদি কবিগুণাকরের নিজস্ব। অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ড সুরু হয় রাজা মানসিংহের বাংলায় আগমন নিয়ে—'বঙ্গজ কায়স্থ' মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে শায়েস্তা করতে। বিদ্যাসুন্দরের কথারম্ভ এখানেই। আর তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে 'বর্দ্ধমান থেকে মানসিংহের প্রস্থান, মানসিংহের যশোর যাত্রা, মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ', দেবীর মাহাত্ম্যে মানসিংহের জয়লাভ, মজুমদারের স্বর্গযাত্রা ইত্যাদি।

এককালে বাংলার ঘরে ঘরে এ বইখানি শোভা পেত। এরই থেকে হালহেদ তাঁর গ্রামারের বাংলা উদাহরণ সংগ্রহ করেছিলেন। এই বইখানির মারফৎই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বাঙলায় বাংলা বইয়ের ব্যবসা সুরু করেন প্রথম। বাংলা বইয়ের প্রচারের পথ প্রশস্ত করে দেন সাধারণের মধ্যে। ইতিপূর্বে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দৌলতে

বাংলা ভাষা ও শিক্ষার যে প্রচার সুরু হয় তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টধর্ম প্রচার আর ফিরিঙ্গি সিভিলিয়ান আর কোম্পানীর উচ্চতন আমলাদের কাজ-চলতি গোছের বাংলা ভাষার সঙ্গে পবিচয় ঘটানো। মিশনারী আর সিভিলিয়নদের শিক্ষার কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই তখন লেখা হোত বাংলা বই। ছাপা হোত। প্রচারও হোত। এর পর রামমোহন রায় অবশ্য বাংলা বইয়েব প্রচলন বাঙালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিতেব মধ্যে নিয়ে আসেন। কিন্তু তিনিও তা করেছিলেন তাঁর ধর্মমত বা সমাজ-সংস্কারমূলক প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশেব উদ্দেশ্যে। গাঁটের পয়সা খরচ করে নিজে বই ছাপিয়ে বিনামূল্যে বা নগণ্য মূল্যে তিনি সেগুলি বিতবণ করতেন হাটে-বাজাবে। তাদের অধিকাংশকে অবশ্য বই বলা চলে না। চলে বড় জোর ছোট পুস্তিকা বা প্যাম্‌ফ্লেট। সুচতুর গঙ্গাকিশোরেব মাথায়ই প্রথম 'বুক-বিজনেস' বা বইয়ের ব্যবসাব কথা খেলে। আর এ অন্নদামঙ্গলই ছিল তাঁব প্রকাশিত প্রথম পুস্তক। এটিকেই বাংলার প্রথম সচিত্র পুস্তক বলে মনে করেন পণ্ডিতরা। [ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। প্রকাশক—বঃ সাঃ পরিষদ।] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পাঠাগারে ১৮১৬ সালে প্রকাশিত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সচিত্র এই বইখানি দেখবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছে।

সেকালের সংবাদপত্রেব পুরনো ফাইল ঘেঁটে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পর্কে যেটুকু তথ্য উদ্ধার করেছেন শ্রদ্ধেয় ব্রজেনবাবু তা থেকে জানা যায় : শ্রীরামপুরের কাছাকাছি এক বহরা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন গঙ্গাকিশোরবাবু। শ্রীরামপুরে মিশনারীদের ছাপাখানায় তিনি ছিলেন প্রথমে একজন কম্পোজিটর। কম্পোজিটর রূপেই প্রথমে জীবন সুরু করে। মিশনারীদের কাছ থেকে তিনি বই ছাপানোর হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এভাবে কাজটা রপ্ত করে বছর

কয়েক পরে তিনি শ্রীরামপুর থেকে কলকাতায় চলে এলেন আর কলকাতায় এসে মেসার্স ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস থেকে নিজেই বই ছাপাতে শুরু করলেন। ভারতচন্দ্রের এই অন্নদামঙ্গল কাব্যই গঙ্গাকিশোরের প্রকাশিত প্রথম বই। সুবৃহৎ এই বইখানি সচিত্র। বাঙ্গালী শিল্পীর আঁকা ছ'খানি 'কাটস্' বা খোদাই ছবি আছে বইটিতে। ছবি কয়েকটির নাম : 'অন্নপূর্ণা' (Unnopoonah), 'সুন্দরের বর্ধমানে যাত্রা', 'সুন্দরের বর্ধমানে প্রবেশ','সুন্দর ও দরোয়ান' (Soonder and Durrooan), 'বিদ্যা-সুন্দরের দর্শন' (Biddah and Soonder), 'সুন্দরের বকুলতলায় বৈশন' ও 'সুন্দরের চোর ধরা' (Soonder and Cotaul) ইত্যাদি। চিত্রগুলোর মধ্যে 'সুন্দরের বর্ধমানে যাত্রা' ও 'সুন্দরের বর্ধমানে প্রবেশে'র নীচে ইংরেজীতে শিল্পীর নামাঙ্কিত রয়েছে 'এনগ্রেভড্ বাই রূপচাঁদ রায়'। সুতরাং সব কয়টি না হোক অন্তত এ দু'টি যে রূপচাঁদ রায়ের খোদাই ছবি তাতে কোন সংশয় থাকে না। চিত্রশিল্পী রূপচাঁদ রায় ছাড়া সে যুগের বাঙালী খোদাই-শিল্পীদের মধ্যে কাশীনাথ মিস্ত্রী, বিশ্বম্ভর আচার্য, রামধন স্বর্ণকার, মাধবচন্দ্র দাস, রূপচাঁদ আচার্য, রামসাগর চক্রবর্তী, বীরচন্দ্র দত্ত আর জোড়াসাঁকোর হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়-র নাম করতে হয় বিশেষ করে।

'সচিত্র অন্নদামঙ্গল কাব্য' সম্বন্ধে মেসার্স ফেরিস কোম্পানীর বিজ্ঞাপনটি ছিল :

"মে ফেরিস এন কোম্পানি সাহেবের ছাপাখানায় সিঘ্র প্রকাষ হইবেক অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর পুস্তক অনেক পণ্ডিতের দ্বারা শোধিয়া শ্রীযুত পদ্মলোচন চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য মহাসয়ের দ্বারা বর্ন্ন সুদ্ধ করিয়া উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে ছাপা হইতেছে পুস্তকের প্রতি উপক্ষণে এক ২ প্রতিমূর্ত্তি থাকিবেক মূল্য ৪ টাকা নিরূপণ হইল জাহার

লইবার ইচ্ছা হয় আপন নাম ঐ ছাপাখানায় কিম্বা এই আপিষে শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের নিকট পাঠাইবেন ইতি—" ।

১৮১৬ সালে মেসার্স ফেরিস এ্যাণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানা থেকে অন্নদামঙ্গলের সচিত্র-সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর চাহিদা তার খুব বেড়ে যায়। কাটতিও হ্তে থাকে হু হু করে। গঙ্গাকিশোরের সাফল্য দেখে তখন অনেকেই সচিত্র পুস্তক প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেন। এঁদের প্রকাশিত বইয়ের কয়েকটি হোলঃ 'সঙ্গীত তরঙ্গ'—রাধামোহন সেন দাস কর্তৃক রচিত ও ১৮১৮ সালে প্রকাশিত। 'সঙ্গীত তরঙ্গে' শিল্পী রামচাঁদ রায়এর আঁকা ৬ খানা কপার প্লেট এন্‌গ্রেভিং ছবি আছে, তার মধ্যে 'রাগ ভৈরব' ও 'রাগ দীপক' সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সত্যই উচ্চশ্রেণীর। অপর আর একখানি সচিত্র বই রামচন্দ্র তর্কালংকারের লেখা ও ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ছাপা—'গৌরীবিলাস'। এতেও ছ'খানি কাঠ ও ধাতুর 'কাটস্' আছে। শিল্পী বিশ্বম্ভর আচার্য-কৃত 'দশভুজা'র খোদাই চিত্রটি প্রাচীন বাংলা আর্ট গ্যালারির শিল্প-সুষমার এক অপূর্ব নিদর্শন।

এ ছাড়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্র থেকে প্রকাশিত 'বত্রিশ সিংহাসন' (এ বইতেও বিশ্বম্ভর আচার্যের আঁকা ছবি আছে), নন্দকুমার ভট্টাচার্য-র 'কালী কৈবল্যদায়িনী' (১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত, 'গণপতি' চিত্রটি উল্লেখযোগ্য) ও ১২৪২ ও ১২৫৩ সনে প্রকাশিত 'নূতন পঞ্জিকা'তেও 'মহাদেব', 'লক্ষ্মী-দুর্গা' প্রভৃতি নানা দেব-দেবীর চিত্রের সন্ধান মেলে।

দেওয়ান পুরাণচন্দ্র রচিত 'হরিহরমঙ্গল সংগীতে' রামধন স্বর্ণকারের অংকিত ৭১ খানা খোদাই চিত্র আছে বলে ব্রজেনবাবু উল্লেখ করেছেন। ১৮২৮ সালে কলকাতা পীতাম্বর সেনের ছাপাখানা থেকে 'অন্নদামঙ্গলে'র যে পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাকেও প্রথমবারের'

চাইতে আরও অধিক চিত্রে সুশোভিত করে তোলা হয়। এ সংস্করণে বাঙালী শিল্পীর আঁকা দশখানি চিত্র সংযোজিত করা হয়েছে। ইতিপূর্বে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' থেকে প্রকাশিত "এশিয়াটিক রিসার্চেস্"-এর প্রথম খণ্ডে সার উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ : On the Gods of Greece, Italy and India-য় ভারতীয় দেব-দেবীদের ১৪ খানা চিত্র মুদ্রিত হয়েছে বলে জানা যায়। [শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল : 'প্রবাসী' : বৈশাখ, ১৩৬১।]

কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বইগুলোতেও বাঙালী শিল্পীর আঁকা বহু চিত্রের সন্ধান মেলে। পাদ্রী লসন ও পাদ্রী পিয়র্সের সচিত্র মাসিকপত্র 'পশ্বাবলী' বাংলার খোদাই চিত্রের উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠে এসময়। 'পশ্বাবলী'তে প্রতি মাসে একটি করে কোন না কোন পশুর এক সচিত্র নিবন্ধ থাকত। পাদ্রী লসন ছিলেন তখনকার দিনের একজন খ্যাতনামা খোদাই শিল্পী। প্রাচ্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত চার্লস্ উইলকিন্স-এর হাতে প্রাচীন বাংলা হরফ ও মুদ্রাযন্ত্রের একদা যেমন হাতেখড়ি হয়েছিল, এসব খৃষ্টান মিশনারীদের দৌলতেই তেমনি বাংলা লাইন-এনগ্রেভিং শিল্পের পুষ্টি ও প্রসার লাভ ঘটে। বিদেশী শিল্পীদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত হলে এ দেশে এ 'ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল আর্টের' এতখানি উন্নতি সাধিত হোত কিনা সন্দেহ।

সচিত্র অন্নদামঙ্গল ও সমসাময়িক যুগের কাঠ বা কপার প্লেট চিত্রগুলি নিষ্প্রাণ বা 'কাট-কাট' বলে একালের কোন কোন পণ্ডিত নাক সিঁটকে উঠেছেন। কিন্তু বাংলার এ 'ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল আর্টের' অতি শৈশবে তার কাছ থেকে "যথার্থ শিল্পী মনের পরিচয়" প্রত্যাশা করাটা একটু বাড়াবাড়ি নয় কি? কাঠ ও ধাতুর মাধ্যমে দেবদেবীর মূর্তি প্রতিফলিত করাই এসব অপটু পূর্বসূরীদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁদের ছেনির

মুখে গতানুগতিকতার ধারাই প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রাচীন বাংলার খোদাই চিত্রের উৎকর্ষ সাধনে এঁদের—বিশেষ করে রূপচাঁদ রায়, বিশ্বম্ভর আচার্য, মাধবচন্দ্র দাস প্রভৃতি শিল্পীর—দান খুব নগণ্য বলা চলে না।

'অন্নদামঙ্গলে'র* পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। স্থানও এ নয়। এ বইয়ের অনেকগুলি লাইন মুখে মুখে আপ্তবাক্যের মত এমন প্রচলিত হয়ে গেছে যে, তা উদ্ধৃত করে দেবার লোভ সামলাতে পারা গেল না। যেমন ঃ

'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন'।

* * *

'শিলা জলে ভাসি যায়,
বানরে সঙ্গীত গায়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।'

* * *

'উত্তমে উত্তম মিলে অধমে অধম।
কোথায় মিলন হয় অধমে উত্তমে॥'

* * *

'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥'

* * *

'যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন।'...

* OONOODAH MONGUL : Exhibiting the Tales of Biddah Soonder. To Which is added the Memoirs of Rajah Pratapaditya. Embellished with six cuts, Calcutta : From the Press of Ferris and Co. 1816. PP. 318.

তোতা ইতিহাস

যে-সে সাধারণ তোতা নয়। এ পাখী মানুষের মত কথা কইতে পারে অবিকল। বলতে পারে ভূত-ভবিষ্যৎ! দাঁও বুঝে তাই তোতাবিক্রেতা দাম হাঁকলো: হাজার 'হূন'। (দাক্ষিণাত্যে তখনকার দিনে প্রচলিত প্রাচীন সোনার মোহর। এক 'হূনে'র মূল্য প্রায় ছয়-সাত টাকার মত।) সামান্য একটা টিয়েপাখী; তার আবার এত দাম। দাম শুনে ভেগে পড়ছিল খদ্দেররা। তোতাটি তখন এক খদ্দেরকে ডেকে বললে:

"ও হে যুবা···শুন, আমি তোমার দৃষ্টিতে এক মুষ্টি-পাখী এবং বিড়ালের এক গ্রাস বটি, কিন্তু বুদ্ধি ও জ্ঞানেতে আকাশে উড়িতে পারি এবং সৎ কথকেরা আমার মিষ্ট ভাষা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত থাকেন, আর আগতকল্য যে কার্য্য হইবে তাহা আমি অদ্য বলিতে পারি।"

খদ্দের যুবক ধনাঢ্য সওদাগর আমদ সুলতানের পুত্র ময়মুন নিজে। কাজেই এক হাজার 'হূন' দিয়ে সে কিনলে তোতাপাখাটিকে। আর তোতাটির পরামর্শ গ্রহণ করে শীঘ্র বিস্তর পয়সা কামিয়ে নিলে ব্যবসায়ে। তোতার কথামত কাজ করে প্রচুর অর্থ লাভ করে ময়মুনের মনে আনন্দ আর ধরে না। তোতাপাখীটিকে একক নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয় দেখে ময়মুন একটা সারীপাখীও কিনে আনলে কোত্থেকে।

এভাবে সুখে দিন যায়। একদিন ময়মুন তার সুন্দরী স্ত্রী খোজে-স্তাকে ডেকে বললে:

'আমি কিছুকালের জন্য বিদেশে চললাম সওদা করতে। আপদ-বিপদ সব কাজে তুমি তোতা আর সারীর পরামর্শ নিও। তাদের অনুমতি ছাড়া কিছু করো না।' এই বলে ময়মুন বিদেশে গেল।

এদিকে কান্ত-বিরহ-কাতরা তরুণী খোজেস্তার দিন আর কাটতে চায় না। বাড়ির ছাদে একদিন বেড়াতে বেড়াতে বিদেশী এক তরুণ রাজকুমারকে দেখে মজে গেল সে তার প্রেমে। বিদেশী রাজকুমারও সুযোগ বুঝে এক কুটনীর মারফৎ গোপনে বলে পাঠাল যে, রাত চার দণ্ডের সময় খোজেস্তা যদি তার বাটীতে আসে তবে লক্ষ 'হুনে'র এক অঙ্গুরী উপহার দেবে সে তাকে। কুটনীর নানান ভুলানিতে অবশেষে সম্মত হোল খোজেস্তা।

পরদিন রাত দুপুর হলে খোজেস্তা পরিপাটি প্রসাধন করে নেয় আপন দয়িতের কাছে যাবে বলে। কিন্তু সারীর কাছে অনুমতি চাইতে গিয়েই যত গোল বাধল। সারী নিজেও জাতে মেয়ে। তোতার গৃহিণী। তাই সারী বললেঃ "কস্তুরী আর প্রীতিকে কেহ গোপনে রাখিতে পারে না।...এ কর্ম্ম স্ত্রী জাতির অতি অকর্ত্তব্য, ইহাতে বড় দুর্নাম হইবা আব লজ্জা পাইবা।"

সুন্দরী খোজেস্তা তখন ভিনদেশী রাজকুমারের প্রেমে পাগল। অতএব সারীর নীতিবাক্য সে শুনতে যাবে কেন? পাখীটাকে তাই আছড়ে মেরে ফেললে। তারপর ছুটল তোতার কাছে পরামর্শ নিতে। তোতা কিন্তু জ্ঞানী। সারীর দশা বরণ করতে সে একান্ত নারাজ। এদিকে ভিনদেশী উপপতির কাছে যাবার অনুমতি দেওয়া যায় না গৃহকর্ত্রীকে। বিবেকে বাধে। সুতরাং করে কি? চট করে ফন্দি একটা সে বাতলে দিল। খোজেস্তাকে সরাসরি যেতে মানা না করে 'আরব্য-রজনী'র শেহ্‌রাজাদীর মত বুদ্ধিমান তোতাটি প্রত্যেক দিন রাত্রিতে এমনি এক মজাদার গল্প বা

উপাখ্যান ফেঁদে বসত যা শুনতে শুনতে রাত কাবার হয়ে যেত গৃহকর্ত্রীর। তারপর যেই দয়িত-বিহারে যাবার উদ্যোগ করত খোজেস্তা অমনি মোরগ ডেকে উঠত। সে রাত্রে তার আর যাওয়া হোত না। পরের রাত্রেও এমনি ধারা চলত। পরের রাত্রেও। তার পরেরও।

তোতার কথিত ইতিহাস বা উপাখ্যান শুনতে শুনতে খোজেস্তা প্রতিদিন এমনি মশ্‌গুল হয়ে যেত যে, তার আর দ্বিচারিণী হবার সুযোগই মিলত না। প্রতি রাত্রে নতুন নতুন উপাখ্যান সুরু করে তোতা বিভ্রান্ত করে রাখতো তার গৃহকর্ত্রীকে। এমনি সময় একদিন ময়মুন সওদাগর বাড়ি ফিরল বিদেশ থেকে বাণিজ্য করে। বাড়ি ফিরে সারীকে খাঁচায় দেখতে না পেয়ে স্ত্রীকে শুধালে, সারী কোথায়? খোজেস্তার মুখে কোন কথা নেই। তোতার কাছে থেকে ময়মুন তখন সব বৃত্তান্ত শুনলে। আর তারপর "নষ্ট" করলে খোজেস্তাকে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সিভিলিয়ন বিদেশী ছাত্রদের বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে মূলতঃ রচিত হয় এটি। বিরাট কোন সাহিত্যিক অবদানের স্কোপও ছিল না বইটির মধ্যে। তবু তখনকার দিনে পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় তোতা ইতিহাস ছিল সহজ ষ্টাইলের সুখপাঠ্য একখানি পুস্তক। হিতোপদেশ কিংবা 'ওরিয়েন্টাল ফ্যাবুলিষ্ট' অথবা রাজীবলোচনের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'-এর (১৮০৫ সালে প্রকাশিত) মত বিদেশী ছাত্রদের হোঁচট খেতে হোত না পড়তে গিয়ে এর ছত্রে ছত্রে। চণ্ডীচরণ তাঁর এ পুস্তকে সার্থক অনুবাদ-এর জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কিছু টাকা পুরস্কারও পেয়েছিলেন বলে জানা যায়।

হ্যাঁ, উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলাম, ১৮০৫ সালে শ্রীরামপুরে প্রথম ছাপা হয় চণ্ডীচরণ মুনশীর 'তোতা ইতিহাস'। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা

২২৪। বইখানির পরবর্তী আরো অনেক সংস্করণ হয়েছিল নিশ্চয়। মিঃ জি, সি, হটন 'তোতা ইতিহাসে'র ইংরেজী অনুবাদসহ একটি সংস্করণ প্রকাশিত করেন ১৮২২ সালে। ১৮২৫ সালে "লন্দন রাজধানীতে চাপা (?) বাঙলা ভাষাতে॥ শ্রীচণ্ডীচরণ মুন্শীতে রচিত॥" শ্রীতোতা ইতিহাসের একটি সংস্করণও ছাপা হয়। তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪০। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত সংস্করণ-এর টাইটেল পেজ থেকে এটি কিছুটা স্বতন্ত্র। ফাউন্ট আর ছাপাও বেশ ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে, পরিষ্কার। বইয়ের শেষে মুদ্রকের নামের উল্লেখ রয়েছে—(London :, Printed by Cox And Baylis, Great Queen Street, Lincoln's Inn Fields.)।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারের শ্রদ্ধেয় গ্রন্থাগারিকের সৌজন্যে লণ্ডন সংস্করণ তোতা ইতিহাসের এই দুষ্প্রাপ্য কপিটি দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে।)

পারসী তুতিনামার সার্থক অনুবাদক চণ্ডীচরণ সম্পর্কে কিছু বিশেষ জানা যায় না। এটুকু মাত্র জানা যায়, কেরীর অধীনে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। তোতা ইতিহাস ছাড়া তিনি 'ভগবদ্‌গীতা'র একটি বাংলা অনুবাদও করেন বলে প্রকাশ।

'তোতা ইতিহাসে' মোট ৩৫টি ইতিহাস বা উপাখ্যান কথিত হয়েছে।

তোতার প্রথম ইতিহাস বা উপাখ্যান হোল 'ফরোখবেগের তোতার ইতিহাস'; দ্বিতীয় ইতিহাস হোল 'একজন চৌকিদার রাজা তেবরস্তানের সহিত হিতকর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহার প্রসঙ্গ'; তৃতীয় ইতিহাস—'স্বর্ণকার আর সূত্রধর দুইজনে স্বর্ণের বিগ্রহ চুরি করিয়া গোপনে রাখিয়াছিল তাহার কথা'; চতুর্থ ইতিহাস—'একজন প্রধান

লোকের সন্তান এক সীপায়ের স্ত্রীর চরিত্র বিচার করিয়াছিল তাহার কথা'। ৫ম রাত্রির উপাখ্যান হোল—'এক স্বর্ণকার এক সূত্রধর এক দরজি এক উদাসীন এই চারিজনেতে এক দারুর স্ত্রীলোকের কারণ কলহ করিয়া ছিল তাহার কথা।' ৬ষ্ঠ ইতিহাস—'কান্যকুব্জের রাজার কন্যার উপর এক ফকির আসক্ত হইয়াছিল'; ৭ম ইতিহাস—'এক ব্যাধ এক তোতাকে বাচ্ছা সুদ্ধা ধরিয়াছিল তাহার কথা'; ৮ম—'এক সয়দাগরের স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত চাতুরি করিয়াছিল তাহার কথা'; ৯ম রাত্রির ইতিহাস—'এক মুদির স্ত্রী অন্য একজন পুরুষের উপর আসক্ত হইয়া আপন শ্বশুরকে লজ্জা দিয়াছিল তাহার কথা'; ১০ম—'এক সয়দাগরের কন্যা আর এক শৃগালের কথা'; ১১—'এক ব্যাঘ্রেব কাছে এক ব্রাহ্মণ লোভ করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল তাহার কথা'; ১২—'এক বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের নিকট এক বিড়াল মুষিকেরদিগকে নষ্ট করিয়া আপন কার্য্য হইতে অপদস্থ হইয়াছিল তাহার কথা'; ১৩ ইতিহাস—'সকল মণ্ডূকের প্রধান সাপুর নামে এক মণ্ডূক ছিল তাহার এবং এক ভুজঙ্গের কথা'; ১৪—'এক শিয়াগোস এক ব্যাঘ্রের স্থান লইয়াছিল তাহার কথা'; ১৫—'জরির নামে এক জন তাঁতি ছিল সে আপনাকে কপাল সহকারি করে নাই তাহার কথা'; ১৬—'চারিজন ধনবান্ গরিব হইয়াছিল তাহার কথা'; ১৭—'এক শৃগাল রাজা হইয়া নষ্ট হইয়াছিল তাহার কথা'; ১৮—'চন্দ্রনাম্নী এক স্ত্রীলোক বসিরনামা এক জনের সহিত অত্যন্ত প্রীতি করিয়াছিল তাহার কথা'; ১৯—'এক সয়দাগরের অশ্ব আর একজনের অশ্বীকে নষ্ট করিয়াছিল তাহার কথা'; ২০—'এক স্ত্রীলোক প্রবঞ্চনা করিয়া এক ব্যাঘ্রের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল তাহার কথা'; ২১—'এক রাজা এবং তাহার পুত্রেরা আর এক মণ্ডূক আর এক সর্প—ইহারদের কথা'; ২২—'এক সয়দাগর আপন কন্যা হারাইয়াছিল

তাহার কথা'; ২৩ ও ২৪—'এক ব্রাহ্মণ বাবলের রায়ের কন্যার উপর আসক্ত হইয়াছিল তাহার কথা'; ২৫—'এক নারী শর্ক্করা কিনিতে এক ময়রার দোকানে গিয়া তাহার সহিত রতিকর্ম্ম করিয়াছিল'; ২৬—'এক রাজা এক সয়দাগরের কন্যা গ্রহণ করেন নাই তাহার কথা'; ২৭—'এক রাজা এক শৌণ্ডিককে সেনাপতি কর্ম্মেতে চাকর রাখিয়াছিলেন শেষে তাহা হইতে যুদ্ধ কার্য্য নির্ব্বাহ হইল না তাহার কথা'; ২৮—'এক ব্যাঘ্র দয়া করিয়া এক শৃগাল বৎসকে আপন বৎসরদের সহিত প্রতিপালন করিয়াছিল তাহার কথা'; ২৯—'এক প্রধান লোকের পুত্র তিনি আপন জামার আস্তিনের মধ্যে সর্পকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহার কথা'; ৩০—'এক সিপাই আর এক স্বর্ণকার অর্থের কারণে নষ্ট হইয়াছিল তাহার কথা'; ৩১ ইতিহাস—'এক সয়দাগর আর এক নাপিত এই দুই জন কতক ব্রাহ্মণকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিয়াছিল তাহার কথা'; ৩২ ইতিহাস—'এক মণ্ডূক এক ভ্রমর এক পক্ষী ইহারা এক হস্তীকে নষ্ট করিয়াছিল তাহার কথা'; ৩৩—'ফগফুর চিন নামে এক রাজা স্বপ্নেতে রুমের রাজ্ঞীর উপর আসক্ত হইয়াছিল তাহার কথা'; ৩৪—'এক গর্দ্দভ আর এক মৃগ এই দুই প্রাণী বন্ধন মুক্ত হইয়াছেন তাহাব কথা'; এবং শেষ ইতিহাস—'এক রাজা এক কন্যার উপব আসক্ত হইয়াছিলেন এবং ময়মুন খোজেস্তাকে নষ্ট করিয়াছিলেন তাহার কথা ॥'

এসব উপাখ্যানে তখনকার সাধারণ স্ত্রীলোকদের উপস্থিত বুদ্ধির বেশ পরিচয় মেলে। তখনকার সমাজ ব্যবস্থারও পরিচয় পাওয়া যায়। তোতা ইতিহাসের নমুনা কিছুটা দেয়া হোল:

"দশম ইতিহাস ॥ এক সয়দাগরের কন্যা আর এক শৃগালের কথা ॥

যখন সূর্য্যাস্তে রাত্রি হইল তখন খোজেস্তা কন্দর্পেতে অতি পীড়িতা হইয়া তোতার নিকটে বিদায় লইতে (?) গমন করিয়া

কহিলেন যে, আমি তোমাকে বড় সুবোধ জানিয়া প্রতি রাত্রেই তোমার সমীপে আসিতেছি—তাহাতে যদি তুমি আমাকে উত্তম পরামর্শ না দিবা তবে আর কি দিবে এবং তুমি আমার সহকারিতা না করিলে আর কে করিবে। তোতা উত্তর করিলেক যে, ও কর্ত্রী আমি তোমার এই বিষয়ের জন্যে এমত দুঃখী আছি তাহা কি কহিব যদি এ কার্য্য না হয় তবে যতদিন আমার প্রাণ থাকিবেক তত দিবস কদাচিত আমার চিত্তের দুঃখ যাইবে না অতএব নিত্য রাত্রিতে তোমাকে তোমার বন্ধুর স্থানে যাইতে কহি কিন্তু তুমি বিলম্ব কব আর আমার উপন্যাস শুনিয়া যাও না যদি তোমার গোপন কথা প্রকাশ হয়, তবে তোমাকে এক মন্ত্রণা শিখাইব তাহাতে তুমি দুর্নাম আর আপদ হইতে দূরে থাকিবা যেমত এক শৃগাল সয়দাগর পুত্রীকে উপায় শিখাইয়াছিল সেই উপায়েতে সয়দাগর পুত্রী আপন বাটীতে গিয়াছিল। খোজেস্তা ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে সয়দাগর তনয়া আর শৃগালের কথা কি-প্রকার তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক ॥

এক নগরমধ্যে একজন প্রধান লোক ছিল, তাহার কুরূপ আর মন্দ চরিত্র ও নির্বোধ এক পুত্র ছিল। পরে সে বালকের যুবাকাল হইলে সেই সয়দাগরেব কন্যার সহিত বিবাহ দিলেক। সয়দাগরের কন্যা অতি সুন্দরী গীতশাস্ত্রে বড় নিপুণা। পরে এক রাত্রিতে সেই স্ত্রী আপন অট্টালিকার ছাতির উপর বসিয়া রহিয়াছে ইতিমধ্যে একজন যুবা পুরুষ সেই অট্টালিকার দেয়ালের নীচে দাঁড়াইয়া গীত গাইতেছিল। ঐ স্ত্রী তাহার গীতের শব্দ শুনিয়া তাহাতে আসক্তচিত্ত হইয়া অট্টালিকা হইতে নীচে আসিয়া সেই যুবার নিকট যাইয়া কহিলেক যে ও হে যুবা তুমি শুন আমার স্বামী বড় নির্বোধ ও কুৎসিত অতএব তুমি আমাকে আপন সঙ্গে লইতে পার। সেই ব্যক্তি স্বীকার করিয়া সেইক্ষণেই দুইজনে একত্রে প্রস্থান করিয়া এক পুষ্করিণীর

তটোপরি এক বৃক্ষের তলে শয়ন করিলেক। তাহার পর সেই যুবা সয়দাগর কন্যাকে নিদ্রিতা দেখিয়া তাহার আভরণ চুরি করিয়া লইয়া সেস্থান হইতে পলায়ন করিলেন।

পরে সেই স্ত্রীলোকের নিদ্রাভঙ্গ হইলে আপন গহনা এবং সেই লোককে বিছানাতে না দেখিয়া জ্ঞান করিলেন যে, এই ব্যক্তি আমার সহিত অবিশ্বস্ত কর্ম্ম করিয়া পলাইয়াছে, কি করি ইহাই সেই পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, ইতিমধ্যে এক শৃগাল এক অস্থি দন্তে ধারণ করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া পুষ্করিণীর (?) ধারেতে এক মৎস্য দেখিয়া অস্থি দন্ত হইতে ফেলাইয়া মৎস্যের দিকে দৌড়াইল ইত্যবসরে সেই অস্থি কুক্কুরে লইয়া গেল এবং মৎস্যও জলমধ্যে প্রবেশ করিল। তারপর শৃগাল ফের আসিয়া অস্থিও পাইল না। পরে সেই স্ত্রীলোক এই কৌতুক দেখিয়া হাসিতে শৃগাল জিজ্ঞাসিলেক যে, ও স্ত্রীলোক—কে, তুমি কি কারণে এস্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ। সে স্ত্রী আপন দশার সমস্ত বিবরণ কহিলেক। শৃগাল ইহা শুনিয়া বলিল যে এখনকার পরামর্শ এই যে তুমি ক্ষিপ্তের ন্যায় হাসিতে হাসিতে আর রোদন করিতে করিতে আপন বাটিতে যাও তবে তোমাকে ক্ষিপ্ত দেখিয়া কেহ কিছু বলিবেক না। সে স্ত্রীলোক এইরূপ প্রবঞ্চনা করিলে অন্য কেহ তাহাকে মন্দ বলিতে পারিল না।

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে বলিলেক যে, এখন সময় ভাল বটে, তুমি উঠ আর তোমার বন্ধুর নিকট প্রস্থান কর, কিছু ভাবনা করিও না। যদি তোমার কোন আপদ্ উপস্থিত হয় তবে তুমি যেমন শুনিলা সেইরূপ বঞ্চনা করিও। পরে খোজেস্তা যখন আপন প্রিয়তমের নিকট যাইতে ইচ্ছা করিলেন তৎসময় উষাকাল হইল ও কুক্কুট রব করিতে লাগিল একারণ খোজেস্তার যাওন বারণ হইল।...”

একত্রিংশৎ ইতিহাস॥ এক সয়দাগর আর এক নাপিত এই দুইজন কতক ব্রাহ্মণকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিয়াছিল তাহার কথা॥

"যখন সূর্য্যাস্তে তারাগণের সহিত চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা জরির সাটী বস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করিয়া বিদায় চাহিতে তোতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন ও তোতা আমি অদ্য অর্দ্ধরাত্রের সময় বন্ধুর সমীপে যাইতে চাহি অতএব এই সময় যে ইতিহাস থাকে তাহা কহ। তোতা ইহা শুনিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেক॥

এক সহরে এক ধনবান সয়দাগর ছিল কিন্তু তাহার সন্তান ছিল না এ কারণ সয়দাগর এক দিবস অন্তঃকরণে স্থির করিলেন যে পৃথিবীতে আসিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি কিন্তু আমার সন্তান নাই আমার মৃত্যু হইলে পর এই ধন কে ভোগ করিবেক অতএব এই সকল ধন ফকির আর গরিব ও আনাথেরদিগকে দেওয়া কর্ত্তব্য। সয়দাগর ইহা পরামর্শ স্থির করিয়া আপনি সমস্ত ধন দান করিয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন নিদ্রাবস্থাতে এক স্বপ্ন দেখিলেন যে এক ব্যক্তি কহিতেছে ও ধনী আমি তোমার প্রাক্তন তুমি অদ্য সমস্ত ধন ফকিরেরদিগকে দিয়াছ তোমার সংসারের খরচ কি প্রকার চলিবেক ইহা ভাবিয়া কিছু রাখ নাই এই হেতু আমি তোমাকে এক পরামর্শ কহিতে আসিয়াছি কল্য আমি বিপ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তোমার নিকট যখন আসিব তখন তুমি আমার মস্তকে যষ্ট্যাঘাত করিবা আমিও সে যষ্ট্যাঘাতে ভূমে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিবামাত্র আমার শরীর স্বর্ণ হইবেক সে কালে তুমি আমার শরীর ছেদন করিয়া স্বর্ণ লইবা তাহারপর যেমত আমার অবয়ব সেরূপ হইবেক॥

দ্বিতীয় দিবস এক নাপিত সয়দাগরকে কামাইতেছিল এই কালে সে প্রাক্তনের প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ পঁহুছিল পরে সয়দাগর গাত্রোত্থান করিয়া কএক তাহার মস্তকে যষ্ট্যাঘাত করিলেন ব্রাহ্মণ সে যষ্ট্যাঘাতে

প্রাণ ত্যাগ কবিয়া ভূমিতে পড়িয়া স্বর্ণ হইল। নাপিত দেখিলেক এ কারণ সয়দাগর তাহাকে কএক মুদ্রা দিয়া নিষেধ করিলেক যে তুমি এ কথা কাহাকে কহিও না। নাপিত ইহা দেখিয়া জ্ঞান করিলেক যে ব্রাহ্মণকে যষ্ট্যাঘাত করিলে স্বর্ণ পায়। নাপিত ইহা ভাবিয়া আপন গৃহে পঁহুছিয়া কএক বিপ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাটীতে আনিয়া তাহারদের শীরেতে এমত এক যষ্ট্যাঘাত করিলেক যে তাহারদের মস্তক চূর্ণ হইয়া রক্তের ধারা পড়িতে লাগিল তাহারাও যষ্ট্যাঘাত হইবা মাত্র চিৎকার (?) শব্দ আরম্ভ করিলেক সে শব্দ শুনিয়া বিস্তর লোক একত্র হইয়া নাপিতকে সে দেশের বিচারকর্ত্তার নিকটে লইয়া গেল। বিচারকর্ত্তা নাপিতকে জিজ্ঞাসিলেন তুমি কি জন্যে বিপ্রেরদিগকে যষ্ট্যাঘাত করিয়াছ নাপিত উত্তর করিলেক যে আমি এক সয়দাগরের বাটীতে গিয়াছিলাম সে সয়দাগরের নিকট এক ব্রাহ্মাণ আসিয়াছিল পরে সয়দাগর সে ব্রাহ্মণকে কএক বার যষ্ট্যাঘাত করিলেক তাহাতে সে ব্রাহ্মণের প্রাণ ত্যাগ হইল এবং তাহাব শরীর স্বর্ণ হইল ইহা দেখিয়া মনে বিবেচনা করিলাম যদি আমি ব্রাহ্মণেরদিগকে বড় যষ্ট্যাঘাত করি তবে আমি অধিক স্বর্ণ পাইব ইহা স্থির করিয়া ব্রাহ্মণেরদিগকে মারিয়াছি কিন্তু তাহারদের মধ্যে কেহ স্বর্ণ হইল না কেবল কলহ উপস্থিত হইল। বিচারকর্ত্তা ইহা শুনিয়া সে সয়দাগরকে ডাকাইয়া কহিলেন ও সয়দাগর শুন এই নাপিত কি কথা কহিতেছে সয়দাগর উত্তর করিলেন এই নাপিত আমার চাকর ছিল কএক দিবসাবধি ক্ষিপ্ত হইয়াছে। বিচারকর্ত্তা সয়দাগরের কথায় প্রত্যয় করিয়া নাপিতকে খেদাইয়া দিলেন॥

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী এখন আপন প্রিয়তমের নিকটে গমন করুণ। পরে খোজেস্তা গাত্রোত্থান করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুক্কুট রব করিল ও প্রাতঃকাল হইল একারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না।…"

"হিন্দু ফিমেলস" বা হিন্দু মহিলাদের হীনাবস্থা

বাঙালী গেরস্থ ঘরের কুল-বধূ।

বিয়ে হয় বারো বছর বয়সে। ইতিপূর্বে বাপের বাড়িতে লেখাপড়া বা বর্ণ-পরিচয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়ে ওঠেনি। মেয়েছেলে ব্যাটাছেলের মত লেখাপড়া শিখবে, পাততাড়ি হাতে করে স্কুলে যাবে—সে যে সর্বনেশে অলক্ষুণে কথা! আদিখ্যেতার একশেষ! মেয়্যা মানুষ নেখা-পড়া শিখলে নাকি বিধবা হয়! ঢি ঢি পড়ে যায় চারদিকে। তাই সে যুগের আর পাঁচজন সাধারণ বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের বউ-ঝিদের মতো বিয়ের আগে বারো বছর পর্যন্ত কৈলাসবাসিনী দেবীর বরাতেও শিক্ষালাভ করবার সুযোগ ও সৌভাগ্য কোনটাই হয়ে ওঠেনি। বিয়ের পর স্বামী শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের পীড়াপীড়িতে ও সহযোগিতায় তিনি প্রথম একটু আধটু করে লেখাপড়া করতে থাকেন। ছেলে-পিলের দেখা-শোনা করা, রান্না-বান্না ও সারাদিন সংসারের নানান ঝাঞ্চটের পর রাত্রে যেটুকুন সময় পেতেন, তার মধ্যে তিনি শীঘ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

লেখিকা কৈলাসবাসিনী দেবীর আপন কথায়ঃ

"...আমি বাল্যাবস্থায় পিত্রালয়ে একটি বর্ণও শিক্ষা করি নাই এবং শিক্ষা বিষয়ে আমার অভিলাষও ছিল না। অধিক কি কহিব, কেহ নারীগণের বিদ্যা বিষয়ক কোন কথা উত্থাপন করিলে আমি বিরক্ত হইতাম এবং বিদ্যাভ্যাস করিলে যে অচিরাৎ বিধবা হয়, প্রাচীন পরম্পরাগত এই পুরাতন বাক্যটি অতি প্রযত্ন সহকারে হৃদয় ভাণ্ডারে

ধারণ করিতাম। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে পর আমার স্বামী শ্রীযুক্তবাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় আমাকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু আমি এক প্রকার বিদ্যাবিরোধিনী ছিলাম ; সুতরাং তাঁহার সেই যত্ন আমার পক্ষে অতিশয় কষ্টদায়ক হইল। আমি কোন মতেই তাঁহার উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিতাম না, কিন্তু তিনি তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া বরং আরও অধিক পরিমাণে চেষ্টিত হইলেন। পরে আমি অগত্যা তাঁহার সেই উপদেশ গ্রহণ করিলাম। তিনি বচনাতীত সন্তোষ সহকারে আমাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

"১৭৭১ শকের (১৮৪৯ সালের) শ্রাবণ মাসে আমাকে বর্ণমালার প্রথম ভাগের উপদেশ দেন ; আমি সেই অবধি গোপনভাবে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিতাম এবং গুরুজন ভয়ে ভীত হইয়া বিদ্যাকে অতি দুষ্কর্ম্ম-বোধে লুক্কায়িত রাখিতে চেষ্টা করিতাম এবং বিদ্যা বিষয়ে কোন প্রকার কথা লইয়া আমার গুরুজনেরা যদি আমার প্রতি বিরক্ত হইতেন, তবে সেই যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া পাঠ্য পুস্তকাদি সমুদয় নিক্ষেপ করিয়া শিক্ষকের প্রতি কতই বিরক্ত হইতাম, কিন্তু তিনি কোন প্রকারেই আমাকে তদ্বিষয়ে নিরস্ত হইতে দিতেন না। সুতরাং আমি উভয় অনুরোধ রক্ষা করিবার মানসে, দিবাভাগে সাংসারিক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া সায়ংকালীন অবকাশ পাইয়া যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিতাম।...

"কিন্তু আমার অদৃষ্ট বশতঃ তাঁহার আশা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, কারণ আমি অবকাশাভাবে কিছুই শিখিতে পারি নাই, এবং সেই জন্য এ পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি নাই।..."

('গ্রন্থরচয়িত্রীর নিবেদন')

আলোচ্য গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুত দুর্গাচরণ গুপ্ত মশাইও লেখিকা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"গ্রন্থ রচয়িত্রীর ভাষা বিষয়ে অসামান্য ক্ষমতার বিষয় কিঞ্চিৎ সাধারণের গোচর না করিয়া আমি ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইনি বর্ণ মাত্র শিক্ষা করেন নাই, পরে আমার নিকট কিঞ্চিৎকাল বর্ণ বিষয়ে উপদেশ পাইয়া, স্বয়ং বাঙ্গালা গ্রন্থ সমুদয় পাঠ করত, অল্প দিনের মধ্যেই যে পরিমাণে তদ্বিষয়ক জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা অনেকে বহুকাল বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অধীন থাকিয়াও পারেন কি না সন্দেহ। সমস্ত দিবা সংসার ও সন্তান সন্ততিগণের কার্য্যে ক্ষেপণ কবিয়া সায়ংকালে যে কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইতেন, তাহাতেই এক পক্ষ মধ্যে এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন।"

এ হোল উনবিংশ শতকের শেষার্ধের একজন মহিলা লেখিকা—কৈলাসবাসিনী দেবীর—জবানবন্দী বা আত্মপরিচয় তাঁর প্রথম বইয়েব মুখবন্ধে। বইটির নাম ঃ

HINDU FEMALES
By KOYLASBASINEY DAVI

সে কালের প্রথা মত টাইটেল পেজ ইংরেজীতে লেখা হলেও বইখানি রচিত বাংলা-ভাষায়। তার সাব-টাইটেল পেজটি ছিল ঃ

হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা। / শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী কর্তৃক / প্রণীত। / এবং তৎস্বামী / শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুপ্ত কর্তৃক / প্রকাশিত। / কলিকাতা। / গুপ্ত যন্ত্রে মুদ্রিত। / ১৭৮৫ শক (ইং ১৮৬৩)। / উক্ত যন্ত্রালয় মির্জাফর্স লেন, ১৬ নং ভবনে, অথবা গুপ্ত ব্রাদার্সদিগের গ্রন্থালয় কলেজ ষ্ট্রীট, ৮৬ নং ভবনে এবং সকল গ্রন্থালয়ে ও পুস্তক ব্যবসায়ীর নিকট পাওয়া যায়। মূল্যের উল্লেখ নেই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২+।৵০।

"হিন্দু ফিমেলস" বা "হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা" সন্দর্ভ পুস্তক। বইয়ের সূচনাতেই লেখিকা সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের

সঙ্গে এদেশের মেয়েদের হীন অবস্থার তুলনা করেছেন। হিন্দুদের কৌলীন্য প্রথা ও বাল্য-বিবাহই এর মূল কারণ বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে লেখিকা তাঁর বঙ্গবাসিনী ভগিনীদের অজ্ঞান-অন্ধকারকে দূর করে জাগ্রত হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা'র প্রথম নিবন্ধ হোল: 'বঙ্গদেশীয় মহিলাগণের জন্ম'। নবজাত কন্যা সন্তান পুত্রের চাইতে কতখানি যে উপেক্ষার পাত্রী লেখিকা তা দেখিয়েছেন এ প্রবন্ধে। দ্বিতীয় প্রবন্ধ হোল: মহিলাগণের বাল্যাবস্থার ক্রিয়া এবং তাহাদিগের প্রতি পিতামাতার ব্যবহার। এর পরবর্তী প্রবন্ধ: 'কৌলীন্যে মর্যাদা।' তারপর—ব্রাহ্মণদিগের বিষয়; রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ কুলীনদিগের বিষয়; কুলীন মহাশয়দিগের পুত্র কন্যাগণের প্রতি ব্যবহার ও তাহাদিগের বিবাহাদির নিয়ম; ত্রিকুলীন দুহিতাদিগের বিবরণ; বঙ্গ দেশীয় ভগ্ন-কুলীনদিগের বিষয়; বংশজদিগের বিষয়; জাতিভেদ; বাল্য বিবাহ; বৈধব্য যন্ত্রণা প্রভৃতি অনেকগুলি সহজ, সরল, অনাবিল সামাজিক প্রবন্ধ আছে। 'বিবাহের পর কামিনীগণের শ্বশুরালয়ে গমন ও তৎকালীন তাহাদিগের প্রতি শ্বশ্রূগণের আচরণ এবং বধূগণের মনোগতভাব', 'ভ্রাতৃ-জায়ার প্রতি শ্বশ্রূজাগণের ব্যবহার' প্রভৃতি ঘরোয়া জীবনের সরস নিবন্ধগুলিতে তখনকার সমাজের একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়।

'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' এ দেশে মেয়েদের লেখা প্রথম প্রকাশিত বই নয়। কৃষ্ণকামিনী দাসীর 'চিত্তবিলাসিনী' কাব্য (১৮৫৬ খৃঃ) ও কালিঘাটের হরকুমারী দেবীর 'বিদ্যাদারিদ্রদলনী' কাব্য (১৮৬১ খৃঃ) ছাড়া পাবনার বামাসুন্দরী দেবী রচিত "কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে" পুস্তিকার (১৮৬১ খৃঃ) এবং তারও পূর্বে শ্রীমতি জে. মুলেনস্ লিখিত ও কলিকাতা খৃস্টান

ট্রাক্ট এ্যাণ্ড বুক সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" (কলিকাতা, ১৮৫২) গ্রন্থের ["দেশ"—শারদীয়া সংখ্যা : ১৩৬৩ দ্রষ্টব্য] উল্লেখ করা যেতে পারে এ সম্পর্কে। কৈলাসবাসিনী দেবী 'হিন্দু ফিমেলস'-এর 'বিজ্ঞাপনে' বামাসুন্দরী দেবীর প্রশংসা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পথপ্রদর্শিকা স্বরূপ।

লেখিকা কৈলাসবাসিনী সম্পর্কে ভূমিকায় তাঁর স্বল্প পরিচয় ছাড়া বিশেষ কিছু আর জানা যায় না। আলোচ্য বইখানি ভিন্ন তাঁর 'বিশ্ব-শোভা' নামে আরও একখানি বই-এর সন্ধান মেলে বেলভেডিয়ারস্থ 'জাতীয় পাঠাগার'-এর গ্রন্থাগারে। বইটি গদ্য-পদ্যে লেখা ও লেখিকার স্বামী বাবু দুর্গাচরণ গুপ্তকে উৎসর্গিত। প্রকাশকাল ১৮৬৫ সাল। 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' যে কৈলাস-বাসিনীর স্বরচিত রচনা—অপর কারো বেনামী লেখা নয়—তার প্রমাণস্বরূপ সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্ত-বাগীশ মশায়ের একখানি 'প্রতিষ্ঠাপত্র' সন্নিবেশিত আছে বইটির সঙ্গে।

১৮৬৩ সালে মেয়েদের লেখা সমাজ-সচেতন 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষা ও নারী-প্রগতি আন্দোলনের যাত্রাপথের যে কতখানি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সে কথা এখনকার পাঠক-পাঠিকারা এক রূপ ভুলতে বসেছে! বাংলার নারী আন্দোলনের পুরোধা নেত্রীদের প'ড়ে দেখতে অনুরোধ করি কৈলাসবাসিনী দেবীর এই বইটি—বিশেষ করে এর অন্তর্ভুক্ত 'বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাদিগের স্বাধীনতা' শীর্ষক সহজ অনাড়ম্বর প্রবন্ধটি।

কৈলাসবাসিনী দেবীর লেখার খানিকটা নিদর্শন :

বঙ্গদেশীয় মহিলাগণের বিদ্যাভ্যাস

"এক্ষণে প্রায় প্রত্যেক গৃহের কামিনিগণই বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহারা অনেকেই স্বদেশীয় ভাষায় কিয়ৎপরিমাণে (?)

শিক্ষিতা হইতেছেন এবং কেহ কেহ ইংলণ্ডীয় নিউ ইস্পেলিং আদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থও পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে যে তাঁহারা কতদূর পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন ও কত পরিমাণে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন, তাহা জগদীশ্বরই জানেন; কারণ তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই মানস-প্রফুল্লকর দুই একখানি পদ্য রস-পরি-পূরিত অভিনব পুস্তক লইয়া, সংস্কৃত শব্দার্থানভিজ্ঞ দ্বিজবরের চণ্ডীর পুঁথি পাঠের ন্যায় নির্জ্জন স্থানে উপবেশনকরতঃ পাঠ করিয়া থাকেন। কেহ বা বটতলাস্থ আদিরস পরিপূরিত উত্তমোত্তম গ্রন্থগুলির অধ্যয়ন করিয়া চপলাসম স্বীয় অস্থির চিত্তকে সুস্থির করেন; কেহ বা নাটকের চটক দর্শনে আপন বুদ্ধি শুদ্ধি করেন; কেহ এ, বি পড়ে বিবি সেজে সিন্দুর চুপড়ির অপমান করেন। এইরূপে ইঁহারা স্ব স্ব প্রধান হইয়া অতি গম্ভীর ভাব ধারণ করত সাধারণ সন্নিধানে সম্মান প্রত্যাশা করেন, কোন বিষয়ই প্রকৃতরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে কোনক্রমেই নিন্দা করিতে পারা যায় না, কারণ তাঁহারা কাহারও নিকট কোন-প্রকার সদুপদেশ প্রাপ্ত হন না। ইঁহাদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই আত্মপ্রযত্নে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াছেন। আত্ম-যত্নে যাহা শিক্ষা করিয়াছেন তাহাই তাঁহাদের যথেষ্ট। শুদ্ধ যে উপদেশাভাবেই ইঁহারা শিক্ষা করিতে পারেন না এমন নহে, তাহার উপর আবার বহুবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয়। যে নারী বিদ্যাভাসে প্রবৃত্ত হন, তিনি পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির চক্ষের শূল স্বরূপ হইয়া বহু যন্ত্রণা সহ্য করেন। তাঁহাকে ঐ ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহার গুরুজনেরা দিবানিশি উত্তেজনা করিতে থাকেন; এবং প্রতিবাসিনী কামিনীগণ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কতপ্রকারই বিদ্রূপ করেন ও স্ব স্ব কুমারীকে তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করণে নিষেধ করেন। এই নিমিত্ত কেহ সহসা

বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। এরূপ প্রতিবন্ধকের নিগূঢ় কারণ আমরা একাল পর্য্যন্ত জ্ঞাত হইতে পারি নাই এবং এ বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির মত ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, নারীগণ বিদ্যা শিখিলে বিধবা হয়। কেহ বলেন, ইহারা বিদ্যা রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলে আর সাংসারিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। কোন কোন মহাত্মা বলেন, স্ত্রীগণ বিদ্যা শিক্ষা করিলে তাহাদিগের চিত্ত চঞ্চল হইবে, আর সেই চাপল্য হেতু তাহারা স্বীয় স্বামীকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিবে এবং মনোমত ব্যক্তিকে পত্রদ্বারা আমন্ত্রণ করত উপপতিত্বে বরণ করিবে। কেহ বলেন, ইহারা বিদ্যাভ্যাস করিলে বুদ্ধিবল প্রাপ্ত হইয়া পুরুষবৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে আমাদিগের মান সম্ভ্রম একেবারে খর্ব্ব হইবে। হায়! বিদ্যা শিখিলে বিধবা হইবে? বিদ্যার কি পতি-ঘাতিনী শক্তি আছে, যে তদ্দ্বারা নারীগণ পতিরত্নে বঞ্চিত হইবে? আহা! এই বাক্যটি যে কি প্রকারে কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, তাহা জগদীশ্বরই জানেন। বোধ হয় ভাস্করাচার্য্য-দুহিতা লীলাবতীকে উল্লেখ করিয়াই লোকে এই কথা রচনা করিয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, এক্ষণে বক্তব্য এই নারীগণ বিদ্যাভ্যাস করিলে দ্বিচারিণী হইবে ও সাংসারিক কার্য্যে উপেক্ষা করিবে তাহার প্রমাণ কি? বিদ্যা কি নিকৃষ্ট পদার্থ যে তৎসংস্পর্শে নারীগণ নিকৃষ্টমার্গে পদার্পণ করিবে? আর গৃহকর্ম্মেই বা তাহারা উপেক্ষা করিবে কেন? বিদ্যা শিখিয়া কি তাহাদিগের স্বামী পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের প্রতি স্নেহভাবের অভাব হইবে? আর তাহাদের স্বাধীনতাই বা কি প্রকারে হইবে? বঙ্গাঙ্গনাগণ ত অঙ্গনাতিক্রম করিলেই কুলভ্রষ্ট হয়, তবে কি প্রকারে তাহারা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে?"...

লেখক-পরিচিতি

নাথানিয়েল ব্রাশি হালহেদঃ—জন্ম ২৫শে মে, ১৭৫১ সাল লণ্ডন ওয়েষ্টমিনিষ্টরে। পিতা উইলিয়ম হালহেদ ছিলেন ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের ডিরেক্টর। শিক্ষা হ্যারো ও ক্রাইস্ট চার্চ অক্সফোর্ড-এ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী নিয়ে আসেন ভারতে। তখনকার বড়লাট হেষ্টিংস-এর নির্দেশ অনুসারে 'জেণ্টু কোডে'র অনুবাদ করেন (১৭৭৪—৬)। ১৭৮৫ সালে লণ্ডন প্রত্যাগমন করেন। বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য (১৭৯১—৫) ছিলেন। মৃত্যু লণ্ডনে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সালে।

উইলিয়ম কেরীঃ—জন্ম নর্দামটন্‌শায়ার-এ আগষ্ট ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে। পিতার নাম এড্‌মণ্ড কেরী। কেরীর বাবার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। তাই বারো তেরো বছর বয়সে কেরীকে জীবিকা উপার্জনের জন্য নানান জায়গায় ধর্ণা দিয়ে বেড়াতে হয়েছে। এমন কি কিছু কাল জুতো সেলাইয়ের কাজও করতে হয়েছে। এক সময় কেরী টমাস জোনসের কাছে গ্রীক ও লাটিন ভাষা রপ্ত করেন। মাত্র ২০ বছর বয়সে কেরীকে বিয়ে করতে হয়। এর কয়েক বছর পর তিনি ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৭৯৩ সালে কেরী ভারতে আসেন আর ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। মৃত্যু ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে।

কেরীর লেখা বাংলা বই : ১। নিউ টেষ্টামেণ্ট (১৮০১); ২। বাংলা ব্যাকরণ (১৮০১); ৩। কথোপকথন বা "ডায়ালগস্‌" (১৮০১); ৪। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট; ৫। ইতিহাস মালা (১৮১২); ৬। বাংলা-ইংরেজী অভিধান (১৮১৫-২৫)।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত: জন্ম: ১২১৮ বঙ্গাব্দ, ২৫শে ফাল্গুন, শুক্রবার ২৪-পরগণা কাঁচরাপাড়া গ্রামে (ইঃ ১৮১১ খৃঃ); মৃত্যু: ১২৬৫ বঙ্গাব্দ,

১০ই মাঘ (ইং ১৮৫৮)। পিতা হরিনারায়ণ গুপ্ত। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে কোলকাতা জোড়াসাঁকোয় মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। বাল্যকালে ঈশ্বর গুপ্তের বিদ্যা শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল না বটে, কিন্তু তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল খুব প্রবল। একবার যা শুনতেন তা কিছুতেই বিস্মৃত হতেন না। বাল্যকাল থেকেই তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করতে পারতেন। শৈশবে রচিত তাঁর একছত্র কবিতা :

রেতে মশা দিনে মাছি
এই তাড়য়ে কল্‌কেতায় আছি।

১২ বছর থেকেই তিনি সখের, ওস্তাদী ও হাফ্ আখড়াই কবির দলে গান বেঁধে আসছেন। 'সংবাদ প্রভাকর' (১২৩৭ সালে), 'সংবাদ-রত্নাবলী,' সংবাদ ও মাসিক পত্র 'প্রভাকর', 'পাষণ্ড পীড়ন' (১২৫৩) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

লেখা বই : 'কালী-কীর্তন' (প্রথম বই) : ১৮৩৩ ; 'কবিবর ৺ভারত-চন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত' (১৮৫৫) ; 'প্রবোধ প্রভাকর' (১৮৫৮) ; 'হিত-প্রভাকর' (১৮৬১) ; 'বোধেন্দু বিকাস' (১ম ভাগ : ১৮৬৩) ; 'কালি নাটক' ; 'প্রাচীন কবিদিগের জীবনী' ; 'কবিতা সংগ্রহ' (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত)—১২৯২ সাল।

রামরাম বসু :—রামরাম বসুর জন্মের সন-তারিখ বা শৈশব সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের' গৌরচন্দ্রিকায় তিনি নিজেকে প্রতাপাদিত্যের 'স্বশ্রেণী একেই জাতি' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর জন্মস্থান চুঁচুড়া ও শিক্ষাস্থল ২৪-পরগণার নিমতা গ্রামে বলে প্রকাশ। স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই প্রভৃতি পণ্ডিতেরা পুরনো দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি ঘেঁটে যেটুকু তথ্য উদ্ধার করেছেন তাতে জানা যায়, রামরাম বসু ছিলেন ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের মুন্সী। জন টমাস আর উইলিয়াম কেরী সাহেবের বাংলা ভাষার শিক্ষক। পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য ফোর্ট উইলিয়াম

কলেজের পণ্ডিতী করেছেন এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও 'লিপিমালা'ই তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা। রামরাম বসুর কবিতা রচনার ক্ষমতাও ছিল।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে তিনি মারা যান।

রাজা রামমোহন রায় :—জন্ম ১০ই মে, ১৭৭৪ ; মৃত্যু ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩। ভারত-পথিক। নবীন ভারতের দীক্ষাদাতা। জন্ম হুগলী জিলায় রাধানগর গ্রামে। পিতার নাম রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়); মাতা তারিণী দেবী। পিতা রামকান্ত মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের বিশিষ্ট আমলা ছিলেন। 'রায় রায়ান' ছিল তাঁদের বংশগত উপাধি। বাল্যকালে রামমোহন আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। কাশীতে দীর্ঘকাল থেকে সংস্কৃত ভাষা ও বেদান্ত দর্শনে তিনি পারদর্শী হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে তিনি ইংরেজী, হিব্রু, ফারসী, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষাতেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং বাংলাতে বিদেশী ভাষা থেকে বহু প্রবন্ধ ও নিবন্ধ অনুবাদ ও প্রচার করেন। ধর্মমত ও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশে বহু বাংলা ও ইংরেজী পত্রিকার ('ইষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেট' ইত্যাদি) সম্পাদনাও করেন। ১৮৩০ সালে দিল্লী বাদশাহের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ইংলণ্ডে যান। ব্রিস্টলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বিভিন্ন ভাষায় লেখা রামমোহন রায়ের পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা ৭০ খানার উপর। কয়েকটি বাংলা বই ও পুস্তিকা :

১। বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫); ২। বেদান্তসার (১৮১৫); ৩। ঈশোপনিষৎ (১৮১৬); ৪। ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র উত্তর—১৮১৭); ৫। কঠোপনিষৎ ও মাণ্ডুক্যোপনিষৎ (১৮১৭); ৬। গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮); ৭। সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (১ম ও ২য় ভাগ—১৮১৮-১৯); ৮। মুণ্ডকোপনিষৎ (১৮১৯); ৯। কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০); ১০। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮২০);

১১। পথ্যপ্রদান (পাষণ্ড পীড়নের প্রত্যুত্তর—১৮২৩); ১২। ব্রহ্ম সঙ্গীত (১৮২৮); ১৩। সহমরণ বিষয় (১৮২৯); ১৪। গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩) ইত্যাদি।

রামনারায়ণ তর্করত্ন :—জন্ম—২৪-পরগণার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামে ১৮২২ সালের ২৬শে ডিসেম্বর। পিতা—রামধন শিরোমণি। ছাত্রাবস্থায় রামনারায়ণ সংস্কৃত কলেজের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। ১৮৮৬ সালের ১৯শে জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয় উদরী রোগে। 'নাটুকে রামনারায়ণের' বাংলা লেখা নাটক-প্রহসনের মধ্যে নাম করা হোল :

১। পতিব্রতোপাখ্যান (১৮৫৩); ২। কুলীন কুলসর্বস্ব নাটক (১৮৫৪); ৩। বেণী সংহার নাটক (১৮৫৬); ৪। রত্নাবলী নাটক (১৮৫৮); ৫। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক (১৮৬০); ৬। নব-নাটক (১৮৬৬); ৭। মালতীমাধব নাটক (১৮৬৭); ৮। রুক্মিণীহরণ নাটক (১৮৭১); ৯। চক্ষুদান (১৮৬৯); ১০। যেমন কর্ম তেমনি ফল (প্রহসন—১৮৬৫?); ১১। ধর্ম-বিজয় নাটক (১৮৭৫); ১২। কংসবধ নাটক (১৮৭৫)। তা ছাড়া তিনি 'সুনীতি সন্তাপ' (১২৭৫ সাল) নামে একখানি নাটকও রচনা করেন। তাঁর হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্রদের নিকট প্রদত্ত 'প্রকাশ্য বক্তৃতা' খানি (১৮৫৩) দুষ্প্রাপ্য।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার :—জন্ম—আনুমানিক ১৭৬২ সালে মেদিনীপুরে (মেদিনীপুর জিলা ছিল তখন উড়িষ্যার অন্তর্গত। তাই অনেকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে 'জাতিতে উড়িয়া' বলে ভুল করে এসেছেন)। লেখাপড়া শিক্ষা করেন নাটোরে। ১৮০০ সালে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হোলে তিনি বছর খানেক পর তার বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের আসনে নিযুক্ত হন। তিনি কিছুকাল

কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের জজ-পণ্ডিতের কাজ করেছিলেন। মৃত্যু ১৮১৮ সালে ডিসেম্বর মাসে।

লেখা বই : ১। বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) ; ২। হিতোপদেশ (১৮০৮) ; ৩। রাজাবলি (১৮০৮) ; ৪। প্রবোধ চন্দ্রিকা (১৮৩৩) ; ৫। বেদান্ত চন্দ্রিকা (ইংরেজী অনুবাদ সহ—১৮১৭)।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় :—জন্ম ১৭৮৭। পিতার নাম স্বর্গীয় রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কলকাতার টাঁকশালের বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবনচরিত' থেকে জানা যায়, ভবানীচরণ বাবু প্রথম জীবনে "ডকেট কোম্পানীর অফিসে সরকারী কাজে নিযুক্ত হন ও সাহেবের অনুগ্রহ লাভ করে মুৎসদ্ধি পদে উন্নীত হন। প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে থাকেন। কার্যোপলক্ষে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করবার সুযোগ পান। ভবানী চরণ ছিলেন গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩); 'হিতোপদেশ' (১৮২৩) ; 'নব বাবু বিলাস' ; 'নব বিবি বিলাস' ; ও আদি রসাত্মক কবিতা পুস্তক 'দূতী বিলাস' (১৮২৫), 'পুরুষোত্তম চণ্ডিকা' (১৮৪৪), 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকং' (১৮৩৩), 'শ্রীমদ্ভাগবত' (১৮৩০), 'মনুসংহিতা' (১৮৩৩), রঘুনন্দন ভট্টাচার্য কৃত 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নব্য স্মৃতি' প্রভৃতি গ্রন্থ।

ভবানীচরণ সাংবাদিক হিসাবেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বহুমূত্র বোগে তিনি মাবা যান।

কালীপ্রসন্ন সিংহ :—জন্ম ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর এক বিখ্যাত জমিদার বংশে। পিতার নাম নন্দলাল সিংহ। কালীপ্রসন্নের শিক্ষা লাভ হয় হিন্দু কলেজে। তিনি সংস্কৃত, বাংলা আর ইংরাজী তিন ভাষাতেই সমান দক্ষ ছিলেন। অল্প বয়স থেকে তিনি সাহিত্যচর্চা সুরু করেন এবং বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামে এক সাহিত্যবাসরের প্রতিষ্ঠা (১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে) করেন। প্রতি শনিবার এই সাহিত্য সভার অধিবেশন বসত। আর প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতাদি, সাহিত্য আলোচনা

ছিল তার অঙ্গ। মূল সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা অনুবাদ কালীপ্রসন্ন সিংহের আর একটি কীর্তি। 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করার জন্য পাদ্রী লং সাহেবের যে (হাজার টাকা) জরিমানা হয় তিনি তা পরিশোধ করেন। মাত্র তিরিশ বছর বয়সে ১৮৭০ সালে তিনি মারা যান।

তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে—(১) বাবু নাটক (১৮৫৩); (২) বিক্রমোর্বশী নাটক (১৮৫৭); (৩) সাবিত্রী সত্যবান নাটক (১৮৫৮); (৪) মালতী মাধব নাটক (১৮৫৯); (৫) হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬২) ; (৬) মহাভারত (১৮৬০-৬৬) ; প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড :—জন্ম কলকাতা মামার বাড়ীতে ১২২১ সনে, বৈশাখ (ইং ১৮১৩)। মৃত্যু—১৮৮৫ খৃঃ ১২ই মে; বাং ১২৯২। পিতা জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কুলীন গরীব ব্রাহ্মণ। শিক্ষা হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজ। ১৮৩২ খৃঃ কৃষ্ণমোহন রেভারেণ্ড ডাফ্ সাহেব কর্তৃক খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হন। এবং পাঁচ বছর পর খৃষ্টীয় আচার্যের পদে অভিষিক্ত হন। কলকাতার আজাদ হিন্দ বাগের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে গীর্জাটি আছে তা "কালী বন্দ্যোর গীর্জা" নামে এখনও পরিচিত। কৃষ্ণমোহন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন ও ডি. এল. উপাধি লাভ করেন। বাংলা দেশে বিজ্ঞান সম্মত বিদ্যা শিক্ষার তিনি ছিলেন একজন প্রধান উদ্যোক্তা। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের নীতি-মূলক কবিতা স্কুল পাঠশালায় ছেলেরা দীর্ঘকাল ধরে পড়ে এসেছে। বাঙ্‌লায় তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রবর্তক। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। শিবপুরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

লেখা বই : The Persecuted, সর্বার্থ সংগ্রহ, ষড়দর্শন, নীতি বিষয়ক কবিতা, প্রভৃতি নাম করা। এ ছাড়া রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ঋগ্বেদ-সংহিতা, শারীরিক মীমাংসার ভাষ্য, নারদ পঞ্চরাত্র, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি মূল সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা ও ইংরেজী অনুবাদ

প্রকাশ করেন। Aryan witness বা 'আর্য শাস্ত্রের সাক্ষ্য' তাঁর আর একখানি প্রসিদ্ধ বই। 'সুধাংশু' ও 'Inquirer' পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন।

শিশির কুমার ঘোষ :—জন্ম : ইংরেজী ১৮৪০ সালে (আষাঢ়, ১২৪৭) যশোহর জেলার পলুয়া-মাগুরা গ্রামে। পিতা হরিনারায়ণ ঘোষ; মাতা অমৃতময়ী। ছাত্রাবস্থায় শিশির কুমারের জানবার আগ্রহ ছিল অসীম। বহুমুখী প্রতিভা ছিল তাঁর। শিশির কুমার মন্মথলাল নামেও পরিচিত ছিলেন। M L G নামে 'পেট্রিয়ট' কাগজের যশোহরের নীলকর সাহেব-দের অত্যাচারের কাহিনী লিখতেন নিয়মিত। ১৮৬২ সালে শিশির কুমার 'অমৃত প্রবাহিনী' নামে এক পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। এই 'অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্র' থেকে ১৮৬৮ সালে সুবিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকা (প্রথমে বাংলা সাপ্তাহিক এবং অনেক পরে ১৮৯১ সালে ইংরাজী দৈনিক) আত্ম প্রকাশ করে শিশির কুমারের সম্পাদনায়। সংবাদ পত্র পরিচালনা ও সুষ্ঠু জনমত গঠন করাই মহাত্মা শিশির কুমারের একমাত্র পরিচয় নয়। বাংলার জাতীয় নাট্যশালা (ন্যাশান্যাল থিয়েটার) প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তাঁর দান অনেকখানি। 'নয়শো রুপেয়া' ও 'বাজারের লড়াই' তাঁর এই উদ্দেশে রচিত।

শিশির কুমারের প্রকাশিত বাংলা ইংরাজী বই : ১। নয়শো রুপেয়া (প্রহসন)—১৮৭৩ সাল; ২। বাজারের লড়াই (প্রহসন)—১৮৭৪ সাল; ৩। শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিত : (১ম থেকে ৬ষ্ঠ খণ্ড) ১৮৯২—১৯১১ সাল; ৪। শ্রীনিমাই-সন্ন্যাস (নাটক)—১৯০৯; ৫। শ্রীনরোত্তম চরিত—১৮৯১; ৬। সংগীত শাস্ত্র—১৮৬৯; ৭। শ্রীকালাচাঁদ গীতা (কাব্য)—১৩০২; ৮। ধ্রুপদ ভজনাবলী (সংগ্রহ-গ্রন্থ)—১৯১৩; ৯। সর্পাঘাতের চিকিৎসা—১৮৬৮; ১০। Snakes : Snake bites and their treatment : 1889; ১১। Indian sketches—1898; ১২। Pictures of Indian life—1917; ১৩। Lord Gauranga or Salvation for All : Vol I & II—1897-8.

নিধুবাবু:—(১৭৪১-১৮৩৪ ?) পুরো নাম নিধিরাম বা রামনিধি গুপ্ত। জন্মস্থান হুগলী জিলার চাঁপতা গ্রামে। পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। ছেলেবেলায় নিধুবাবু কলকাতার কুমারটুলিতে পিতৃব্য লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর নিকট থেকে লেখাপড়া শেখেন। এবং ফারসী, হিন্দি ও বাংলা ভাষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেন। তিনি কিছু ইংরাজীও রপ্ত করে নেন নিশ্চয়। দশ সালা বন্দোবস্তের সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী ব্যাপারে আসেন ছাপরায়। এই ছাপরাতেই তিনি এক নামকরা মুসলমান ওস্তাদের নিকট হিন্দুস্থানী গান শিক্ষা করেন।

ভারতচন্দ্র রায়:—হাবড়া-আমতার নিকট পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রামে জন্ম (১৭১২ সালে)। পিতার নাম রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ রায়। তিনি জমিদার ছিলেন। ভারতচন্দ্রের প্রকৃত উপাধি মুখোপাধ্যায়। ভারতচন্দ্র শৈশবকাল কাটান মামার বাড়ীতে। এবং সংস্কৃত ও ফারসী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। শৈশব ও পরবর্তীকাল নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও বিপর্যয়ের মধ্যে অতিবাহিত হয়। পরে তিনি অবশ্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর কাব্যশক্তির পরিচয় পেয়ে ভারতচন্দ্রকে তাঁর রাজসভায় নিয়ে যান। 'রায়গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল', 'রস-মঞ্জরী', 'নাগাষ্টক', 'চণ্ডী নাটক' প্রভৃতি বহু কাব্য রচনা করেন। ৪৮ বছর বয়সে দুরারোগ্য বহুমূত্র রোগে কবি ভারতচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

চণ্ডীচরণ মুন্সী:—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত চণ্ডীচরণ মুন্সী সম্পর্কে বিশেষ কোন পরিচিতি জানা যায় না। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগ সুরু হবার কিছু পরেই চণ্ডীচরণ কেরীর অধীনে ঐ বিভাগে যোগদান করেন বলে উল্লেখ করেছেন ব্রজেনবাবু তাঁর 'সাহিত্য-সাধক চরিত' মালায়। 'তোতা ইতিহাস' ছাড়া চণ্ডীচরণ ভগবদ্গীতার বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। ১৮০৮ সালের ২৬শে নভেম্বর তিনি মারা যান বলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পুরনো নথি-পত্র থেকে জানা যায়।

কৈলাসবাসিনী দেবী:—৺দুর্গাচরণ গুপ্তের পত্নী। 'হিন্দু মহিলা-গণের হীনাবস্থা' (১৭৮৫ শক—১৮৬৩ খৃঃ) এবং 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি' (১৭৮৭ শক—১৮৬৫ খৃঃ) এই দুই পুরনো বইয়ের লেখিকা কৈলাসবাসিনী দেবী সম্পর্কে তাঁর বইয়ের ভূমিকায় লেখা পরিচিতি ছাড়া বিশেষ কিছু আর জানতে পারি নি।

এক শ' বছরের খানকয়েক বাংলা পুরনো বই

(১৭৭৮ সাল থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত)

গ্রামার অব্ দি বেঙ্গলি ল্যেঙ্গুইজ—নাথানিয়েল হালহেদ। হুগলী; প্রকাশ কাল ১৭৭৮।

কথোপকথন—উইলিয়ম কেরী। শ্রীরামপুর; প্রকাশ কাল ১৮০০।

বাইবেল—শ্রীরামপুর—১৮০২।

বত্রিশ সিংহাসন—মৃত্যুঞ্জয় শর্মা। শ্রীরামপুর—১৮০২।

লিপিমালা—রামরাম বসু। শ্রীরামপুর—১৮০২।

রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র—রামরাম বসু। শ্রীরামপুর—১৮০২।

হিতোপদেশ—গোলকনাথ শর্মা। শ্রীরামপুর—১৮০২।

তোতা ইতিহাস—চণ্ডীচরণ মুন্সী। শ্রীরামপুর—১৮০৫।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং—রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়। শ্রীরামপুর—১৮০৫।

ইতিহাসমালা—উইলিয়ম কেরী। শ্রীরামপুর—১৮১২।

করুণানিধান বিলাস—জয়নারায়ণ ঘোষাল। প্রকাশকাল ১৮১৪।

পুরুষ পরীক্ষা—হরেকৃষ্ণ মহতাব। শ্রীরামপুর—.৮১৫।

শব্দসিন্ধু (অভিধান)—অমর সিংহ। কলিকাতা—১৮১৭।

পঞ্জিকা—কলিকাতা—১৮১৮।

অন্নদামঙ্গল—(রামচাঁদ রায়ের ৬খানি চিত্রসহ)—১৮১৬।

গোস্বামীর সহিত বিচার—রামমোহন রায়—১৮১৮।

ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়—ফিলিমস কেরী—১৮১৯।

সহমরণের বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্পদ—
রামমোহন রায়। ১৮১৯।

বর্ণমালা ব্যাকরণ ইতিহাস গণিতাদি সংকলিত প্রাচীন কালের ব্যবহার্য—
—রাধাকান্ত দেব—১৮২১।

পত্র কৌমুদী—কৃষ্ণলাল দেব—কলিকাতা—১৮২০।

কলিকাতা কমলালয়—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা—১৮২৩।

পাষণ্ডপীড়ন—কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—কলিকাতা—১৮২৩।

পথ্যপ্রদান—রামমোহন রায়—কলিকাতা—১৮২৩।

বহু দর্শন—নীলরত্ন হালদার—শ্রীরামপুর—১৮২৬।

গৌড়ীয় ব্যাকরণ—রামমোহন রায়—কলিকাতা—১৮২৬।

বাঙলা ভাষার অভিধান—উইলিয়ম কেরী—শ্রীরামপুর—১৮২৭।

জ্ঞানরসতরঙ্গিণী—ভবানীচরণ তর্কভূষণ—কলিকাতা—১৮২৮।

কুলপ্রদীপ—রাজকৃষ্ণ দেব—কলিকাতা—১৮৩২।

জ্যোতির্বিদ্যা—জেমস্ ফারগুসন্ : উইলিয়ম
ইয়েটস এর-অনুবাদ—১৮৩৩।

বেতালপঞ্চবিংশতি—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—১৮৪৭।

জ্ঞানচন্দ্রিকা (নীতিসংগ্রহ)—গোপাললাল মিত্র—কলিঃ—১৮৩৮।

বাংলা বর্ষ-পঞ্জিকা (১৮৩৬-৩৭)—কলিঃ—১৮৩৬।

বাংলার ইতিহাস—(ইংরাজী থেকে বাংলা অনুবাদ)—
গোবিন্দ চন্দ্র সেন—কলিঃ—১৮৪০।

পারস্য ও বঙ্গীয় ভাষাভিধান—নীলকমল মুস্তফি—কলিঃ—১৮৫৮।

ভূগোল—অক্ষয় কুমার দত্ত—কলিঃ—১৮৪১।

দূতী বিলাস (নাটক)—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিঃ—১৮৫৭।

পশ্বাবলী (সচিত্র জীব-বিজ্ঞান)—তারাশঙ্কর তর্করত্ন কর্তৃক লসন ও পীয়র্স-এর ১৮২৮ সালের পশ্বাবলীর নবসংস্করণ—১৮৫২।

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ—শ্রীমতি জে. মুলেনস্ঃ কলিকাতা—১৮৫২।

বিত্তবিলাসিনী (কাব্য) —কৃষ্ণকামিনী দাসী—১৮৫৬।

বিদ্যাদরিদ্রদলনী (কাব্য)—হরকুমারী দেবী—১৮৬১।

উর্বশী নাটক—কামিনী সুন্দরী দেবী—১৮৬৬।

কামিনী কলঙ্ক (উপন্যাস)—নবীন কালী দেবী—১৮৭০।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় (১ম ও ২য় ভাগ)—অক্ষয় কুমার দত্ত—১ম ভাগ: ১৮৭০।

আমার জীবন—রাসসুন্দরী দেবী—১৮৭৬।

কীর্তিবিলাস—যোগেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুর—১৮৫২।

আলালের ঘরের দুলাল—প্যারীচাঁদ মিত্র—১৮৫৮।

ভানুমতী চিত্ত বিলাস—হরচন্দ্র ঘোষ—১৮৫৩।

দুর্গেশনন্দিনী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায—১৮৬৯।

নীলদর্পণ—দীনবন্ধু মিত্র—১৮৬০।

শর্মিষ্ঠা নাটক—মধুসূদন দত্ত—১৮৫৯।

জমিদার দর্পণ নাটক—মীর মশারবফ হোসেন—১৮৭৩।

ভারত অধীন—কুঞ্জবিহারী বসু—১৮৭৪।

সরোজিনী—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৮৭৫।

বাংলা সাহিত্যের সেরা বই

বাংলা প্রবাদ
ডাঃ সুশীলকুমার দে

শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ (দর্শনে ও সাহিত্যে)

শিল্প-লিপি
ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস
বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

স্বপ্ন ও সত্য
বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা
গোপাল হালদার

বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী

শরৎ-চন্দ্র
ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

সমালোচনা সাহিত্য
ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ও
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল